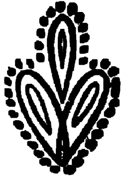
বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প

নারায়ণ সান্যাল



॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ১২ ॥



প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৬২

প্রকাশক :

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :

নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপ্না প্রেস লিমিটেড

৮।১ লালবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা-১

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই :

বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

উৎসর্গ

সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যারা
মানবিকতার পুরা মর্যাদা পেলে না,
সেইসব হতভাগ্য ভূতপূর্ব মানুষের উদ্দেশে

অবতরণিকা

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি হিসাবে অযোধ্যার চেয়ে আদিকবির মনোভূমির দাবিই নাকি অগ্রগণ্য। এ সত্য যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁদের কাছেই জনান্তিকে বলতে পারি বকুলতলা ক্যাম্পের কাহিনী সত্য।

রামায়ণের বাইরেও অযোধ্যার অস্তিত্বটা অনস্বীকার্য; সুখের বিষয় রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষস এবং জাম্বুবানেরা বাল্মিকীর বিরুদ্ধে উকিলের পত্র নিক্ষেপ করেনি। অন্তত তার কোনও প্রামাণ্য নজির নেই। আদি-কবির এ সৌভাগ্যের পুনরাবৃত্তি সকলের ভাগ্যেই না হ'তে পারে—তাই স্থূলকথাটা স্পষ্টাক্ষরে প্রথমেই স্বীকার করে রাখা ভালো।

এ উপন্যাসবর্ণিত সমস্ত চরিত্রই আদ্যন্ত কাল্পনিক—পরিবেশ নিছক মনগড়া। এ কথার পর বলা বোধহয় বাহুল্য হবে যে কাকতালীয় যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রে কোনও বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে কাহিনী-বর্ণিত চরিত্রের সাযুজ্য খোঁজা ব্যর্থ প্রয়াস।

চরিত্র ও পরিবেশ কাল্পনিক হ'লেও সমস্যাটা বাস্তব। সে বাস্তব-সমস্যার আলোচনা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছে সে কথা বিচার করবেন পাঠক। সমালোচকই বলতাম, তবে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই তাঁদের কথা তুললে কলমের কালি শুকিয়ে যেতে পারে।

কাহিনীর নায়কের কারবার ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকি নিয়ে। শালের খুঁটি আর দরমার বেড়া গৃহনির্মাণেরই উপকরণ—উপন্যাসের নয়। এইসব নীরস বিল্ডিং-মেটিরিয়াল পাথেয় ক'রে ঘরবাড়িই গড়ে তোলা যায়—সাহিত্য গড়া যায় না। মানলাম। তবু কেন এই পরিবেশে এসে পড়া

সে কথা বলা শক্ত। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌয়ে বর্ণিত পাথরের ফাটলের সেই গাছটি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে।

উপন্যাসের বাতাবরণে স্থানে স্থানে ইংরাজি শব্দ ও বাক্য অপরিহার্য বিধায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে অপরাধী হয়েছি। লেখক এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

মহালয়া, ১৩৬২
হোমশিখা কার্যালয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড,
কৃষ্ণনগর

নারায়ণ সান্যাল

ক্যাম্প, ৭ই বৈশাখ

"অবশেষে কর্মস্থলে এসে পৌঁছনো গেল। নতুন পরিবেশে ভালই লাগছে প্রথমটা। কাল মাত্র এসেছি, ঘরদোর কিছুই গোছানো হ'য়ে ওঠেনি। আর ঘর বলতে তো দরমার বেড়া ঘেরা দুটি খুপরি। শালকাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দরমার দেওয়াল, উপরে পুরু ক'রে বিছানো উলুখড়। জানালা-দরজা সব ঝাঁপের, কঞ্চির ঠেকনা দিয়ে বায়ু গমনাগমনের একটা প্রচেষ্টা মাত্র। একখানি ঘরে আমার সংসার, অর্থাৎ আহার নিদ্রা, লেখবার টেবিল পাতা—অপর ঘরখানা আমার অফিস। সেখানেও টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার। বারান্দায় পাতা আছে একটি টুল, ঘণ্টা টিপলে টুল থেকে উঠে আসে ঝিমন্ত পিয়ন—খিদমৎ করতে। খাট-টেবিল-বেঞ্চি কোনটাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়নি ; মহাবীর কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতোই এরা এ গৃহের আঙ্গিক। এদের শ্রীচরণ হ'চ্ছে বংশদণ্ড, মাটির মেঝেতে হাত দেড়েক প্রোথিত। এসবের জন্যে সরকারী খাতায় কোন খরচের অঙ্ক পড়েনি—আমার আগমন সংবাদে ঠিকাদার প্রভু স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে এগুলি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বানিয়ে রেখেছেন।

"কোথায় ছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনের ধারের একটি কলেজের শান্ত সুবোধ ছাত্রটি—আর কোথায় হ'য়ে গেলাম কলমের এক খোঁচায় একটা সবডিভিসনাল অফিসের ইনচার্জ! অবশ্য চাকরিটাই গালভারি—এস.ডি.ও. অথবা এ্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ারের অফিস বললে যে ছবিটা সচরাচর মনের মধ্যে জেগে ওঠা স্বাভাবিক, আমার এই দরমার কুঠরির ছবিটা তার কাছে নেহাৎই কার্টুন পিকচার! তবু বনগ্রামের শিবা সম্রাট তো হওয়া গেল। যতদিন না বদলি হচ্ছি এই উলুখড়ের রাজপ্রাসাদেই শেয়ালরাজাকে রাজত্ব ক'রে যেতে হবে। ভাগ্যে ভগবান গৃহের সঙ্গে গৃহিণী দেননি! এ বাড়িতে

এসে রানীগিরি করবার মত ইচ্ছে কোন বঙ্গললনার হ'তে পারে না। রেখা মিস্তিরের মত মেয়ের কথা এ পরিবেশে না ভাবাই ভাল। তবু স্বীকার করা উচিত যে সিংজী ঠিকাদার এগুলি করে রেখেছিলেন বলেই তাঁর নির্মিত টেবিলে বসে তাঁর বাড়ির এ প্রশস্তি লিখবার সুযোগ মিলছে। সুতরাং হে সিংজী ঠিকাদার তুমি শতায়ু হও।

"কাল যখন এসে নামলাম—এগুলি দেখিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে সিংজী নিবেদন করলেন—হুজুরের অফিস ফার্নিচার যতদিন না এসে পড়ে ততদিন যাতে কোনও ক্রমে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় তাই এই দীন আয়োজন তিনি করে রেখেছেন। খড়ের চালের নীচ দিয়ে একটা দরমার সিলিংও করে দেবেন এবম্বিধ প্রতিশ্রুতি দিলেন একটা; তাড়াতাড়িতে নাকি ওটা হ'য়ে ওঠেনি।

"আমি বিব্রত বোধ করি। কলেজ থেকে পাস ক'রে বেরিয়ে সবে এই চাকরি পেয়েছি। প্রথমেই এভাবে ঠিকাদার কর্তৃক অনুগৃহীত হওয়া উচিত হ'বে কিনা মালুম হচ্ছিল না। ঠিকাদার প্রভু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাইলেন। রনৎজেন সাহেবের যন্ত্রটির সঙ্গে ওঁর অক্ষিতারকার কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা জানিনা; বল্লেন, 'হুজুরকে এহী লিয়ে বলেছিলম কলকত্তায়—একেবারে ক্যাম্পের বীচে অফিস না বানিয়ে রেল টিসনে বনাইতে। উখানে উমদা কোয়াটার ভি মিলে যেত। চার মি'ল রাস্তা, ও তো হুজুর সুবোসাম সাইকেলে মারতে পারতেন—হমার জীপ ভি ছিল।"

"সত্য কথা। রামশরণ সিংজীর প্রবল আপত্তি ছিল ক্যাম্পের ভিতর অফিস করতে। এখানে থাকার আমারও ইচ্ছা ছিল না। কথা বলার লোক নেই। নানান অসুবিধা। এর চেয়ে স্টেশনে থাকলে অনেক সুবিধা হ'ত আমার। বলেও ছিলাম কথাটা চীফ এঞ্জিনিয়ারকে। তিনি কানেই তোলেন নি। হেসে বলেছিলেন, 'পরামর্শটা কার? রামশরণের নাকি?'

"কি জানি কি ভেবে তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, 'না, আমিই ভাবছিলাম।'

"চীফ এঞ্জিনিয়ার পাইপটা কামড়ে ধরে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা পার হ'য়ে এসে আমার কাঁধটা ধরে বল্লেন, 'ইয়ংম্যান, কলকাতাই যদি ছাড়তে পারলে, তখন ও স্টেশন আর ক্যাম্পে তফাৎটা কি ? বরং ক্যাম্পে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আছেন, ডাক্তার আছেন, রিলিফ ডিপার্টমেন্টের আর পাঁচজন ভদ্রলোক আছেন। এ্যাসোসিয়েসন ওখানেও একটা গড়ে উঠবে। আর তা ছাড়া—'

"আবার কি ভেবে নীরবে পায়চারি করতে লাগলেন। এটি আমাদের সি. ই.র একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি পায়চারি করতে করতে কথা শোনেন, কথা বলেন, ডিক্টেশন দেন—এমন কি লাঞ্চ-আওয়াসে´ তাঁকে পায়চারি করতে করতে খেতেও দেখেছি। ঘুমন্ত অবস্থায় সি. ই.কে দেখিনি। অনুমান করি নিদ্রিত অবস্থায় অন্তত তাঁর পদচারণা অব্যাহত থাকে না।

" 'তা ছাড়া আই উইস্ য়ু সুড ডাইভ হেডলং ইনটু দি এ্যাফেয়ার্স´। ক্যাম্পে না থাকলে তা সম্ভব নয়।'

"হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে চাইলেন। ওষ্ঠে নয়, চোখদুটিতে তাঁর চাপা হাসি। ওঁর এই নিগূঢ় হাসি, এই 'এ্যাফেয়াস´' শব্দটির বিশেষ বাচন-ভঙ্গিতে কিসের যেন একটা আভাস ছিল।

"সিংজীকে বল্লাম, 'না না সিলিংএর কোন দরকার হবে না। টিনের ঘর হ'লেও না হয় গরম হ'ত ; খড়ের ঘরে আবার সিলিং কি হ'বে ? এমনিতেই এসব করতে আপনি কত বাজে খরচ করেছেন—'

"বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। কারণ ছিল।

"ছাত্রজীবন থেকেই শুনে এসেছি কণ্ট্রাকটরেরা চিরকালই দেখে থাকে এঞ্জিনিয়ারদের সুখসুবিধা। এতে নাকি দূষণীয় কিছু নেই। এ সম্বন্ধে ছাত্রজীবনে বহু মুখরোচক গল্প শুনেছি ডাউনিং হোস্টেলে প্রণবেষ্টর কাছে। তার বাবা ছিলেন একজন এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু জিনিসটা আমার প্রত্যক্ষ সত্য ছিল না। তাই হঠাৎ মনে হ'ল—এই যে আমার ব্যক্তিগত

প্রয়োজনে চেয়ার-টেবিল-খাট প্রভৃতি বানিয়ে রেখেছে ঠিকাদার, চালটা নতুন খড় দিয়ে ছেয়ে রেখেছে, এ সবই কি মৌফৎসে? যদি না হয়? যদি সিংজী আশা করে থাকে যে আমি এসে ওর যা খরচ হ'য়েছে সেটা নগদ মিটিয়ে দেব? এটাই তো স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন প্রবাসবাসের পর প্রতিবেশী বন্ধু যদি আপনাকে চিঠি লেখেন—'ওহে আমি হপ্তাদুয়েক পরে ফিরছি, তুমি গলুমিস্ত্রিকে ডেকে ঘরটা এককোট চুনকাম করিয়ে রেখ—চাবি পাঠালাম।' এবং সেই কাজ করাতে গিয়ে যদি গলুমিস্ত্রিকে দু'বস্তা কলিচুন আপনাকে নগদ মূল্যে কিনে দিতে হয়—তাহলে আপনি কী আশা করবেন? দীর্ঘদিন প্রবাসবাসের পর বন্ধু যেদিন পাড়ায় ফিরে আসবেন সেদিন অব্যবস্থার মধ্যে আপনি তাঁকে আপনার বাড়িতে দুটো খেতে বলবেন; আর তার জবাবে বন্ধু বলবেন—'না না সেকি, এমনিতেই কলিচুন কেনা বাবদ আপনি কত বাজে খরচ করে ফেলেছেন!'

"সিংজী বল্লেন, 'এখানে গরম হুজুর বহুত কড়া আছে। সিলিং না হোলে আপনার বড় কষ্টো হোবে। ঔর চিড়িয়াতে খড় কুঠা ছড়িয়ে নোংরা করবে হুজুর।'

"আমি ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। যেটুকু খরচ সিংজীর হ'য়ে গেছে তার আর চারা নেই। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে আর কিছু হ'তে দেব না। তাতে যত অসুবিধাই হোক। বল্লাম, 'আরে না না, আমরা এঞ্জিনিয়ার মানুষ, এই অল্প বয়সে এত আয়াসী হ'লে আমার চলবে কেন?'

"একটু হেসে জিনিসটাকে সরল করবার চেষ্টা করি।

"টাকায় টাকা আনার মতো হাসিতে হাসি আনে, রসিকতায় আনে রসিকতা। সিংজী আমার হাসি দেখে নিজেও একটু হাসলেন। কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য রুমাল নিয়ে ঘর্মসিক্ত টাকটি মুছে ফেলে আবার

পাগড়িখানা শিরোধার্য করলেন। বুঝলাম এ সময়টুকুর প্রয়োজন ছিল জবাবটাকে মানিয়ে নিতে।

" 'হুজুর এঞ্জিনিয়ার—লেকিন হামরা ছাঁ-পোষা মানুষ। হুজুর নওজোয়ান আছেন, লেকিন হামার টাকটাতো দেখলেন স্যার! বুড্ডার প্রতি এ কিরপাটুকু আপনাকে কোরতে হোবে।'

"এ আবার কি জাতীয় রসিকতা? ব্যাপারটা ঘুলিয়ে গেল। এ ঘরে থাকবো আমি; ক্বচিৎ ঠিকাদারের উপস্থিতিটা অবশ্য অনস্বীকার্য। কিন্তু সে দু'দণ্ডও কি উনি এটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না? বেশ বাগিয়ে একটা জবাব দিতে যাবো—তার পূর্বেই রামশরণ বল্লেন—

" 'হামাদের ওয়ার্ক সেডে সব ঘরে হামি সিলিং বানিয়ে দিলম। এখন আপনি যদি হুজুরের ঘরে সিলিং না মঞ্জুর করেন তবে হামাদের সব ঘরের সিলিং তো খুলিয়ে নিতে হোবে—না কি বলেন ওভারসিয়ার বাবু?'

"ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত একখানা কাঠের পুতুলের মত নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণ আমাদের এত কথার অর্থগ্রহণ যে তার হ'য়েছে মুখ দেখে তাও বোঝা যায় না। আমরা যেন এতাবৎকাল পুস্তু অথবা ফার্সীতে আলাপচারি করছিলাম। এবার বল্লে, 'দরমাম্যাট সিলিং সিডিউল আইটেম। হাজারখানেক সিলিং বানানোই আছে সাইটে। ওর একটা লাগিয়ে দেওয়া যায়। কাজ শেষ হবার আগে খুলে নিয়ে অন্য ঘরে ফিট করলেই চলবে।'

" 'ব্যাস্ খুব! লেন স্যার! ফয়সলা তো করে দিলেন ওভারসিয়ার বাবু! আপনাদের ওভারসিয়ারবাবুর ব্রেন খুব সাফা। একদিন হইয়েছিল কি—

" 'এবার আমি চলি স্যার। আমার বাসের টাইম হ'য়ে গেল।'

" 'হঁ্যা, হঁ্যা, আপনি যান। কাল সকালে কথা হ'বে।'

"ওভারসিয়ার সুরেন সেনগুপ্ত নমস্কার করে চলে যান। উনি এই রিলিফ

ক্যাম্পে থাকেন না। স্টেশনের ধারে একটা বাসা ভাড়া করেছেন। এখানে আমার দুজন ওভারসিয়ার। অপর জন ক্যাজুয়াল লীভে আছে। অসুস্থ। তার নাম জীবেন কর।

"সগর্জনে এসে দাঁড়ালো সিংজীর শেভ্রলে ট্রাকখানা। ওরই গর্ভে আমার বাক্স-বিছানা। সংসার-যাপনের যাবতীয় সরঞ্জাম। স্টেশন থেকে আমি ওর জীপেই চলে এসেছি। মালপত্র নামিয়ে, লগেজ ভ্যান থেকে সাইকেল ছাড়িয়ে সিংজীর লোক আর আমার অর্ডার্লি পিয়ন রতন পরে ট্রাকে আসবে, এই ব্যবস্থা করেই চলে এসেছিলাম আমি আগে—সিংজীর জীপে! সিংজীও এসেছিলেন সেনগুপ্তের সঙ্গে আমাকে রিসিভ করতে।"

মনে পড়ছে ঋতব্রতের অসহায় স্বীকারোক্তিটা এই প্রসঙ্গে। ও বলেছিল, "প্রথম চাকরি-জীবনের কথা মনে হ'লেও হাসি আসে ভাই। স্টেশনে নেমে যখন দেখলাম আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একখানা ট্রাক আর একখানা জীপ নিয়ে ঠিকাদার অপেক্ষা করছে তখন বড় বিব্রত বোধ করেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল আগমন সংবাদটা টেলিগ্রাম করে না জানালেই ভালো হ'ত। এখন ওর জীপ প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোনও যান ভাড়া করাটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখাবে। অথচ এক স্টেশন লোকের সম্মুখে ঠিকাদারের গাড়িতে ওঠাটাও ঠিক হ'ল কিনা মালুম হ'চ্ছে না! এক্ষেত্রে সরকারী এঞ্জিনিয়াররা কি ক'রে থাকে? এটাতো কলেজে শেখায়নি! মনে হ'ল ল্যাটিশ গার্ডার, প্লেট গার্ডারের নোট মুখস্থ না করে যদি এইসব সহবৎ শিখে রাখতাম কোনও সরকারী ঘাঘু এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে তো কাজ হ'ত।"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"শেষ পর্যন্ত কি করলে?"

"এক্সপিরিয়েন্সড্ লোকের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। রতনের দিকে চাইতেই সে বল্লে, 'আপনি জীপে চলে যান স্যর, আমি মালপত্র নিয়ে ট্রাকে আসছি।' অর্থাৎ আমার জীপারোহণ স্যাংসন্ড্ এবং এ্যাপ্রুভ্ড্! রতন আজ বিশ বছর

অর্ডার্লিগিরি করছে। আমার টেম্পোরারি এ্যাপয়েন্টমেন্ট, কিন্তু রতন পার্মানেন্ট সার্ভিসের লোক। এক ডজন গেজেটেড অফিসার চরিয়েছে সে। এসব ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জীপে আরোহণ যদি নিয়ম-বিরুদ্ধ হ'ত তবে সে কিছুতেই তা রেকমেণ্ড করতো না।"

যাক্, ডায়েরিতে ফিরে আসি।

"ট্রাক থেকে মালপত্র নামিয়ে একে একে ঘরে সাজিয়ে রাখছে রতন। সিংজীর লোক একটা লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেল। আর একজন একটা ঝকঝকে মগ আর এক বালতি জল রেখে গেল বারান্দায়। সিংজী বল্লেন, 'হুজুর এবার মুখ হাঁত ধুয়ে লিন—হামি দেখি আপনার খাবারের কি ইন্তাজাম করেছে হতভাগারা।'

"আমি বাধা দিয়ে বলি, 'না না, খাবার আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আজ রাত্রে আর কিছু লাগবে না। রতন আমার টিফিন-কেরিয়ারটা ?'

"রতন এসে মাথা চুলকে বলে, 'টিফিন-কেরিয়ারের খাবার সব পচে উঠেছে স্যর। যাবে না ? যা গরম গেছে সারাদিন !'

"হতভাগার যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। এ কথাটা ওর সামনে বলার কি দরকার! না হয় একটু পরেই দোকান থেকে কিছু কিনে আনতো।

" 'আপনি মুখ হাঁত ধুয়ে লিন স্যর, হামি দেখছে।'

"বাধা দিয়ে আমি বলি—'না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। দোকান তো কাছেই আছে।'

" 'দুকান কাছে না থাকলেও দূরে থেকে এনে লিতে পারতেন আপনি। সে কোথা নয়; লেকিন রামশরণ সিং থাকতে সে হোবে না হুজুর। ইখানকার দুকান বড় নোংরা স্যর। খেলেই বিমার হোবে।'

"আমি শুধু ইতস্তত করি।

"হঠাৎ হাত দুটি জোড় করে সিংজী নিবেদন করেন, 'দুকানদারকে আপনি যে আট দশ আনা পৈসা দিতেন ওটা হামাকে বকশিশ দিবেন হুজুর। আমি লিয়ে লিব। লেকিন দুকানের খাবার আপনাকে খেতে দিব না।'

"কথা বলতে জানে বটে রামশরণ!

"একটা বড় ডিশের উপর খাবার নিয়ে এবং অপর একটি ডিশে সেটা ঢাকা দিয়ে একজন ভৃত্য জাতীয় লোকের প্রবেশ এবং টেবিলের উপরে সন্তর্পণে স্থাপন। রামশরণ অতি সযত্নে ঢাকাটা খুলতে খুলতে বল্লেন, 'ইথানে কুছুভি মিলে না হুর। আপনার আজ খাওয়াই হোবে না।'

"যে ভঙ্গিতে যাদুকর টুপীর ঢাকা খুলে দেখায় রুমালের বদলে খরগোস, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতেই ঢাক্‌নাটা খুলে ফেলে রামশরণ দেখালেন 'ক্যাম্প বাজারে কুছুভি মিলে না!'

"ছাড়ানো ফল ও মিষ্টান্নে পাত্রটি পূর্ণ! আম ও লিচু এ সময়ে কিছু দুর্লভ নয়—কিন্তু ছাড়ানো বেদানা, কমলালেবু, আপেল? বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এ জায়গায় ও জিনিস বাজারে মেলে না নিশ্চয়ই। তারপর ওগুলো কি? প্যাস্ট্রী না কেক? নিঃসংশয়ে এগুলি কলকাতা থেকে এসেছে সিংজীর সঙ্গেই। অথচ চতুর সিংজীর ভাবখানা যেন তার অধস্তন হতভাগা কর্মচারীরা কি করছে না করছে সে খবরও রাখেন না।

"খাদ্যদ্রব্য প্রসঙ্গে আমাকে আর কোনও কথা তিনি বলতে দেবেন না বলেই হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ও হো! একটা ভুল হইয়ে গেছে। এ রামাওতার, দো দশটো কাঁটি ঔর সুতলি তো লাও। সাবকো মচ্ছরদানি তো খটানে পড়েগি।'

"তারপর সলজ্জ হেসে বল্লেন, 'আর দরমার দেওয়ালে কাঁটিই ফিন লগাবে কৈসে? এহী লিয়ে আপনাকে বলেছিলম হুর, টিসানের কাছে কোয়াটার লিন। ইথানে আপনার হরবখৎ তক্‌লিফ্‌ হোবে।'

"আমি হেসে বলি, 'আরে এখানেই বেশ কেটে যাবে। পাকাবাড়ি নিয়ে আমি কি করব? একা মানুষ, জরু গরু নিয়ে তো আর আসিনি?'

"এক গাল হাসলেন রামশরণ,' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হামি শুনিয়েছে আপনি বচিলর আছেন। আচ্ছা, আপনি ঘবড়াবেন না—সব ব্যবস্থা হইয়ে যাবে।'

"লোকটা বলে কি! থাকবার ঘর দিয়েছে, আসবার গাড়ি দিয়েছে, মুখ ধোবার জল, রাত্রের আহার্য, মায় মশারী খাটাবার দড়িও দিয়েছে! এবার কি রাত্রের শয্যাসঙ্গিনী—অর্থাৎ জরুর ব্যবস্থাও করতে বসবে না কি? এটাও কি ঠিকাদারদের করণীয় তালিকাভুক্ত?

"বল্লাম, 'ব্যবস্থা আবার কি করবেন আপনি? ঘটকালি করবেন নাকি? এখানেই পাকাপাকি ঘর বানাতে হ'বে বোধ হয় বাকি জীবনের জন্যে?'

"যেন অত্যন্ত উঁচুদরের একটা রসিকতা করেছি আমি। হো হো করে হাসলেন প্রাণ খুলে। তারপর বল্লেন, 'আপনাদের তামাম জিন্দিগি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হোবে। একঘরে তো হোবে না হুজুর আপনাদের কারবার। কতো ঘর বনাইবেন? সব জগাহ্‌তেই আপনাদের ঘর বনাতে হোবে। আপনাদের রবীন্দর-নাথজী না বলিয়েছেন 'সব ঠাঁই হমার ঘর আছে হামি সুদূরের পিয়াসী আছি।"

"সর্বনাশ! এ যে দেখি একেবারে গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া! মায় রবীন্দর-নাথজীকে পর্যন্ত পেড়ে ফেলেছে! এতটা মাখো মাখো হবার ইচ্ছা ছিল না আমার আদৌ! তাই মারবার-তনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনা ঐখানে স্থগিত রেখেই আমি মুখ ধুতে বেরিয়ে গেলাম।"

যার ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতিটা তুলেছিলাম সেই ঋতব্রত বোস আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কেমন একটা ধারণা ছিল পরিণত বয়সে সে দশের একজন হ'য়ে উঠবে। ধারণাটা মাস্টারমশাই মহলেও ছিল। হয় উঁচুদরের কবি, লেখক, রাজনীতিক অথবা অমনি কিছু। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই তার সঙ্গে সাময়িক ছাড়াছাড়ি হ'য়েছিল; ও নিয়েছিল সায়েন্স। ছাত্র-জীবন সমাপ্ত ক'রে সে কিন্তু দশ জনের দশম জন হ'ল না, হল মামুলি চাকরিজীবি। তার চাকরি-জীবনের প্রথম অধ্যায়টায় দূর থেকে চিঠিপত্রে যোগসূত্রটা বজায় রেখেছিল সে। পরে

কলকাতায় বদলি হ'য়ে এলে প্রথম চাকরি-জীবনের অভিজ্ঞতাটা সবিস্তারে বলেছিল আমায়। বেশ একটা উপন্যাসের উপকরণের সন্ধান পেয়েছিলাম যেন সে অভিজ্ঞতায়। তাকে জানালাম সে কথা। বল্লাম ওর কাহিনীটা লিপিবদ্ধ করতে চাই। ও যতটা উৎসাহিত হ'ল তার চেয়ে অনেক বেশী উচ্ছ্বসিত হ'লেন ম্যাডাম বোস অর্থাৎ মিসেস্ বসু।

এ কাহিনীর অধিকাংশ রসদই সংগ্রহ ক'রেছি ঋতব্রতের ডায়েরি থেকে। কিন্তু সেই একমাত্র উপাদান নয়। ওদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে সান্ধ্য চায়ের টেবিলে আলাপচারিতে শুনেছি অনেক বিক্ষিপ্ত ঘটনা—যা নাকি স্থান পায়নি ওর ডায়েরিতে। কিছু জেনেছি ম্যাডামের কাছ থেকে যা নাকি নিজ মুখে বলেনি ঋতব্রত। কখনও সংগ্রহ করেছি ওর অর্ডার্লি পিয়ন রতনের কাছ থেকে কোনও সংবাদ, কখনও ওর দাদা বা বৌদির কাছে।

বাংলা বিহারের সীমারেখার কাছাকাছি ঋতব্রতের এই কর্মস্থলটি। যুদ্ধকালে এখানে গড়ে উঠেছিল এই সেনানিবাস। শান্তশিষ্ট পরিবেশে একদিন জেগে উঠেছিল কোলাহল—এল গাড়ি গাড়ি ইঁট, কাঠ, সিমেন্ট, বালি। তার চেয়েও বেশী এল বাঁশ, দরমা, শালের খুঁটি আর খড়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এল বিভিন্ন কারিগর। পাঞ্জাবী ছুতার, সিন্ধি ঠিকাদার, উড়িয়া প্লাম্বার এবং মদ্রদেশীয় কুলি। সারি সারি তৈরী হ'য়ে গেল মিলিটারি ব্যারাক। আশপাশের গাঁয়ের মেয়েরা তালদিঘি থেকে জল নেওয়া বন্ধ করল। গাঁয়ের লোকেরা উনো মাল দুনো দামে বেচে গেল মিলিটারিদের কাছে। গ্রাম্য বালখিল্য বাহিনী কুড়িয়ে নিয়ে গেল খালি টিন, বোতল, সিগ্রেটের কৌটা, কখনও বা দু'এক টুকরো অভুক্ত বিস্কুট—চিজ্। রাতারাতি তৈরী হ'য়ে গেল পীচের রাস্তা, ইলেক্ট্রিক লাইন, এমন কি কংক্রিটের একটা ল্যাণ্ডিং স্ট্রীপ্ পর্যন্ত। দিনরাত মিলিটারি কনভয় ছোটাছুটি করত। গ্রামবাসী বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখতো দৈত্যপুরীর আজব কাণ্ডকারখানা। যেদিন

প্রথম ওখানে এরোপ্লেন নামলো সেদিন ছিল হাটবার। হাট ভেঙে লোক ছুটলো হাওয়াই জাহাজ দেখতে। কাঁটা তারের ওপার থেকে তারা বড় বড় চোখ করে দেখলে বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বিস্ময়! তারপর ক্রমে সেটা এতই গা সওয়া হ'য়ে গেল যে প্লেনগুলো নীচু দিয়ে যাবার সময়ও ঘাড় উঁচু করে ফিরে দেখতো না কেউ।

রাতারাতি গড়ে ওঠা এই ময়দানবের নগরী একদিন আবার জনশূন্য হ'য়ে গেল। থামল কালযুদ্ধ। কালের রথচক্র ঘুরল আর এক পাক। দলে দলে মিলিটারিরা চলে গেল। কর্মচঞ্চল হঠাৎ-গড়ে-ওঠা অত বড় শহর হয়ে গেল স্তব্ধ। পড়ে থাকল পিছনে ভাঙা টিন, মরচে ধরা লোহার টুকরা, ঘর-বাড়ি, ওয়াটার টাওয়ারের জলের ট্যাঙ্ক; আর পড়ে থাকলো হয়তো আশপাশের গ্রামের কৃষক-বধূদের মনে কিসের যেন একটা বিভীষিকার স্মৃতি! দু-একটা নেপালী দারোয়ান শুধু পড়ে ছিল রাস্তার ধারের ঘরখানায়। সরকারী পাহারা। ওদের যেটা কন্‌ট্রোল বিল্ডিং ছিল সেটা পরিণত হ'ল প্রোকিওরমেণ্ট ডিপার্ট-মেণ্টের চালের গুদামে। বাকি ঘরগুলো হ'ল রিক্ত, পরিত্যক্ত। কালবৈশাখীর ঝড়ে উড়ে গেল খড়ের চাল; বর্ষায় দেওয়াল গেল ধ্বসে। কেউ খেয়াল করল না। জানালার গরাদ একটি দুটি ক'রে অপহৃত হ'ল। কেউ বারণ করতে এলো না। ক্রমে জানালা দরজা। শেষে গ্রামবাসী সাহস করে এগিয়ে এলো শাবল হাতে,—দেওয়াল ভেঙে ইঁটগুলোও নিয়ে যাবে ওরা। এভাবে চললে আর দশ বছরেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত মিলিটারি ক্যাম্প।

কিন্তু তা ঘটল না।

আবার একপাক ঘুরল মহাকালের রথচক্র!

গ্রামবাসী সবিস্ময়ে দেখলে আবার এলো নানান জাতের ঠিকাদার। এলো গাড়ি গাড়ি বাঁশ। এলো গাদা গাদা খড়।

পরিত্যক্ত প্রাণহীন পল্লীটি আবার কর্মমুখর হ'য়ে উঠল। সারারাত পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে এখানে ওখানে। রাস্তার মোড়ে নৈশ ভ্রমণরত জীপের

বাঁক নেবার সময় উজ্জ্বল আলোয় ধূমকেতুর পুচ্ছ ঘুরে যায় সমস্ত তল্লাটটার উপর। হাজার হাজার মিস্ত্রী মজুর কাজ ক'রে যায়। সমবেত হয় আবার পাঞ্জাবী ছুতার, সিন্ধি ঠিকাদার, উড়িয়া প্লাম্বার আর মদ্রদেশীয় কুলি। এবার বঙ্গবাসীরাও উপেক্ষিত থাকে না। তারাও আসে। বস্তুত তারাই এবার অতিথি। সারি সারি ট্রাক এসে দাঁড়ায় কন্‌ট্রোল বিল্ডিংটার সামনের মাঠে। অতিথিরা নামে। রণসেনা নয়, মরণ সেনা। ওদের পরণে খাঁকি পোশাক নেই—ছিন্ন মলিন বসন! ওদের কাঁধে রাইফেল নেই, কাঁকে কঙ্কাল-সার শিশু! ওদের মনে যুদ্ধজয়ের দুর্বার প্রেরণা নেই—আছে জীবন-যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি! ফেলে আসা অতীতের বিভীষিকা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক! ওরা এসে গেল দলে দলে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার। নবীনতম রাষ্ট্রের প্রবীণতম আদিম বিদেশী অধিবাসী। সেনানিবাস পরিণত হল আশ্রয়শিবিরে!

আদিপর্বে এটার নামকরণ হ'য়েছিল ট্র্যানসিট ক্যাম্প। অর্থাৎ দুদিনের মুশাফিরখানায় ওরা এসে আশ্রয় নিত মাত্র। তারপর বাছাই করা হ'ত ওদের। যারা শক্ত সবল, তারা চলে যেত পুনর্বাসনে। কেউ কেউ চলে গেল নিজের চেষ্টাতেই; তাদের কারও বা ছিল পুঁজির জোর, কারও বা এ পারে মুরুব্বিগোছের আত্মীয়। সরকারী সাহায্য পেল অনেকেই নতুন করে বাস্তু বাঁধার। বাকি এখন যারা রয়ে গেছে তারা পঙ্গু অথবা অশক্ত। এরা এখন সরকারের স্থায়ী পোষ্য। পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি বা সংক্ষেপে পি. এল.।

মিলিটারি হাঁসপাতালটাই ওদের আরোগ্যালয়। পাওয়ার হাউসটা এখন রেশনের গুদাম। ইলেকট্রিক লাইন উঠিয়ে নিয়ে গেছে। মিলিটারি কনট্রোল বিল্ডিংটা এখন ক্যাম্পের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। এরোপ্লেন নামবার চওড়া ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডটায় এদের বাজার বসে। বাঁশের খুঁটির উপর টিনের ছাদ দিয়ে সারি সারি দোকান বসে গেছে। পানবিড়ি, চাল-আটা, মিষ্টি-মশলার দোকান। মায় চুলকাটার সেলুন, ডাইংক্লিনিং পর্যন্ত।

ক্যাম্পের মেরুদণ্ডের মত উত্তর-দক্ষিণ পাকা সড়ক। একদিকে সেটা শেষ হয়েছে চার মাইল দূরের রেল-স্টেশনে; অপর দিকে বিসর্পিল গতিতে কালো পীচের সড়কটা থানা-সদর ছুঁয়ে স্বীয় সত্তা হারিয়েছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মোহনায়। এই সড়কের উপরেই ক্যাম্পে ঢুকতে বাঁ হাতে পড়ে ক্যাম্প-অফিস, ডানদিকে হাঁসপাতাল। হাঁসপাতালের পিছনে দুটি ছোট ছোট ঘর। ও দুটোর নাম আইসোলেসন ওয়ার্ডস্। সংক্রামক রোগীদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা।

বড় রাস্তাটিকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে তদোধিক চওড়া যে কংক্রিটের রাস্তাটা পূব-পশ্চিমে প্রসারিত ওটাই ছিল ক্লীট-ওয়ে—অর্থাৎ প্লেন নামবার ল্যাণ্ডিং স্ট্রীপ্। এইটারই পূর্বতম প্রান্তে রাস্তাটা গোল হ'য়ে বিরাট এক চক্কর খেয়েছে। বোধ হয় প্লেন ঘুরবার জন্যই এই ব্যবস্থা। ক্লীট-ওয়ের এই অংশটাই এখন বড়বাজার। নাম গোলবাজার। এটা ছাড়াও হাঁসপাতাল ও বড় অফিসের কাছে আর একটা বাজার বসে। এর ঠিক পাশেই ছেলেদের মাইনর স্কুল। এটার নামকরণ হয়েছে স্কুলবাজার। স্কুলবাজারের পশ্চিমতম প্রান্ত ঋতব্রতের অফিস তথা মোকাম। উত্তর-দক্ষিণে বড় রাস্তা এবং পূব-পশ্চিমে লম্বা ক্লীট-ওয়ে যে পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করেনি তা ক্যাম্পের ব্লুপ্রিন্ট দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এদের পারস্পরিক ছেদনে যে চারিটি ভাগ হ'য়েছে তাদের নাম আলাদা। ক্লকওয়াইস ভাবে পড়লে এদের নাম দাঁড়ায় গলাদ', টিকেনপুর, বকুলতলা আর মেমপাড়া। সবটা মিলিয়ে ক্যাম্পের নাম বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প।

এইখানে বলে রাখা ভালো বকুলতলা ক্যাম্পে কোনদিন যাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ঋতব্রতের কাছ থেকে শুনে আর তার দেওয়া ব্লুপ্রিন্ট থেকে যে বর্ণনা দিলাম জানিনা তার সঙ্গে বাস্তবের কতটা সম্বন্ধ। প্ল্যানে দেখছি চারটে জোনাল ডিভিসনের মধ্যে আয়তনে সর্বগরিষ্ঠ হ'ল গলাদ', তারপর মেমপাড়া, তারপর বকুলতলা। আইনত, মানে ডেমোক্র্যাটিক্যালি এ

ক্যাম্পের নাম সুতরাং গলাদ'ই হওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানিনা এর নাম হ'য়েছে বকুলতলা ক্যাম্প। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাতে খুশি। কারণ চারটে নামের মধ্যে ঐ নামটাতেই আছে কিছু পরিমাণে মাধুর্যরস। ক্যাম্পবাসীর জীবনে শ্রী নেই, ছন্দ নেই, মাধুর্য দুর্লভ। অন্তত নামটাও যদি শ্রুতিমধুর হয় 'তাহে কিবা কার ক্ষতি?' তাছাড়া ক্যাম্পের ইতিবৃত্ত লিখতে বসে অনুসন্ধান করেছিলাম নামগুলির উৎপত্তির ইতিহাস। তা থেকেও মনে হ'য়েছে ওদের মধ্যে বকুলতলা নামটাই বরং বরণীয়। মেম-পাড়ায় ছিল সেই সব অফিসারের বাস যাঁরা পরিবার নিয়ে বাস করতেন মিলিটারি ক্যাম্পে। মেমপদরজধন্য এ এলাকার অবশ্য সেদিক থেকে কৌলিন্য নিকষ! টিকেনপুর সম্ভবত কোনও 'স্টিফেন্সে'র স্মৃতিসংযুক্ত। আন্দাজ করা যেতে পারে তিনি ছিলেন কালযুদ্ধে নিহত কোন বড় জঙ্গী অফিসার। গলাদ'র নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ আছে। অনেকে বলেন ওখানে ছিল একটি দহ বা হ্রদ—গলা-জল থাকত তাতে। মিলিটারি আমলে সে জমি ভরাট করে ফেলা হয়। তাই গলাদ' হচ্ছে 'গলাদহ' শব্দের অপভ্রংশ। ঋতব্রত এঞ্জিনিয়ার মানুষ। ফাইললজির নজির সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উড়িয়ে দিয়েছিল। তিনদিকে বিস্তীর্ণ মুক্ত প্রান্তর থাকা সত্ত্বেও জমি ভরাট করিয়ে বাড়ি করতে যাবে কেন মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার? তাই সে খোঁজ করেছিল নামটার উৎপত্তির ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর কাছ থেকে সে শুনেছিল স্থানীয় গ্রাম্য কৃষক-বধূর এক বিচিত্র করুণ কাহিনী। দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত স্টিফেন্সরাই শুধু শহীদ হয়নি; দেশের মিত্র স্টিফেন্সদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 'গলায় দড়ি' দিতে হ'য়েছে গ্রাম্যবধূকেও!

সে যাই হোক বকুলতলা নামটি সার্থক জোড়া বকুলগাছের উপস্থিতিতে। অনুর্বর লাল কাঁকরে জমির মধ্যে এই বকুলতলা অঞ্চলেই আছে একটি পুকুর। ক্যাম্পে ছড়ান আছে অসংখ্য নলকূপ। তার অধিকাংশই অবশ্য অচল। তবু

পানীয় জল নলকূপ থেকেই সংগ্রহ ক'রে সবাই। সকাল থেকে প্রতীক্ষমান কিউ সরীসৃপ। তবু এই পুকুরটিই ক্যাম্পের প্রাণকেন্দ্র। পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক আবহাওয়ায় ওরা মানুষ। নলকূপের জলে কণ্ঠের তৃষ্ণা মেটে। চোখের তৃষ্ণা মেটাতে বৃদ্ধরা এসে বসে বিকালে পুকুরের ঢালু পাড়ে। অল্পবয়সীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর নিস্তরঙ্গ জলকে উর্মিমুখর করে তুলতে। ঐ একফোঁটা গোষ্পদই আজ পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-অড়িয়েলখাঁ বিধৌত গ্রামবাসীর সান্ত্বনা।

এরা আসার পর, এদের মোটামুটি মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হবার পর আর এ ক'বছর বাড়িগুলির সংস্কারের কথা কারও মনে হয় নি। দীর্ঘদিনের আবেদন নিবেদনের পর এ বৎসর বাড়িগুলিকে আশুপ্রাপ্ত মেরামতের ব্যবস্থা হ'য়েছে। চাল ফেলে দিয়ে নতুন চাল হ'বে, দেওয়াল মেরামত, শালের খুঁটি বদলান, দরজা-জানালা সংস্কার তো আছেই, উপরন্তু পুকুর কাটা, রাস্তা মেরামত, ড্রেন, পাকা স্কুলঘর প্রভৃতি নিয়ে বিরাট একটা অঙ্ক অনুমোদন করেছেন সরকার। মাত্র মাস তিনেক কাজ চলেছে এমন সময়ে চাকরি পেয়ে এসে হাজির হ'ল ঋতব্রত। এতদিন কাজটা দেখছিলেন মিস্টার ঘোষাল। মাস খানেক আগে সিনিয়ার ওভারসিয়ার সুরেন সেনগুপ্তকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বদলি হ'য়ে গেছেন। সেনগুপ্তের কাছ থেকে কর্মভার পেল ঋতব্রত তার চাকরির প্রথম কর্মক্ষেত্রে।

ওখানে পৌঁছবার পরদিনই সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে ঘুরে দেখল ঋতব্রত সাইকেলে চেপে। ব্লুপ্রিণ্টটা সঙ্গে নিয়ে সমস্ত এলাকাটার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নিল। মেমপাড়ার ঘরগুলো সব সারা হ'য়ে এসেছে। বকুলতলা অঞ্চলে খান ত্রিশেক বাড়িতে কাজ হ'চ্ছে। অন্যান্য এলাকায় এখনও কাজ শুরু হয়নি। কালবৈশাখীর আগেই দুর্বল ঘরগুলোর খুঁটি পালটানো দরকার আর বর্ষা নামার আগেই প্রয়োজন চাল সারাই করা। স্কুল, রাস্তা বা পুকুর কাটার কাজ বর্ষার পরে হ'লেও চলতে পারে।

ঘরগুলোও আবার সব এক রকমের নয়। কিছু একেবারে পাকা,

অধিকাংশই বাঁশের চটার উপর সিমেন্ট ধরানো। ড্যাব-ওয়াল বলে এদের। এছাড়া মুলিবাঁশ এবং দরমার দেওয়ালও আছে। ছাদ অধিকাংশই খড়ের। টিন, টালি এবং পাকা ছাদও আছে। বাড়িগুলি ব্যারাক-টাইপ। লম্বা লম্বা হল-ঘর। কোনটার একদিকে, কোনটার বা দুদিকেই বারান্দা। হল-ঘরগুলির অনেকগুলির মাঝে দর্মার পার্টিশন ছিল বোঝা যায়। দরমার ফসিল ঝুলছে কোথাও কোথাও। শতকরা আশীখানা বাড়িরই পার্টিশন নেই। তবু শালের খুঁটির চিহ্ন ধরে ওরা নিজ নিজ এলাকা ঠিক করে নিয়েছে। এক হলঘরের মধ্যেই বাস করছে নির্বিচারে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, বৈদ্য—এমনকি জল-অচল জাত পর্যন্ত।

এছাড়া আছে আর এক জাতের ব্যারাক। লোহার ফ্রেমের উপর টিনের গোলাকৃতি শেড। দুপাশের দেওয়াল ও ছাদ একটি অর্ধবৃত্তের রূপ নিয়েছে টিনের ছাউনিতে। এগুলো ছিল মিলিটারি গুদাম। প্রায় আঠার হাত চওড়া পঁয়তাল্লিশ হাত লম্বা এই গুদামগুলির দুই প্রান্তে দুই নির্গমনদ্বার ভিন্ন এতবড় ঘরখানায় বায়ু গমনাগমনের কোনও জানালা নেই। এদের ইংরাজী নাম 'নিশেন-হাট' অথবা 'লাহোর শেড'। বাংলা নাম, ঋতব্রতের পরিভাষায়, 'অন্ধকূপ'!

"স্যর!"

রতন এসে দাঁড়িয়েছে।

"ডাক্তারবাবু একবার দেখা করতে চান।"

"কোথায় তিনি? আসতে বল।" জবাব দেয় ঋতব্রত।

পরদা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরনে ধুতি, হাফশার্ট। পাশ পকেট থেকে স্টেথোটা মাথা উঁচিয়ে পরিচয় ঘোষণা করছে। ভদ্রলোকের মাথার সামনেটা কেশ-বিরল, পিছন দিককার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ চিরুনির অমোঘ আকর্ষণে এসেছে সামনে, উজান বেয়ে ঘাটতি মেটাতে। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় তুলসির কণ্ঠি। সৌম্য মাংসল মূর্তি। যুক্ত করে বিনয়াবনত নম্র নমস্কার ক'রে আসন গ্রহণ করেন ডাক্তারবাবু।

"আপনি আজ প্রায় দিনসাতেক এসেছেন অথচ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসা হ'য়ে ওঠেনি।"

"দোষটা আপনার একার নয়; আমিও যেতে পারিনি আপনার কাছে।"

"আপনি কি ক'রে যাবেন? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি তো সাইকেল নিয়ে কাজ তদারক ক'রে বেড়ান—আপনার সময় কোথা?"

"কাজ সকলেরই থাকে। সেটা প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরিচিত হ'বার প্রতিবন্ধক হ'লে চলবে কেন?"

ডাক্তারবাবু চোখদুটি বন্ধ করলেন, যেন প্রণিধান করছেন ওর কথার সারমর্ম। তারপর ধীরে সুস্থে চোখ খুললেন, কিন্তু ঋতব্রতের দিকে না তাকিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন তার মাথার আন্দাজ ছয় ইঞ্চি উপরে।

"কথাটা বলেছেন ভালো। কিন্তু কি জানেন মিস্টার বসু—সকলেই কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে, এই স্বাভাবিক সত্যটা বোঝেন না। আট মাস হ'ল আমি এখানে এসেছি, অথচ কারও সঙ্গে মেলামেশাটা জমে ওঠেনি। সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত। আলাপ করবার মতো সময় কারও নেই। এক ভৈরববাবুর সঙ্গে একটু গল্পসল্প করি।"

"ভৈরববাবু কে?"

"ডেপুটি ক্যাম্প-সুপার। অমায়িক ভদ্রলোক।"

বলে অমায়িক মুখ করে তিনি চোখ বুজে রইলেন। অল্পক্ষণের আলাপেই ঋতব্রত বুঝতে পারলে এটা ভদ্রলোকের একটা মারাত্মক মুদ্রাদোষ। অপরের কথা শোনার সময় উনি নিমীলিত নেত্র, আর কথা বলার সময় তাঁর দৃষ্টি পড়ে শ্রোতার মাথার উপরের কোন এক স্থির বিন্দুর প্রতি। ক্রমশই ঋতব্রত গলদঘর্ম হ'য়ে উঠল এই অদ্ভুত মুদ্রাদোষের জন্যে। কত রকম ইডিওসিনক্রেসিই না থাকে লোকের! গত আট মাসের মধ্যে ডাক্তারবাবুর বন্ধু না জোটার এটাই কি কারণ নাকি?

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার অপর একটি বিশেষ কারণও ছিল। প্রথম আলাপেই সেকথা বলাটা সঙ্গত হ'বে কিনা বুঝছি না।"

এই পর্যন্ত উর্ধ্বমুখ হ'য়ে নিবেদন ক'রে ডাক্তারবাবু নিমীলিত নেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। স্মিত হাসিটি লেগে রয়েছে ওষ্ঠপ্রান্তে। অর্থাৎ এবার ঋতব্রতকে বলতে হ'বে:

"না, না, তাতে কি হ'য়েছে? বলুন না।" ঋতব্রত বল্লও তাই।

"হয়নি কিছুই। তবে আপনার হয়তো মনে হ'তে পারে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করতে আসাটা শুধু সৌজন্যের খাতিরেই নয়—স্বার্থ প্রণোদিত।"

আবার হাসি হাসি মুখে উনি চোখ বোজেন।

অর্থাৎ তুমি বল 'বারে, সে কি কথা, তা মনে করব কেন?'

কিন্তু ঋতব্রত এবার আর তা বল্ল না। দেখিই না কি হয়, ভাবখানা ওর। ডাক্তারবাবু ধ্যাননিমীলিত লোচনে প্রতীক্ষা করেই রইলেন। এ তো বড় অস্বোয়াস্তি। এতক্ষণে ঋতব্রত বুঝে নিয়েছে কেন লোকে ওঁকে এড়িয়ে চলে। মুদিত নেত্রে সহাস্য বদনে বসে আছেন তো বসেই আছেন তিনি। আর ঋতব্রত ভাবছে অন্য কথা—আচ্ছা ওঁর এই মুদ্রাদোষের সুযোগ নিয়ে কোনও বিড়ম্বিত আলাপনরত ব্যক্তি কখনও স'রে পড়েনি?

"কি? তাও তো মনে করতে পারেন আপনি?" চোখ বুজেই তাগাদা দেন উনি। ভারী রাগ হ'য়ে গেল ঋতব্রতের। বল্লে, "দেখুন ডাক্তারবাবু, এ সন্দেহ যখন আপনার মনে জেগেছে, তখন আমার মনে হোক আর নাই হোক, আজ নাই বল্লেন কথাটা। জরুরী কিছু নয় নিশ্চয়ই।"

ডাক্তারবাবু চোখ খুললেন। মাথার ছয় ইঞ্চি উপরে নয়—এই প্রথম তাঁর দৃষ্টি সোজা এসে পড়লো ঋতব্রতের চোখের উপর। একবার ঢোক গিলে বল্লেন, "না, ব্যাপারটা জরুরীতো বটেই। তাছাড়া আপনি যখন বলছেন যে তেমন কিছু মনে করবেন না, তখন বলেই ফেলি, কি বলুন?"

"বলুন।"

"ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আমার কোয়ার্টার্স'টা রিপেয়ার করবার সময় কয়েকটি কাজ করিয়ে দিতে হবে যা নাকি এস্টিমেটে ধরা নেই। একটা বাউণ্ডারি দেওয়াল তুলতে হ'বে ;—বাথরুমটা একটু বাড়াতে হ'বে আর ইয়ে চাকরদের জন্য একটা বাড়তি ঘর করাতে হ'বে।"

গম্ভীর হ'ল ঋতব্রত। বল্লে, "আচ্ছা দেখি স্যাংসন্‌ড্‌ এস্টিমেটে কত টাকা ধরা আছে ওটা রিপেয়ার্সে'র জন্যে।"

"এই যে দেখুন না।" ডাক্তারবাবু বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা কয়েকখণ্ড কাগজ বার করলেন, তাতে এস্টিমেটের খানতিনেক পাতা কপি করা ছিল। তাঁর বাড়িটা মেরামতের অংশটুকু। অবাক হল ঋতব্রত। এস্টিমেটের কপি ডাক্তারবাবুর কাছে যায় কি করে?

"অন্যান্য কাজগুলি ওভারসিয়ারবাবুই ক'রে দিতে রাজী হয়েছেন, শুধু ঐ বাড়তি ঘরটা বানাতে তিনি রাজী নন। বলেন, সাহেবের পারমিশন লাগবে। আপনি স্যর একটু—"

"ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত বলেছে এস্টিমেটের বাইরের ঐ কাজগুলি আপনাকে করে দেবে?"

"ইচ্ছা করলে আপনারা তো সবই পারেন স্যার!"

ঋতব্রত মনে মনে চটে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত কোন সাহসে কথা দেয় ডাক্তারবাবুকে?

"তাহলে আজ উঠি। আপনি সুরেনবাবুকে একটু বলে দেবেন স্যর—"

"আমি দুঃখিত ডাক্তারবাবু। এই বাড়তি কাজগুলো করানো সম্ভবপর হবে না। স্যাংসন্‌ড্‌ এস্টিমেটে এর জন্যে টাকা ধরা নেই।"

ডাক্তারবাবুও যেন এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আহত হন। বলেন গম্ভীর হ'য়ে, "সেটাই যদি আপনার একমাত্র অসুবিধা হয়, টাকার ব্যবস্থা আমি করব। আপনি ওটা করিয়ে দেবার অর্ডার দেবেন শুধু।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কাজ করবে আমার ঠিকাদার, আর টাকা দেবেন আপনি। মানে?"

"মানে আবার কি? মানে ঐ।"

"কী আবোল-তাবোল বকছেন মশাই! নিজের পয়সায় বাড়ি সারাতে চান তো আমার কাছে এসেছেন কেন?"

এবার উঠলেন ডাক্তারবাবু—

"সরকারী বাড়ি নিজের পয়সায় সারাতে গেলেও এস্. ডি. ওর অনুমতি লাগে। আপনাকে আমি শুধু বলছি এই কাজগুলো করিয়ে দিন, টাকাটা দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। অর্থাৎ আমার হাসপাতাল মেরামতের কয়েকটা আইটেম কম করিয়ে বাড়তি খরচটা পুষিয়ে দেবো। কোন্ এঞ্জিনিয়ার আপনাদের এই এস্টিমেট করেছেন জানি না, কিন্তু ডাক্তারের বাড়ির বেড়া, বাথরুম যার নজরে পড়ে না—যাক্, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি অনুগ্রহ ক'রে একবার হাঁসপাতালে আসবেন তখন কথা হ'বে। আচ্ছা নমস্কার।"

ডাক্তারবাবু মেদবহুল বপুটি নিয়ে রওনা দিলেন। ঋতব্রতের মনে হল নাক থেকে ওলন ধরলে ভুঁড়ির কাছে দু' ইঞ্চি বেধে যাবে। মনে মনে হাসলে সে। ভগবান যদি রাজমিস্ত্রি হতেন তবে এমন "আউট-অফ-প্লাম্ব" গাঁথতির দাম দিত না সে।

ডোল অফিসের সামনেটায় প্রচণ্ড ভীড়।

দরমার বেড়া দেওয়া অফিসের সামনে গাদাগাদি করে বসে আছে জনতা। পরিবার পিছু ওরা পাবে একখানা করে কম্বল। একধারে কম্বলের স্তূপ, অপর ধারে প্রতীক্ষমান ক্যাম্পবাসী;—মাঝখানে ছোট্ট হাইফেনের মত একটা টুল নিয়ে বসে আছেন ডিস্ট্রিবুশান কেরানী ললিতবাবু। একটা বৈজ্ঞানিক উপমা মনে পড়ল এখানে ঋতব্রতের। ললিতবাবু আজ 'ক্যাটালিটিক এজেন্ট' মাত্র! দ্বন্দ্ব-সমাসের হাইফেন সদৃশ ঐ ক্যাটালিটিক এজেন্টটিই

রেশান-কার্ডে লিখিয়ে পরিবার পিছু একখানা করে কম্বল বিতরণ করছে। কম্বলগুলো শীতকালে আসার কথা ছিল। ওয়াগন বিভ্রাটে এতদিনে এসে পৌঁচেছে। কি একটা বচসা বেধেছে প্রতীক্ষমান জনতার মধ্যে। সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ঋতব্রত ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে, দেখা হ'য়ে গেল ক্যাম্প-সুপার দফাদারের সঙ্গে।

"কি হল ? ফিরে যাচ্ছেন যে ?"

"হ্যাঁ ; ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করব, কিন্তু আপনারা এখন ব্যস্ত—"

"কিছু না, কিছু না। ও তো লেগেই আছে। আসুন ভেতরে।"

ক্যাম্প-সুপারের সঙ্গে ঋতব্রত ঘরে গিয়ে বসে। দফাদার চায়ের হুকুম দিলেন।

"তারপর, আপনার কাজকর্ম কেমন বুঝছেন ?"

"এই ত সবে এলাম—এখনও কিছু দেখে উঠতে পারিনি।"

দফাদার মিশুকে লোক। দিল দরাজ। অল্পক্ষণের আলাপেই খুশি হয় ঋতব্রত। নানান আলাপের পর হঠাৎ গলাটা নামিয়ে নিয়ে দফাদার বল্লেন,

"মিস্টার নক্র দেখলাম আপনার অফিসে গিয়েছিল আজ। ব্যাপার কি ?"

"মিস্টার নক্রটি কে ?"

"ওঃ, এখনও নামটা কানে যায়নি বুঝি ? ক্যাম্পে ডাঃ সাধুচরণের নাম শ্রীমান নক্র।"

হাসলে ঋতব্রত। বল্লে, "নামকরণটা কে করেছে জানি না। তবে ওঁকে দেখে আমার অন্য একটি নামকরণ করতে ইচ্ছা হয়েছে। আউট-অফ-প্লাম্ব।"

"সেটা আবার কি ?"

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাখিল করে ঋতব্রত। দিলখোলা হাসি হাসেন দফাদার। তারিফ করেন নামকরণের। ঋতব্রত জানালো ডাক্তারবাবু হাসপাতালের লেডিস ওয়েটিং রুমটা করাতে চান না। তিনি চান ঐ টাকায়

তাঁর কোয়ার্টার্সে একটা চাকরদের ঘর করে দিতে। হাসেন দফাদার। বলেন, "ভুল বুঝেছেন আপনি। মিস্টার আউট-অফ-প্লাম্ব লেডিস ওয়েটিং রুমটাই করতে বলেছেন। তবে সাইটটা হাসপাতাল সংলগ্ন না হয়ে গৃহ-সংলগ্ন হ'বে মাত্র।"

"আমি ঠিক বুঝলাম না।"

আবার হা হা করে হাসেন দফাদার। "বুঝবেন মশাই বুঝবেন। যাক না দুদিন। একদিনে বেশি বোঝা ভাল নয়। আসুন, আপনার চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

চা খেতে খেতে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে একজন বৃদ্ধ। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে উদাস অন্ধ দৃষ্টি। গায়ে অসংখ্য তালি দেওয়া ধূলি-মলিন একটা কামিজ; ছিন্ন বসন। বৃদ্ধ সোজা এসে উপুড় হ'য়ে পড়লো ঋতব্রতের প্রায় পায়ের উপর। সামলাতে সামলাতে খানিকটা চা পড়ে গেল ওর গায়ে। সারা অফিস হাঁ হাঁ করে উঠল। অন্ধ দৃষ্টি মেলে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে যাচ্ছিল বৃদ্ধ, বিন্দু-বিসর্গও বোঝা যায় না। অফিসের দারোয়ান এসে জামার কলার ধরে টেনে তুললো বৃদ্ধকে। দফাদার ধমক দিলেন, "কেন ঢুকতে দাও এমন করে? কি হ'য়েছে ওর? ললিত!"

বারান্দার টুল থেকে উঠে আসেন ললিতবাবু। হাতে কলম। বলেন, "আর বলেন কেন স্যর! ও নিজের নামে একখানা কার্ড করিয়েছে আবার ছেলের নামে একখানা। কার্ড পিছু দুখানা কম্বল দাবি করছে। অথচ এভাবে দিতে গেলে সকলের কুলাবে কেন?"

"সেটা ওকে বুঝিয়ে বললেই পারো।"

"এক ঘণ্টা ধরে তাই তো বোঝাচ্ছি স্যর। তাছাড়া এই কি একটা কেস? এ বেটারা সবাই এমনি করে কার্ড বাড়িয়েছে। মায়ের নামে একটা কার্ড, মেয়ের নামে আর একটা। দু' ভাইয়ের আলাদা কার্ড। কি করব বলুন?"

দফাদার বৃদ্ধকে ডেকে পাঠালেন। অন্ধ দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালো ঋতব্রতের সামনে। ঘোলাটে চোখ দুটোর কোণায় পিচুটি লেগে আছে, মুখের কস্ বেয়ে নেমেছে সাদা একটা দাগ।

"আবার ওঁর কাছে গেলে কেন—আমি ডাকছি তোমায়।"

"আঁইজ্ঞা ?" বৃদ্ধ ঘুরে দাঁড়ায় শব্দ লক্ষ্য ক'রে।

"তোমার নিজের নামে একখানা কার্ড করিয়েছ, আবার তোমার ছেলের নামে আর একখানা কার্ড কেন ?"

"আঁইজ্ঞা এ হুজুর আমার ছেরা্য না।"

দরজার কাছ থেকে হৈ হৈ করে ওঠে জনতার মিশ্র কণ্ঠ। '…পোলা নয় ?…ছেইল্যা নয় ?…ছেরা্যার মাথায় হাত রাইখ্যা কও দিকিন চাঁদু।…' আরও দূর থেকে ভেসে আসে আরও কতকগুলি মন্তব্য—অশ্লীল ইঙ্গিত তাতে ভরা।

গর্জন করে ওঠেন দফাদার। ছুটে আসে দারোয়ান। ভীড় ফাঁকা হ'য়ে যায়।

"হরিদাস তোমার ছেলে নয় ?"

"আঁইজ্ঞা না।"

"ওর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারো এ কথা ?"

ঠোঁট দুটো ঈষৎ নড়ে ওঠে বৃদ্ধের। কি যেন বলতে যায়। তারপর বসে পড়ে। দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল সে।

"কি হল তোমার ?" প্রশ্ন করেন দফাদার।

কান্নায় ভাঙা ঘড়ঘড়ে গলায় কি যেন জবাব দেয় বৃদ্ধ। সব কথা বোঝা যায় না। ভাবার্থটা—এত বড় কথা…আজ না হয় সে দুর্দশায় পড়েছে…গাঁয়ে তারও পাঁচ বিঘা জমি ছিল…গাই ছিল…আজ তার দুরবস্থা দেখে হুজুর পর্যন্ত বলেন ছেলের মাথায় হাত দিয়ে কথা বলতে…বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র সন্তানকে হারালে কি খুশি হন হুজুর ?

দফাদার বলেন, "কি আশ্চর্য। তুমিই তো বল্লে তোমার ছেলে নয়।"

"আঁইজ্ঞা, আমার ছের‍্যা না তো কার ছের‍্যা ? অহন এ্যারে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করছি।"

হেসে ফেলেন দফাদার। ঘরের ও-কোণা থেকে রসিকতা করেন ডেপুটি সুপার ভৈরবচন্দ্র, "করেছ কি ? অত বড় সম্পত্তি থেকে একমাত্র ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলে ! আবার দত্তক নেবে নাকি ? বল তা হ'লে রাজী হয়ে যাই আমি !"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে গেল দফাদারের। ভৈরবচন্দ্রের প্রতি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে তিনি বৃদ্ধকে বল্লেন, "এখন যাও। সব বিলি হয়ে গেলে যদি বাঁচে, তবে আর একখানা কম্বল পাবে তুমি।"

বাহাদুর ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ঘরে ক্ষণিক নীরবতা। দফাদার যেন ভৈরবচন্দ্রকে কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। হঠাৎ ঋতব্রতের দিকে ফিরে বল্লেন, "আসবেন এক সময়ে আমার বাসায়—আলাপ করা যাবে।"

ঋতব্রতও যেন রেহাই পেয়ে গেল।

ঘর ছেড়ে সাইকেলে চেপে কাজ দেখতে বের হ'ল সে।...ছোট বড় ব্যারাক বাড়ি। পাশাপাশি। ওর কোটরে আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য ভূতপূর্ব-মানুষ। ওরাও নাকি একদিন আমাদেরই মত হাসতো, খেলতো, রোজগার করতো, খরচ করতো, তুলে রাখতো ভবিষ্যতের সঞ্চয়।

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত নমস্কার করে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। কাজের সম্বন্ধে কি জানতে চায় সে। সাইকেল থেকে নেমে ঋতব্রত এগিয়ে যায় কাজের ওখানে। পি/৩৭ নম্বর ব্যারাক। মিলিটারি আমলের নামেই ব্যারাকের পরিচয়। শালের খুঁটির উপর খড়ের চাল, বিরাট বড় একটা হলঘর। মাঝে পিঠা-মুলি বাঁশের ছেঁচা বেড়া।

সেনগুপ্ত বলে, "একত্রিশটা খুঁটি বদলাবার কথা আছে এটায়। সবশুদ্ধ একশো সতেরটা খুঁটি আছে। সবগুলোই প্রায় পচে গেছে। কি করব, একটু দেখে দিন।"

সত্যিই তাই। যে গোটা দশেক খুঁটির গোড়া খুঁড়ে রাখা হ'য়েছে তার সব কটির তলাই পচে গেছে। ঋতব্রত বল্লে, "আপাততঃ একত্রিশটা বদলে দিন। পরে এক্সিকিউটিভকে জানিয়ে দেখব।"

একসঙ্গে চিৎকার করে কথা বলে ওঠে আশপাশ থেকে কয়েকজন। "একত্রিশডা খুঁটি বদলান্ও যা, না বদলানও তাই…মরতাম হয় এইহানয়ই মরবাম্…আম্‌রার পরাণ পরাণ না…আমরা তো রিফুঃ …ঝড় যহন আইয়ে আপনারা তো থাহেন পাকা কোঠার তলাৎ!"

বিব্রত বোধ করলে ঋতব্রত। কোথা থেকে ধমক দিয়ে ওঠে সিংজী ঠিকাদার। ওরা চুপ করে যায়।

"কটা পোস্ট বদ্‌লালে ঘরটা যথেষ্ট শক্ত হয় মনে করেন সুরেনবাবু?"

"সবগুলোই বদলানো দরকার স্যর।"

"কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়।"

ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত নিরুত্তর। সিংজী বল্লে, "হামি বল্‌ব হুজুর? পঁচাশটা বদলিয়ে দিন।"

"পঞ্চাশটায় কিছু হবে না।" সেনগুপ্তের সাফা জবাব।

"হোবে ওভারসিয়ার বাবু, হোবে। পঁচাশটা বদলিয়ে দেন, ঔর বাদ বাকিমে ঠেকা দিইয়ে দেন। না কি বলেন স্যর?"

অকূলে কূল পায় ঋতব্রত। হাঁ তাই করা হোক। ও আবার সাইকেলে উঠবার উপক্রম করে। সিংজী সেনগুপ্তকে মনে করিয়ে দেয়, "কোলটারিংটার কোথা ভি বলেন।"

"ও হ্যাঁ, শালের খুঁটিতে আলকাতরা মাখাবার জন্যে সিংজী দু ব্যারেল আলকাতরা এনেছিল। অতি রদ্দি মাল। আমি রিজেক্ট করেছি। সেই সম্বন্ধে সিংজী আপনাকে কি বলবে।"

ঋতব্রত সিংজীর দিকে মেলে ধরে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি। সিংজী পাগড়ির প্রান্তভাগ দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে ফেলে বলে, "হ্যাঁ জী, মাল খরাপ আছে

—ই বাত হামি মানিয়ে নিলম। লেকিন হাতের পাঁচটা আঙ্গুলভি তো একসাইজ হোয় না স্তর! ও দু ব্যারেল ভি মিশায়ে লিই?"

ঋতব্রত গম্ভীর হ'য়ে যায়। না, তা সে হ'তে দেবেনা। ভাল মাল নেবার জন্যে পয়সা দেওয়া হ'বে ঠিকাদারকে। দু ব্যারেল রদ্দি মালই বা সে নেবে কেন? আলকাতরার আবার ভালো-খারাপ মাল থাকে নাকি? ভাগ্যি সিংজী নিজেই মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা। না হ'লে মুশকিলে পড়তে হ'ত তাকে। বল্লে, 'হাতের পাঁচটা আঙুল পাঁচরকম হ'তে পারে—কিন্তু সরকারী নোটগুলো—যা আপনি পাবেন, তা সব এক মাপের। ওটা চলবেনা।"

"দু ব্যারেল আলকাতরা নষ্ট হোবে স্তর?"

"নষ্ট হওয়াই উচিত। আপনি মাল ফেরত পাঠিয়ে দিন।"

"দুবার যাতায়াতে মালের ভাড়া যে দামের চেয়ে বেশি হোবে স্তর?"

"তার জন্যে আমি দায়ী নই। কলকাতার যে এজেন্ট আপনার মাল খরিদ করে, তার কমিশন বা পাওনা থেকে কেটে নেবেন লোকসান।"

অতি কাতরভাবে আরও দু একবার অনুরোধ করে সিংজী। ঋতব্রত কিন্তু নাছোড়বান্দা। এইসব ঠিকাদারের প্রতি একবিন্দু করুণা নেই তার। সে কিছুতেই একফোঁটা খারাপ মাল নিতে দেবে না। তখন বাধ্য হ'য়ে সিংজী প্রস্তাব করল—হুজুর যদি অনুমতি করেন, তবে পুরানো সালবল্লাগুলোতে লাগিয়ে দেবে ওটা। দাম সে চায় না। মালটা ফেলে দিলেও লোকসান, ফিরিয়ে দিলেও তাই। যাক ওটা ওভাবে খরচ হ'য়ে। এতে আপত্তি করার কোন কারণ ঋতব্রত খুঁজে পেল না। নতুন শালখুঁটিতেই শুধু আলকাতরা মাখাবার কথা। পুরানোগুলোতে যদি সিংজী নিজের খরচে আলকাতরা মাখায় এবং দাম না চায় তবে তার আবার আপত্তি কিসের? সে অনুমতি দিল। সেনগুপ্ত সাইট-অর্ডার বইখানি এগিয়ে দিল। লিখিত অর্ডার চায় সে।

"লিখিত-অর্ডার? বেশ।" খস্‌খস্ করে লিখে দিল সে। এর জন্যে দাম পাবে না, ওভারসিয়ার যেন এই আলকাতরা মাখানর জন্যে কোথাও কোনও মাপ

না তোলে এম. বি. তে, এ কথাও লিখলো এবং আণ্ডারলাইন করে দিল সেটা।

কলম থেকে মুখ তুলে দেখে সিংজী এবং সেনগুপ্তের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিল একটা। ওকে তাকাতে দেখে দুজনেই সামলে নিলে। ঋতব্রত বল্লে, "কিন্তু এতে আপনার লাভ?"

লাভ সিংজীর কিছু নেই। ওটা দরিয়াতে ঢেলে দেবার চাইতে এটাই ভালো হল না কি? অর্থাৎ কিছু পুণ্য-সঞ্চয় করল ঠিকাদার রামশরণ।

ঋতব্রত খুশি হয়। সাইকেলে উঠতে উঠতে ভাবে এই ধর্মজ্ঞানটুকু না থাকলে এই শ্রেণীর লোককে মানুষ বলেই চেনা যেত না। রওনা হ'য়ে পড়ল সে দ্বিচক্রযানে।

নামতে হল কিন্তু একটু পরেই।

পথের উপর একটি বিধবা মহিলা তাকে নামতে বলছেন। নিরাভরণা প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। ক্যাম্পের বাসিন্দা। মাথায় আধো ঘোমটা।

"আমায় বলছেন?"

"হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি বাবা।"

ঋতব্রত এগিয়ে আসে। প্রৌঢ়া বল্লেন তাঁর ঘরে একটি দরমার পার্টিশন দিয়ে দেবার জন্যে ঠিকাদারের লোকজনকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। তারা রাজী হয়নি। ওভারসিয়ারবাবুকেও তিনি জানিয়ে ছিলেন তাঁর আবেদন। ফল হয় নি। ঋতব্রত বুঝিয়ে বল্লে পার্টিশন করার আদেশ নেই। যেখানে পুরানো পার্টিশন দেওয়াল আছে সেটাই শুধু মেরামত করা চলবে। নতুন পার্টিশন দেওয়াল করা যাবে না। প্রৌঢ়া কয়েকবার বিনীত অনুরোধ করলেন। ঋতব্রত ক্রমে বিরক্ত হ'ল। এরা সবাই চায় নিজের ঘরটিকেই খালি ভালো করে সারাতে। শেষে বল্লে, "দেখুন, এখন কালবৈশাখীর সময়—যে কোনও দিন ঝড় আসতে পারে। আগে ঘর মেরামত শেষ হ'য়ে যাক। পরে টাকা থাকলে পার্টিশন দেওয়াল করা যেতে পারে। এখন ও অনুরোধ করবেন না।"

প্রৌঢ়া আর আপত্তি করেন না। ঋতব্রত সাইকেলে চেপে সোজা চলে আসে হাঁসপাতালে। ডাক্তারবাবু ঋতব্রতকে অত্যন্ত খুশি হ'য়ে আপ্যায়ন করলেন। সেদিনকার স্মৃতি তিনি মনে রাখেননি বোধ হয়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর হাঁসপাতালটা দেখালেন। ডিসপেনসারিতে একটা কাউণ্টার জানালা বসাতে হ'বে। মেল-ওয়ার্ডটা ঝড়ে কাত হয়ে পড়েছে। ভগবান জানেন কটা খুঁটি বদলাতে হবে তার। ঋতব্রত ওভারসিয়ারকে বল্লে আজ বিকালেই কয়েকটা শালখুঁটি দিয়ে বাইরে থেকে ঠেকা দিতে। ঝড় এলে এটা ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। স্টেরিলাইসিং রুমের ওপাশের একটি ঘর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ঋতব্রত বল্লে, "ওটি কি ছিল?"

"ওটি ও. টি. ছিল।"

"মানে?"

"অপারেসন থিয়েটর।" একচালা ঘরটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডাক্তারের বসবার ঘরের পিছনে আলমারি দিয়ে আড়াল করে অস্ত্রোপচার এবং প্রসবঘরের বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে।

ডাক্তারবাবুর বাড়ি হাঁসপাতালের লাগাও। সাধুচরণ নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালেন অতিথিকে। নিজেই চায়ের জল চাপিয়ে দিলেন স্টোভ জেলে। ডাক্তার সাধুচরণ বিবাহিত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কাউকেই তিনি এই ক্যাম্পে নিয়ে আসেন নি। সাধুচরণের মতে ক্যাম্পের নৈতিক জীবন পরিবার-ভুক্ত অপরিণতদের মনে রেখাপাত করতে পারে। তাই তিনি একেবারে একাই থাকেন।

চা পানান্তে ডাক্তার সাধুচরণ তাঁর বাড়ির কাজগুলি দেখাতে লাগলেন। ঋতব্রত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তাঁর বাড়ির চারদিকে পুরানো টিনের বেড়া দেওয়া হ'য়ে গেছে। বাথরুমটাও ভেঙে সম্প্রতি বড় করা হয়েছে। এ বিষয়ে সেদিন ডাক্তারবাবুর অনুমতি নিয়ে যাওয়া বাহুল্য মাত্র।

"এগুলো স্যর ওভারসিয়ার বাবুই করে দিয়েছেন। এখন শুধু আমার

সার্ভেন্টস্ রুমটা করিয়ে দিন আপনি। আপনার এস্টিমেটে একটা লেডিস ওয়েটিং রুম করার কথা আছে হাঁসপাতালে ; সেটা আমার প্রয়োজন নেই। তার বদলে এখানে একটা বাড়তি ঘর করে দিন শুধু।"

"দেখুন ডাক্তারবাবু, মেয়েদের বিশ্রামাগারে আপনার প্রয়োজন না থাকতে পারে কিন্তু ক্যাম্পের মেয়েদের সেটা প্রয়োজন। এটা আপনি অন্যায় অনুরোধ করছেন।"

"আজ্ঞে না। আপনিই অন্যায় জিদ করছেন। হাঁসপাতালে কি করার দরকার না দরকার সেটা আমিই বিবেচনা করব।"

"বিবেচনা আপনি করতে পারেন। আমি কিন্তু সরকারী স্যাংসন্ড এস্টিমেটের এক বিন্দু এদিক ওদিক করতে পারব না। এস্টিমেটের বাইরে এ কাজগুলোই বা কেন করেছে ওভারসিয়ার আমি খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু আর ওসব চলবেনা।"

চোখদুটি বুজে গেল ডাক্তার সাধুচরণের। বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে বিগলিত হ'য়ে নিমিলিত নেত্রে তিনি বল্লেন, "দেখুন, সদ্ভাব বজায় রেখে আপনি এটা করে দেবেন এটাই আশা করেছিলাম আমি। আপনি রাজী না হ'লে উপর থেকে অর্ডার করিয়ে আনতে হ'বে আমাকে। সেই করবেন শেষ পর্যন্ত, মাঝের থেকে খামোখা হয়রানি হবে আমার।"

"উপর থেকে হুকুম নিয়ে এলে আমিও সানন্দে আপনার ঘর করে দেবো ডাক্তারবাবু। তবে উপরওয়ালাকে আমিও জানাবো যে আপনার বাড়তি ঘরের চেয়ে হাঁসপাতালের ওয়েটিং রুমটার প্রয়োজন অনেক বেশি।"

হাসি হাসি মুখেই জবাব দেন সাধুচরণ, "গায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করাটা যদি বাঞ্ছনীয় মনে করেন আপনি, করে দেখতে পারেন। তবে আমি বলছিলাম কি, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদটা না করাই ভালো।"

ঋতব্রত চটেনি। ভারি হাসি পেল তার, বল্লে, "আপনি কিন্তু ভুল করছেন

এবার ডাক্তারবাবু। জলে যদি কোনও মানুষ কখনও বাস করতে বাধ্যও হয়, তবু নক্র-জাতীয় কোন জীবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সম্ভব হয় না।"

"কি বল্লেন? কি জাতীয় জীব?" বৈষ্ণব সাধুচরণের মূর্তি তখন ঠিক তৃণাদপি সুনীচেন নয়।

ঋতব্রত প্রকাশ্যেই হেসে ফেলেছে, "ঐ যে আপনি বলছিলেন না জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ না করাই ভালো। তাই বলছিলাম নক্র-জাতীয়। নক্র মানে কুমীর।"

চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে সাধুচরণের। একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের হ'ল না। 'নক্র' শব্দটা প্রকাশ্যে কেউ তাঁর সামনে উচ্চারণ করতে পারে—এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলতে পারে এটা যেন বিশ্বাস হয়নি তাঁর।

ছোট্ট একটা নমস্কার করে পথে নামলো ঋতব্রত। রাস্তায় এসেই ওভারসিয়ারের কৈফিয়ৎ তলব করল সে। ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত বল্লে—আগের এস. ডি. ও'র মৌখিক আদেশ মতো এটুকু বাড়তি কাজে সে হাত দিয়েছে। সেনগুপ্ত বলে, "কিন্তু ডাক্তারবাবুটি...মানে...লোক খুব ইয়ে নন..."

বাধা দিয়ে ঋতব্রত বল্লে, "জানি। কুমীরের ভয় থাকলে তাঁকে বলবেন আপনি—আমার হুকুমেই করতে পারেন নি। তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার।"

মিস্টার নক্র! না, দফাদারেরই জিত হ'য়েছে। ঐ নামটাই ভালো। ছেলেমানুষের মতোই আপন মনে ঋতব্রত হেসে ফেলে।

রান্না করবার জন্যে একটি লোক খুঁজছিল ঋতব্রত। অন্যান্য সমস্ত কাজ রতনই ক'রে; কিন্তু রান্নায় সে কলির দ্রৌপদী! রতনের বোধহয় বক্তব্য খাওয়াটাই আর্ট—রান্না করাটা কিছু না। ডালে লবণাধিক্য এবং ঝোলে লবণাভাব বলে হাহুতাশ করলে পাচকের কুখ্যাতির চেয়ে ভোক্তার নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায় বেশি। এটুকুও কি বলে দেবার প্রয়োজন যে ডাল

ও ঝোল একত্রিত করলেই লবণের পরিমাণ সমান হবে? এঞ্জিনিয়ার হ'লে কি হবে, রতনের বিশ্বাস, ঋতব্রত অঙ্কশাস্ত্রে ঠিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেনি। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক দুইটি সমসংখ্যার সমন্বয়ে কোন্ সংখ্যার উদ্ভব হয় এটা যদি ঋতব্রত না বোঝে তবে তার অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষার খাতায় সেই সংখ্যাটারই উপস্থিতি প্রমাণিত হয় নাকি?

এ জটিল প্রশ্নের সমাধানে মনোনিবেশ করেনি ঋতব্রত। সে খুঁজছিল একটি রান্না করার লোক। অবশেষে দফাদার সাহেবই একটা বন্দোবস্ত করেন। তাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল সিংজী ঠিকাদারের সঙ্গে। সিংজী ঋতব্রতকে অনুরোধ করেছে যেন ঐ বিধবা মেয়েটাকে অবিলম্বে জবাব দেওয়া হয়। হেতুটা খোলাখুলি বলা হয়নি। তবে ইঙ্গিত যেটুকু করেছে তাতে বোঝা যায় গুড কণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট দেওয়া চলে না কুসুমকে—সিংজীর মতে। কারণটা নৈতিক।

কুসুম এই ক্যাম্পেরই একজন পি. এল। বিধবা। বয়স ঋতব্রতের চেয়ে বছর চার পাঁচ বেশিই হবে বোধহয়। ঋতব্রতের সঙ্গে ওর কখনও কথাবার্তা হয়নি, প্রয়োজনও হয়নি। নিজের মতো এসে আপন মনে কাজগুলি সেরে সে চলে যায়। কোন কিছুর প্রয়োজন হ'লে ঋতব্রত ভাববাচ্যে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে কুসুম নীরবে হুকুম তামিল করে যায়।

রতন বাজারে গেছে জেনেও ঋতব্রত হাঁক পাড়ে, "রতন, এক গ্লাস জল।" কুসুমও জানে যে বাবু জানেন রতন বাজারে গেছে। হাতের কাজ ফেলে এক গ্লাস জল গড়িয়ে সে রেখে আসে নীরবে, ওর নাগালের মধ্যে। এই নতনয়না, অনলসকর্মী, নীরব সেবাব্রতীর প্রতি একটি কোমল ভাব জাগে। সহানুভূতির পর্যায়ে ফেলা যায় সেটাকে।

কুসুমের কথা অনেকখানি জুড়ে আছে ঋতব্রতের প্রবাস-জীবনের। সুতরাং তার প্রাক-পি. এল. পর্বটার একটা পর্যালোচনার প্রয়োজন। কুসুমের

কথাটা সে সংগ্রহ করেছিল অনেকের কাছ থেকে। তার মধ্যে শ্রীমান রতনের কাছ থেকেই সে পেয়েছে সবচেয়ে বেশি খবর। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বাঁশের ছয়পায়াতে যখন এলিয়ে দিত ক্লান্ত দেহটা তখন রতন এসে বসতো তার হিসাবের খাতা নিয়ে। সারাদিনের খরচের হিসাবটা দাখিল করার থাকতো একটা অজুহাত; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তার গল্প করার। এইজন্যে হিসাবের খাতা ছাড়াও সুপুরির থলি আর জাঁতিটাও নিয়ে বসতো সে। হিসাব চুকতো অল্পেতেই, কিন্তু মিটতে চাইতো না সুপুরি কাটার অনুপান হিসাবে তার গালগল্প। সারাদিন ক্যাম্পের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে যতো আজগুবি গল্প সংগ্রহ করে আনতো রতন, আর সেগুলিতে আপনার মনের মাধুরি মিশিয়ে নিবেদন করতো সান্ধ্য-আসরের একক শ্রোতাটিকে। ঋতব্রতের কবিতা লেখার বাতিক ছিল, বাই ছিল ডায়েরি রাখার। এ ছাড়া ক্যাম্প থেকে বড় বড় চিঠি লিখতো সে কলিকাতাবাসিনী কোন একজনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ সব কাজই তাকে মুলতুবি রাখতে হ'ত যে শুভসন্ধ্যায় রতন এসে হাজির হ'ত তার সুপুরি তথা গল্পের ঝাঁপি হাতে।

যাক, যা বলছিলাম। কুসুমের পূর্ব-ইতিহাস। সে কথা নিজের ভাষায় বলার চেয়ে একখানা চিঠির অনুলিপি তুলে দেওয়া যেতে পারে। এর লেখক ঋতব্রত। ক্যাম্প-জীবনের গোড়ার দিকে লেখা। সেই কলিকাতাবাসিনী কোন এক বিশেষ জনকে উদ্দেশ করে। এটা কি ক'রে আমার হস্তগত হ'ল এ প্রশ্ন জাগতে পারে আপনাদের মনে। আচ্ছা, বলব সে কথাও। তবে বিশ্বাস করুন, ম্যাডাম বোসের কোন সেণ্ট-সুরভিত বাক্স থেকে নিজে হাতে চুরি করিনি।

"সুচরিতাসু,

তোমার চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ আছে। জবাবে অনেক কথাই বলতে পারি আমি। বস্তুত যুক্তিতর্কে প্রত্যেকটিকেই খণ্ডিত করা যেতে পারে। প্রথমত, তোমার কাছ থেকে যতো চিঠি উজান বেয়ে আসে

তার বেশী চিঠি বহে যায় ভাঁটার টানে কলকাতার মোহনায়—এ কথার নজির আছে আমার ডায়েরিতে। দ্বিতীয়ত, তোমার চিঠিগুলোর চেয়ে আমার খামগুলো গতরে ভারি ;—প্রমাণ, আমার গত চিঠি তুমি বেয়ারিং পেয়েছিলে। তবে স্বীকার করি চিঠির পরিচয় তার ওজনে নয়, তার আন্তরিকতায়। শ্যামলীর ভাষায় 'তার মূল্য তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে।' তা কি করবো বলো অমন মুক্তোর মতো হরফ বা অমন দরদভরা ভাষা আমার কলমের ডগায় আসে না। লোহা-পেটা কাঠ-খোট্টা এঞ্জিনিয়ারের আঙুলের চাপে কলম বেচারী পাল্লা দেবে কি ক'রে তোমার মতো নরম হাতের লেখনীকে। কলম আমার হেরে গেল জকির দোষে!

তোমার তৃতীয় অভিযোগ, তোমাদের, মানে আমাদের 'অভিযাত্রিক' কাগজে আমি লেখা দিচ্ছি না। বিশ্বাস কর রেখা, একেবারে সময় পাই না। মানে সময় পাই, কিন্তু লিখবার মতো মনের প্রেরণা পাই না। ইঁট, কাঠ, চুন, সুরকির মধ্যে আমার সব কবিতা, সব সাহিত্য হারিয়ে গেল। তুমি আগামী সংখ্যার জন্যে একটা গল্প চেয়েছো আমার কাছে। বলেছো—'অভিযাত্রিকের জন্ম মুহূর্তে ছিল তোমারও স্বাক্ষর—আজ লেখা না দেওয়া মানে তারই মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করা।' অতটা বিশ্বাস করি না। যাই হোক, গল্পের একটা প্লট পাঠালাম। একটু সাজিয়ে গুছিয়ে এটাকে অভিযাত্রিকে প্রকাশ করতে পারো। অবশ্য প্লটটা যদি সম্পাদিকার মনোমত হয়।

পূর্ববঙ্গের কোন এক নদীর ধারে কি এক গ্রামে কুসুমের বাস। মনে করা যাক নদীর নাম ধলেশ্বরী, গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর। কুসুমরা ছিল দুই বোন, ভাই ছিল না তাদের। ওর বাপ ছিলেন গ্রামের পণ্ডিতমশাই। কুসুমের চরিত্রটা বিচিত্র। অন্যান্য পোড়ো ছেলেদের সঙ্গে কুসুম ছেলেবেলা থেকেই দুষ্টামি করে বেড়াতো। ছেলের অভাব মেটাতে মা তাকে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরাতেন, চুল বেড়া-বিনুনী করে বাঁধা থাকতো মাথায়। সঙ্গিনী ওর একটিও ছিল না; সব ছেলেদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। পাঠশালায় ছেলেরা তাকে দলে

টানত। তবে ঐ বেড়া-বিনুনীটার জন্তেই তাদের ছিল কেমন একটা খুঁতখুঁতে ভাব। শেষে একদিন কুসুম রেগে মেগে কাঁচি চালিয়ে কেটেই ফেল্লে তার চুলের বোঝা। বাবা বকলেন; মায়ের হাতপাখার বাঁট ভাঙলো ওর পিঠের উপর, তবু কুসুম ভারি খুশি। পাঠশালার ছেলেরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওকে অভিনন্দিত করেছে। একমাত্র বিশ্বনাথদা ঠোঁট উল্টে বল্লে, 'রূপ খুলেছে!'

বিশ্বনাথ পাঠশালার পাঠ শেষ করে আস্ক পড়ছে তখন ওর বাপের কাছে। বিশ্বনাথকে কুসুম দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। জোয়ান হ'লে কি হ'বে কুসুমের কোন কিছুই যেন প্রশংসার নয় বিশ্বনাথের কাছে। তা বয়েই গেল কুসুমের। সকলের সাথে দল বেঁধে কুসুম যেতো ধলেশ্বরীতে মাছ ধরতে। সাঁতরে গিয়ে কতদিন মহাজনী নৌকার গলুই ধরে চলে যেত মাঝনদীতে। কালবোশেখীর ঝড়ে আম কুড়ানো, এমন কি নষ্টচন্দ্রের রাত্রে পাকা কলার কাঁদি চুরি করার মধ্যেও তাকে খুঁজে পাওয়া যেতো। প্রথমটায় পণ্ডিতমশাই কান করেননি; কিন্তু প্রতিবেশীদের মধুবর্ষণে কান যখন তাঁর উপচীয়মান বোধ হ'ল, তখন তিনি বাধ্য হয়ে কন্যার কানের দিকে হাত বাড়ালেন। কান সমেত কন্যার মাথাটা ততদিনে তাঁর নাগালের বাইরে। ফলে ছোট মেয়ে কামিনীর উপর শাসন হল দৃঢ়তর। কুসুম তখন শাসনের বাইরে। সে ছেলে হয়ে গেছে!

পিতামাতার হাত এড়ালেও কুসুম শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো আর একজনের হাতে। তিনি প্রকৃতি। চুল কেটে ফেললেই যে ছেলে হওয়া যায় না, এ সত্য সে বুঝলে একদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। তখন ওর বয়স কতই বা? এই বারো, তেরো। ওকে মাঝে রেখে বেশ একদফা মারামারি হ'য়ে গেল দু'পক্ষ ছাত্রদের মধ্যে। ঝগড়াটার সূত্রপাত অতি সামান্য বিষয় নিয়ে। খেলোয়াড়দের মধ্যে দু'দলের কোন্ দলে কুসুম যোগ দেবে এটাই ছিল বিবদমান দু'টি দলের বিচার্য বিষয়। ঝগড়াটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণত হ'ল দুই বিপক্ষ দলের ক্যাপটেন আবদুল গনি আর নির্মলের ব্যক্তিগত

দ্বন্দ্বে। কুসুমের মালিকানা স্বত্বই সেখানে ঝগড়ার বিষয়বস্তু। কুসুম চুপ করে লক্ষ্য করছিল ঝগড়াটা, একপাশে দাঁড়িয়ে।

এখানটায় তুমি তোমার গল্পে দুই বিবদমান আদিম নরের মাঝে আদি অকৃত্রিম চিরন্তন নারীর একটা উপমা দিতে পারো। অথবা আধুনিক যুগের একটা বাস্তব উদাহরণ দিতে পারো নিরপেক্ষ নধর গাভীর। কলকাতার রাস্তার রণক্ষেত্রে যাদের প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় মল্লযুদ্ধরত অনড্বানদ্বয়ের অনতিদূরে।

আবদুল অপেক্ষাকৃত শক্তিমান। মার খেয়েছে নির্মলই বেশি। বিজয়ী বীর আবদুলের হাত ধরে কুসুম খেলতে যাচ্ছিল ;—অতর্কিতে কোথা থেকে আবির্ভূত হ'ল বিশ্বনাথ। হেঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল কুসুমকে। আবদুল ঘুরে দাঁড়ালো ঘুষি পাকিয়ে। ফিরে দাঁড়ালো বিশ্বনাথও অগত্যা। তারপর আবদুল মাথা নিচু করে চলে গেল সেখান থেকে। বিশ্বনাথ শুধু জোয়ান নয়—অসীম বলশালী বলে খ্যাতি ছিল তার। গ্রামের আখড়ায় ছেলেদের কুস্তি শেখাতো বিশ্বনাথ। ক্রুর দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা শেখের পো'র।

আবদুলের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল দলের বেশীর ভাগ ছেলেই। ওরা সবাই মুসলমান পাড়ায় থাকে। আবদুল গনিই ওদের দলপতি। গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর হ'লেও মুসলমানপ্রধান স্থান সেটা।

কুসুম হেসে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড ধমক দিলে তাকে বিশ্বনাথ। ভয়ে, বিস্ময়ে, বিহ্বলতায় কুসুম নির্বাক হ'য়ে গেল। বিশ্বনাথের ধমক শুনে নির্মলের দলের বাকি ক'জনও রণস্থল ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলে। বিশ্বনাথ বজ্রমুঠিতে কুসুমের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ি পর্যন্ত। ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ছেড়ে দিলে ওর হাত। কুসুমের তখন ভারি কান্না পাচ্ছে। জলভরা চোখদুটো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে গোঁজ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে বাগানের ফটকের সামনে ;

একপাও নড়লো না। বিশ্বনাথ অল্প ইতস্তত করে বললে, "বাড়ি যাও কুসুম। তোমাকে দলে নেবার জন্যে ছেলের দল মারামারি করে···ছি ছি···তুমি বোঝ না কেন?···আর শোন,···ইয়ে, তুমি শার্ট পরোনা, বুঝলে···শাড়ি পরলেই হয় এখন...”

মাথা না তুলেই কুসুম বুঝতে পারে বিশ্বনাথ চলে গেছে অনেকক্ষণ। লজ্জায়, অনুশোচনায় একটা ছিছিকারে মাটির সঙ্গে কে যেন মিশিয়ে দিয়েছে তাকে। পায়ে পায়ে বাড়িতে নিজের শোওয়ার ঘরে এসে ঢোকে। সামনের বড় আয়নাটায় পড়েছে ওর প্রতিকৃতি। ছিঃ ছিঃ! ছুটে গিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়ে সে খাটের উপর! তারপর ফুলে ফুলে কী কান্না তার!

এখানেই শেষ করছি আজ কুসুমের উপাখ্যান। তার কারণ কাহিনীর এই পর্যন্তই সংগৃহীত হ'য়েছে এ পর্যন্ত। পরে বাকিটা প্রকাশ্য ক্রমশ।

নিজের কথায় আসি। কাজ চলছে একরকম। ভাল লাগছে না আর। এখন এতো পুরাদমে কাজ চলছে যে ছুটিও নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ ভারি দেখতে ইচ্ছা করছে তোমায়। তুমি এতক্ষণে হয়তো দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসেছো। আচ্ছা, লেডি হিলিংডন গাছটায় ফুল ফোটেনি এখনও? আজকাল বিকালে কোথায় যাও? সিনেমা দেখছো নিশ্চয়ই;—কার সঙ্গে? 'ভারতের সিংহাসন খালি নাহি রবে'—তা জানি। আচ্ছা, আমিই না হয় যেতে অপারক, তোমার পক্ষে চলে আসাটা কি এতই অসম্ভব? তোমার কলেজ তো বন্ধ। মেশোমশাইকে বলনা যে তোমার এক বান্ধবীর বিয়ে মধুপুর অথবা আসানসোলে। বলে বেরিয়ে পড়ো। হুট ক'রে এসে হাজির হও যদি ক্যাম্পে আমি ভারি চমকে যাবো। এখানে কিছু অসুবিধা হ'বেনা। বাথরুম একটা বানিয়ে দেবো টিন দিয়ে ঘিরে। আরে

হ্যাঁ বাপু, দু'খানা শোবার ঘরই আছে। মাঝের পার্টিশনে দরজা থাকলেও তা ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়।

আজ এখানেই থামছি। ওভারসিয়ারবাবু আসছে দেখতে পাচ্ছি জানালা দিয়ে। এবারও বাড়তি টিকিট দিলাম না। বেয়ারিং চিঠি খোওয়া যায় কম।

ভালবাসা জানাতে সাহস পাচ্ছিনা। গ্রহণ তো করলেনা কোনদিন, তাই রইল আমার শুভেচ্ছা।

—ইতি"

সূর্য মাথার উপরে উঠেছে। সাইকেলে চেপে কাজ দেখে ফিরছিল ঋতব্রত। কোথায় ঘরের চাল নামাচ্ছে কেটে কেটে। কোথাও পোয়ালগুছি দিচ্ছে বাতায়। কোথাও শালের খুঁটি পাচ্ছে নবকলেবর, কোথাও বা বানানো হচ্ছে মুলিবাঁশের লম্বা দেওয়াল। নানান জাতের কর্মীর কর্মব্যস্ততা। সাইকেল চলেছে দ্রুতগতিতে—গরম হাওয়া বইছে উল্টোদিক থেকে। বৃষ্টি এখনও নামেনি। বাঁ দিকে এল/২৯ ব্যারাকে পুরানো টিন বদলে নতুন টিন চাপাচ্ছে মিস্ত্রীরা। হাতুড়ির আওয়াজ উঠছে ঠক্-ঠক্-ঠক্। হঠাৎ ব্রেক কষলে ঋতব্রত। সাইকেল থেকে নেমে ঘুরে ঘরখানার পিছন দিকে গেল। যা ভেবেছে তাই! পাঞ্জাবী ছুতার মিস্ত্রী হাতুড়ি মেরে স্ক্রু বসাচ্ছে টিনে। ধমক দিয়ে ওঠে ঋতব্রত। তার শিক্ষায়-সহবতে যতখানি তীক্ষ্ণ হওয়া সম্ভব—গালাগাল দেয় সে। পাঞ্জাবী মিস্ত্রী চালের উপর থেকে বারবার কসম খায়। হাতুড়ি পেটেনি সে। স্ক্রু-ড্রাইভার ঘুরিয়েই টিনগুলোকে আঁটছে নাকি সে পার্লিনের সঙ্গে। স্ক্রু কখনও হাতুড়ি মেরে বসাতে পারে! তা'হলে তো জোরই হ'বেনা কিছু। জুতো খুলে মই বেয়ে চালে উঠে পড়ে ঋতব্রত। বিব্রত হয় পাঞ্জাবী মিস্ত্রী। তার হাতের কাছে একটাও স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল না। কাজ বন্ধ করে দিতে হুকুম দিল ঋতব্রত। ওয়ার্ক-সরকার কই?

সে নাকি খেতে গেছে। ঋতব্রত ঘড়িতে দেখলো সকালের কাজ ছুটি হ'তে তখনও কুড়ি মিনিট বাকি। ওয়ার্ক-সরকারের নাম, ব্যারাকের নাম নোট-বইতে টুকে নিয়ে সাইকেলে উঠতে যাবে হঠাৎ ঘর থেকে বের হ'য়ে এল একজন যুবক। সুগঠিত তৈলচিক্কন মসৃণ চেহারা। মসীকৃষ্ণ ব্যাক-ব্রাশ চুল, ঘাড়ের কাছে একেবারে ছাঁটা। পরিধানে একটি সবুজ লুঙ্গি ও হাতকাটা স্যাণ্ডো গেঞ্জি। বল্লে,

"দেউখ্যাইন স্যর! এ্যারার কাণ্ডটা দেউখ্যাইন্! খালি ফাঁকি দেওনের লগ্যা আছে হারামির বাচ্ছারা।"

হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠলো পাঞ্জাবী মিস্ত্রী, "তু চুপ রহ্ শালে শয়তান!"

বাঙালের পো-ও তখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে একটা থান ইঁট হাতে। পাঞ্জাবীও দৃঢ়মুষ্টিতে ধরেছে তার হাতুড়িটা। ঋতব্রতের গালাগাল সে নির্বিবাদে হজম করেছিল—কারণ তার কাছে সে ছিল অপরাধী। তাছাড়া সাহেব আদমির গালাগালটাও কিছু বাপ মা তুলে নয়! ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একে মোড়লি করতে দেখেই সে রুখে দাঁড়িয়েছে। জনতা ঘিরে দাঁড়িয়েছে চারদিকে।

মুহূর্তে ঋতব্রত গিয়ে পড়লো ওদের দু'জনের মাঝখানে। দু'জনকে পৃথক ক'রে পাঞ্জাবীকে বল্লে, "আপ্ খামোশ্ হো যাইয়ে!"

আর নওজোয়ানের দিকে ফিরে বল্লে, "আপনি ওকে গাল দিলেন কেন? ও কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকে তা দেখবার জন্যে অন্য লোক আছে। আপনি ওকে গাল দেবার কে?"

"দিতাম না? গাইল দিতাম না? এ্যাকশো বার দিয়াম!"

ঘরের ভিতর থেকে আর একজন মহিলা এগিয়ে এসে ওর হস্তাকর্ষণ করে, "কারে কিতা ক'স বড়খুকা? ভাহস না চৌখ্যু মেইল্যা?"

"অন্যায্যটা কি কইলাম?" প্রতিবাদ করে বড়খোকা।

"আপনি কোথায় থাকেন বলুন তো?" প্রশ্নটা ঋতব্রতের।

"থাক্বাম্ ফিরাবার কই? এ ঘরই থাহি।"

"এই ঘরে? আপনি এ ক্যাম্পের বাসিন্দা?"

"হ! পাঁচ বচ্ছর থাহ্‌কলে যুদি বাসিন্দা কয় তা বাসিন্দাই।"

"আপনি পি. এল?"

"হ!"

অবাক হ'য়ে যায় ঋতব্রত। এই ষাঁড়ের মত তাগড়াই জোয়ান মদ্দ পি. এল? অর্থাৎ পার্মানেণ্ট লায়াবেলিটি? যাবৎ জীবেৎ সরকারী ডোল ভক্ষেৎ? হেসে ফেলেছে সে অতি দুঃখেও। পাঞ্জাবী মিস্ত্রী তখনও খামোশ্ হ'য়ে প্রতীক্ষা করছে সুবিচারের। তার দিকে ফিরে ঋতব্রত বল্লে, "এই দুর্বল পি. এল. লোকটার উপর তোমার মতো জোয়ানের রাগ করা শোভা পায় না। ওর শরীরে কোনও পদার্থ নেই বলেই না সরকারী ডোল খেয়ে জীবন-ধারণ করে বেচারী!"

মুখ কালো করে ঘরে ঢুকে যায় বড়খোকা। অনুচ্চ কণ্ঠে বলে শুনিয়ে শুনিয়ে, "আমারে যেন্ আসামী পাইছে! কুথায় থাহো? কিতা কর? অত কথা ক্যান্ রে বাপু? এইডা যেন্ কাঠগড়া!"

ঋতব্রত সাইকেলটা ঠেলে বড় রাস্তায় তুলতে থাকে। পাঞ্জাবী তার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে তোলে। কাটা চালের খড়ের গাদায় ঋতব্রতের সাইকেলের চাকাটা আটকে যায়। নীচু হ'য়ে ছাড়াতে ছাড়াতে জনতাকে উদ্দেশ করে বলে, "এগুলো আপনারা সরিয়ে রাখেন না কেন? বাড়ির চারপাশ এত নোংরা করে রাখে?"

ফোঁস ক'রে ওঠে ভীড়ের মাঝে একজন, "ক্যান্? আমরা কি মশয় মুদ্দোফরাস? ময়লা ফ্যালাইমু ক্যান্?"

ঋতব্রত নরম হ'য়ে বলে, "ময়লা তো নয়, আপনাদেরই ঘরের চাল। নিজের ঘরের খড় কি সরাতেন না নিজেদের বাড়িতে? খড়কুটো এত চারপাশে ছড়ানো থাকাটা কি ভালো? গরমের দিন কে কোথায় একটা বিড়ি খেয়ে ফেলবে—"

"প্যাটে খাতি পাইনা, আমরা রিফু, আর আমাগোরে কন্ বিড়ি খায়্যী ফ্যালাইবে !"

বিরক্ত হ'য় ঋতব্রত। লক্ষ্য ক'রে সামনের সারিতেই একজন বিড়িটাকে হাতের তালুতে লুকিয়ে ফেলে। বলে, "কি আশ্চর্য! খামখা তর্ক করছেন কেন? আপনারা কেউ বিড়ি না খেলেও পথচল্‌তি মানুষেও তো ফেলতে পারে। তাছাড়া সাপখোপ-পোকামাকড় হয়। একটু পরিষ্কার থাকতে পারেন না নিজেরা? এত নোংরা কেন?"

প্রতিবাদটা এবার শত কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে: "পেডে পুলাও কাল্যা পড়্‌লি বেবাকই পরিষ্কার থাক্‌তি চায়।"

অর্থাৎ ওদেরই কি ইচ্ছা করেনা শার্ট প্যান্ট পরে সাহেব সাজতে?... ওদের গাঁয়ে গেলে দেখতে পেতেন পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে...একটি কুটো খুঁটে তুলুক তো কেউ বাড়ির দশ হাতের মধ্যে?...এটা তো ওদের গাঁয়ের বাড়ি নয়...এখানে এসব সাফা করার জন্যে সরকারী ঠিকাদার রাখা হ'য়েছে কেন?

এর পরেও ধৈর্য থাকা অসম্ভব ঋতব্রতের মতো রগচটা লোকের। তবু সে মিষ্ট কথায় বোঝাতে গেল। ময়লাগুলো যদি ওরা নিজেরাই সবাই সাফা করে তবে সাইট-ক্লিয়ারেন্স বাবদ সরকারী টাকাটা দেবেনা সে ঠিকাদারকে। সে প্রমাণ করতে চায় পি. এল. মার্কা দেওয়া হ'লেও এরা মনুষ্যত্ব হারায়নি আজও। সুযোগ সুবিধা পেলে আবার মানবিকতার পরিচয় এরা দিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ একটা মন্তব্যে ওর সব সংযম হারিয়ে গেল। কথাটা বলেছে ঘরের ভিতর থেকে—সেই বড়খোকা নামধারী যুবকটি।

"হ, হ, জানি! আমরায় ময়লা ফ্যালাইয়াম্ আর হেই ট্যাহাডা ঠিহাদারের নামে লেইখ্যা তুম্‌রা দুইজনে ভাগ বাটোয়ারা করবা!"

সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে পীচের রাস্তায় উঠে এলো ঋতব্রত। পীচ তখন গলতে শুরু করেছে। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। নিজের ঘরে এসে পৌছলো ক্রমে। এ বেলার মতো চাকরি শেষ হয়েছে তার।

রতন সাইকেলটা ঘরে তোলে। তার স্পোকে তখনও জড়িয়ে আছে কয়েক টুকরো খড়—এল/২৯ ঘরের গ্লানি।

জুতো জামা না খুলেই চিত হয়ে শুয়ে পড়লো ঋতব্রত।

অফিসে একা বসে কাজ করছিল ঋতব্রত। পাঁচটা বেজে গেছে। সবাই চলে গেছে। বাইরে বেশ মেঘ করেছে আকাশে। আজ ঝড় হ'তে পারে। এ বৎসরের প্রথম কালবৈশাখী। প্রতি বৎসর এই প্রথম বর্ষণের দিনটি ওর ভারি আনন্দের। সারাদিনের দুর্দান্ত গরমের পর যখন আকাশের কোণ থেকে মত্ত মাতঙ্গের মত শুঁড় নাড়তে নাড়তে মেঘের দল ধেয়ে আসে, ও তখন ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে প্রকৃতির বিপুল সমারোহ। বিশাল বনস্পতি মাথা নিচু করে অভিবাদন করে ঝড়কে। হৈ হৈ করে এসে পড়ে ঝড়। ওড়ে খড় কুটো, ধুলো, বালি—আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা! প্রতি বছরই সে ভিজতে ভালবাসে প্রথম বর্ষণের ধারা-পাতে। আবৃত্তি করে রবিঠাকুরের কবিতার বিশেষ অংশ।

এখনও ঝড় আসেনি। শুধু কালো ক'রে থমকে আছে আকাশটা। এলোমেলো হাওয়া বইছে। দুলছে অফিস ঘরের পর্দাটা। পাশের ঘরে স্টোভে চায়ের জল বসিয়েছে রতন;—একটানা শব্দ ভেসে আসছে তার—শোঁ!

কলকাতার ডাক দেখছিলো সে। সময়ে প্রগ্রেস রিপোর্ট পাঠানো হয়নি বলে কৈফিয়ৎ তলব করা হ'য়েছে। অডিট অবজেকসনের কপি। এটা কি? ট্যুর প্রোগ্রাম। এক্সিকিউটিভ ইনস্পেকসনে আসছেন আসছে বুধবার। ওয়ার্ক-চার্জ স্যাংসন। নাঃ, আর পারা যায়না। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—বৃষ্টি বোধ হয় শুরু হয়েছে দূরে কোথাও। না, দূরে নয় কাছেই। ঐ তো ভিজে মাটির একটা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। ডাক-ফাইলটা দূরে সরিয়ে রাখলো সে। একটা কবিতা লিখতে হ'বে তাকে। আজই, এক্ষুণি! লেটারহেডের একটা

পাতা নিয়ে শুরু করতে যাবে হঠাৎ দমকা পূবের হাওয়ায় কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে যায়। হাত থেকে উড়ে যায় অলিখিত কবিতার কাগজটাও। ছুটে আসে রতন। বন্ধ করে দেয় পূবদিকের দরজাটা। চলে যায় একটা লণ্ঠন রেখে। বাইরে নেমেছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। খস্ খস্ করে চলে কলম—

"স্থপতিবিদের পরিচয় নিয়ে নেমেছি রঙ্গালয়ে
বলে যাই ভয়ে ভয়ে
সাবধানে শেখা পার্টটুকু মোর ফুটলাইটের কাছে ;
ইঁট কাঠ আর চুন-সুরকির হিসাব সাজান আছে।
নাট্যকারের বাঁধা গৎ আছে জানা
বাইরে তাহার আপন খেয়ালে কোন কথা বলা মানা॥

অফিসের চেয়ারেতে
ফ্ল্যাট-ফাইলের নেশায় যখন একলা উঠেছি মেতে
দেখিনি তখন ব্যস্ত চক্ষু তুলে
পূবালী-পবন চাপরাশি হাত কার্ড দিয়ে যায় ভুলে।
আপন খেয়ালে ঢুকে
পথের ধূলার চূর্ণ-মুষ্টি ছুঁড়ে মারে মোর মুখে॥

হ্যাট-র‍্যাক হ'তে ফেলে দেয় হ্যাট—ওড়ায় নক্সাগুলি
টেবিলেতে জমে ধূলি।
ক্ষ্যাপা মেয়েটির অঞ্চল দোলে দ্বারের পর্দাটিতে
খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে দেখি আপন দুষ্টামিতে।
এমনি ক'রেই জ্বালায়েছে দিবারাতি
ওযে এ কবির ছেলেবেলাকার সাথী॥

টেবিলের উপর চা রেখে গেল রতন। হাত দিয়ে কাগজখানা চাপা দিল

ঋতব্রত। সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত বাংলা হরফের লাইনগুলো দেখলে রতনের পক্ষেও বোঝা অসম্ভব নয় সাহেব কি কাণ্ডটা করছে। ঝাড়ন দিয়ে টেবিলের ধূলার প্রলেপটা মুছে দিয়ে রতন চলে যায়। রুদ্ধ দরজার বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি। ঘরে তার প্রবেশ বন্ধ হ'য়েছে।

"হঠাৎ ও যায় থামি,
লজ্জা ও ভয়ে ব্লাউসের নীচে উঠেছে বেচারা ঘামি,
জড়িয়ে আঁচল ধূলামাখা এলো চুলে
এ কার ঘরে ও প্রবেশ করেছে ভুলে ?
এতো সে তো কভু নয়!
কোট-প্যান্টের তলায় কোথায় সেদিনের পরিচয় ?
এ ঘরে তো নাই খাতা ছবি রঙ, তুলি !
চাপরাশি এসে ঝেড়ে দিয়ে যায় ধূলি।
সামলে আঁচল ধূলামাখা মৃদু পায়
পূবালী-পবন ধীরে ধীরে চলে যায়।"

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে জলকাদার মধ্যে ছপ্ ছপ্ করে লণ্ঠন হাতে লোকজন যাতায়াত করছে। বৃষ্টিটা ধরেছে। বর্ষণের মধ্যে ওরা বোধহয় আটকে পড়েছিল এতক্ষণ। একশো তের নম্বর ঘরটার কথা মনে পড়লো ঋতব্রতের। আজই সকালে চালটা নামিয়েছে। মনো পড়লো একশো তের নম্বর ঘরের হাঁপানি রুগীটার কথা—আর এদিকে সদ্যোজাত শিশুক্রোড়ে উদ্বাস্তু জননীটিকে। এই প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে কোথায় মাথা গুঁজলো তারা ?

রতন এসে দাঁড়ালো। রাত্রে কি রান্না হবে ? ঢালা হুকুম দিল ঋতব্রত, খিচুড়ি আর পাঁপরভাজা।

"পাঁপরভাজা ? এখানে পাঁপর কোথায় পাব স্যর ?"

"তবে আলুভাজা।"

রতন চলে গেল ওঘরে।

দূরে কে যেন ডাকছে "বুধনা—এ বুধনা!"

একটা গরুর গাড়ি চলে গেল জলকাদা ভেঙে। ছত্রির ভিতর ঘোলাটে চোখ মেলে লণ্ঠনটা তাকিয়ে আছে একচক্ষু দৈত্যের মত। দুটো বাদলা পোকা ওর টেবিলের কাছে ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরছে লণ্ঠনটাকে। সেই চিরন্তন খেলা! রূপবহ্নি! নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও, উত্তাপ প্রতি মুহূর্তে গায়ে লাগছে জেনেও পোকাদুটো দূরে সরে যাচ্ছে না। দীপশিখাই ওদের অন্তিম গতি। কী মূর্খ পোকা দুটো! মূর্খ? সে নিজেও কি ঐ রকম মূর্খ নয়? তবে রেখা মিত্তিরের রূপবহ্নির চতুর্দিকে পাক খেয়ে মরছে কেন আজও? তিন-পুরুষের অভিজাত ঘরের ঐ মেয়েটি কি কোনদিন এসে দাঁড়াবে ওর পাশে এই দরমার বেড়া দেওয়া ঘরে? যেখানে পিয়ানো নেই, সিনেমা সাপ্তাহিক নেই, যেখানে সেতার বাজানো চরম রসিকতা—যেখানে বৃষ্টির দিনে পাঁপর-ভাজার কথা মনে হ'ল ধমক খেতে হয় চাকরের কাছে!

দূর হোকগে রেখা মিত্তির। তার কথা ভাবা যাবে পরে। আজকে তার কবিপ্রিয়া রেখা মিত্তির নয়—পূবালী-পবন! অভিমান করে সেই যে চলে গেল আর তো ফিরে এলনা সে?

"ওরে ও পূবালী হাওয়া
বিকিয়ে দিয়েছি ইঁট-কাঠ-চুনে যতকিছু চাওয়া পাওয়া!
তবু ওরে শোন—কিছু আছে আজও বাকি,
স্লাইডরুলের নির্ভুল মাপে আছে হিসাবের ফাঁকি!
প্রখর রবির কিরণের জালে দিবসে রয়েছে ঢাকা
আমার গোপন কৃষ্ণপক্ষ রাকা!
মন-কেমনের ওরে ও পূবালী মেয়ে
সাথীহীন রাতে কবির কুটিরে অমনি আসিস্ ধেয়ে।
অভিমানিনীর অভিমান করি জয়
মৃদু চুম্বনে ফিরে দেব তোকে সেদিনের পরিচয়।"

হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে পড়লো পাঁচ সাতজন লোক।

"শিগ্‌গির চলুন স্যর! হাঁসপাতালের মেল-ওয়ার্ডটা ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। দুজন লোক চাপা পড়েছে। একজনের অবস্থা খুব খারাপ।"

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ঋতব্রত। গামবুটের মধ্যে পা চালাতে চালাতে প্রাথমিক সংবাদটা সংগ্রহ করে। অনেক লোক নাকি জমায়েত হয়েছে অকুস্থলে। সমস্ত ঘরটাই ভেঙে পড়েছে। রুগীদের সরিয়ে আনা হ'য়েছে রেশন-গুদামের বারান্দায়। টর্চটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

রতন ডাকতে এসেছিল। তার খিচুড়ি তৈরী হ'য়ে গেছে। অবস্থা দেখে থেমে গেল। এতক্ষণে একটা দমকা হাওয়া উঠেছে।

খোলা দরজা দিয়ে শূন্যঘরে ফিরে এসেছে পূবে-হাওয়া। ঋতব্রত তখন অন্যমনস্ক হ'য়ে হনহন করে ছুটে চলেছে হাঁসপাতালের দিকে। তার শুধু চিন্তা সুরেন সেনগুপ্ত কি শালের প্রয়াগুলো লাগায়নি ওর কথামত? খিচুড়ি জুড়িয়ে যায়। টুলে বসে ঝিমায় রতন, লক্ষ্য করে না দমকা হাওয়ায় সাহেবের টেবিল থেকে উড়ে যায় একখানা কাগজের টুকরা—জানালা পার হ'য়ে পড়ে গিয়ে রাস্তায়। অন্তিম গতি লাভ করে জলকাদার মধ্যে।

কাজ দেখে বেড়াচ্ছে ঋতব্রত। অনেকগুলো দরখাস্ত এসেছে ক্যাম্প-বাসীদের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে সুপারেণ্ডেন দফাদারের কাছে। এ বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ও বাড়ির খড় নয় ইঞ্চি পুরু হয়নি, সে বাড়িতে আরও খুঁটি না বদলালে ঘর পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। দরখাস্তগুলি ফরোয়ার্ড করেছেন দফাদার ওর কাছে ওর জ্ঞাত্যার্থে। সেগুলি পকেটে নিয়ে সর-জমিনে তদন্ত করে বেড়াচ্ছিল। ভারি মজার সমস্ত আবেদনপত্র। উপরে "মাননীয় বকুলতলা ক্যাম্প্‌-সুপার বাহাদুর সমীপেষু" এবং নীচে "হুজুর মালিক নিবেদন ইতি" থাকলেও অন্তরার লাইন কটা সি-সার্প স্কেলেও কুলায় না। রীতিমত জ্বালাময়ী ভাষায় বলা হ'য়েছে ক্যাম্প-রিপেয়ারের নাম করে যথেচ্ছ

ভাবে অর্থের অপব্যয় করা হ'চ্ছে শুধু। যে তীব্র ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি আছে আবেদনপত্রগুলিতে তাতে সন্দেহ হয়—আর কিছু না হোক খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লিখেও এরা অন্নসংস্থান করতে পারত। সদাশয় সরকার বাহাদুরের অর্থ এমন ভাবে নষ্ট হ'তে দেখে সকলেরই প্রাণ কেঁদে উঠেছে। অথচ মাসে মাসে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাস ডোল হিসাবে বিতরণ করা হচ্ছে ঐ বড়লোক মার্কা পি. এল. দের, তার বেলা—

"একটু শুনছেন ?"

ব্রেক কষলে ঋতব্রত। সেই বিধবা ভদ্রমহিলা। একটা চটের থলিতে বাজার করে ফিরছেন। রেশন ব্যাগের থেকে বেরিয়ে আছে লাউডগার মাথা। সঙ্কুচিত হ'য়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছেন। ঋতব্রতের মনে হল এর আগের দিন 'তুমি' বলে কথা বলেছিলেন।

"আপনার কি চাই ? দরমার পার্টিশন তো ? বলেছি তো সেদিন।" মহিলা যেন লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে যান। কি জানি, হয়তো ভদ্রঘরের বধূ, এভাবে অনুগ্রহ চাওয়াটা তাঁর অভ্যাস হয়ে যায়নি আজও। একটু নরম হল ঋতব্রত।

"তা আমি কি করব বলুন—একজনকে দিতে গেলে সবাই চাইবে। সব ঘরে পার্টিশন দেওয়াল করাতো সম্ভব নয়।"

"তা তো বটেই! না, আমি তা বলছিলাম না আজ। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম আমাদের ঘরের উত্তর দিকে এল/৩০ ঘরটা কি মেরামত করানো হ'বে ? ওখানে কেউ থাকে না চাল নেই বলে। ওটা যদি সারানো হয়, আমরা সুপারেণ্ডেনকে বলে ওখানে সরে যেতাম।"

"এল/৩০ নম্বর ? সেটা কোনটা ?"

"এই তো কাছেই। এখন দেখবেন ?"

"চলুন দেখেই আসি।"

সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে মহিলার পিছু পিছু সে এসে দাঁড়ায় তাঁর ব্যারাকটার সামনে।

"আপনি এই ব্যারাকে থাকেন ? এল/২৯এ ?"

"হ্যাঁ বাবা। এখানেই থাকি আমি। এস' না ঘরে। আমি বাজারটা রেখেই যাবো তোমার সঙ্গে।"

আবার কখন আপনি এসে ঠেকেছে তুমিতে।

এল/২৯ হ'চ্ছে সেই ঘরটা যেটায় বাস করে সেই বড়খোকা নামধারী লোকটা। ব্রজেন নায়েক, যে ছেলেটি ওয়ার্ক-সরকার-ইন-চার্জ, তাকে ধরে ঋতব্রত এমন ধমক দিয়েছে কাজে ফাঁকি দেবার জন্যে যে ওকে দেখলেই ছেলেটি ঘেমে ওঠে। ঘরের ভেতরটা কেমন কাজ হ'য়েছে দেখবার জন্যে মহিলার পিছন পিছন ঋতব্রতও ভিতরে যাচ্ছিল। পর্দার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটা চটের থলি ঝুলছে দরজার সামনে। না পর্দার বিকল্প তো নয়, পর্দারই প্রতিভূ ওটা। দরজাটায় পাল্লাই ছিল না। পর্দা সরিয়ে ভিতরে মাথা গলিয়েই বিদ্যুৎপৃষ্টের মত বেরিয়ে এল ঋতব্রত। মহিলাও যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছেন। একটু সময় নিয়ে ফের বল্লেন, "এসো এসো বাবা, ভিতরে এসো।"

আরও একমিনিট সময় দিয়ে পর্দা সরিয়ে ঋতব্রত ঘরে ঢুকলো। ভিতরের মেয়েটি ততক্ষণে ভিজে কাপড় ছেড়ে নতমুখে কি একটা কাজ করছে। ঋতব্রত চোখ তুলে চাইতে পারলো না তার দিকে।

বিরাট লম্বা হলকামরা। অন্তত আশীফুট লম্বা এবং বিশফুট চওড়া। আটটা পরিবার বাস করে এটায়। একেবারে এদিকের কোণটায় থাকেন এই মহিলা। মেয়েটি তাঁরই এলাকাভুক্ত বলে মনে হয়। একটা নারকোলের দড়ি টাঙানো রয়েছে অন্যান্য অংশ থেকে তাঁর এলাকাটা পৃথক ক'রে। দড়ির উপর আড়াআড়ি করে ঝুলছে একখানা শাড়ি। দ্বিতীয় খোপটায় বসে আছে বড়খোকা। শালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে একটা বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছিল অলসভাবে। ও দিককার অংশগুলিতে দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর সাধারণ সংসার-যাত্রা নির্বাহের দৃশ্য। কেউ ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে ; কেউ রেশনের চালের

কাঁকর বাছছে ; ও পাশে ফুটছে একটা তোলা উনুনে সেদ্ধভাত। তার গন্ধে আমোদিত হ'য়ে আছে সারা হলকামরাটা। কোণায় এক বৃদ্ধ বসে বিড়ি পাকাচ্ছে। একগাল সাদা ধপধপে দাড়ি। অনেকটা ব্রজেন শীলের মত চেহারা। মাঝখানের একটা খুপরিতে চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে একটা পাগল। লোকটা বিড় বিড় করে আপন মনে কি বকছে। দুটো বেড়াল বাচ্চা খেলা করছে এ কোণায়। ওরা বোধহয় এ ব্যারাকের স্থায়ী পোষ্য। পাগলটার পাশে ঘুমোচ্ছে একটা ন্যাংটো ছেলে—তারই এলাকাভুক্ত মনে হয়। অন্ধকারে সমস্ত হলকামরাটা থম্‌থম্ করছে। জানালাগুলোর অধিকাংশতেই পাল্লা নেই—সারানো হয়নি এখনও। পচা দরমা, ভাঙা টিন—যে যা পেয়েছে চাপিয়েছে জানালার উপর। বৃষ্টির ছাট থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে ওদের। ফলে সমস্ত হলকামরাটা পরিণত হ'য়েছে অন্ধকারায়। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে বড়খোকার চোখ দুটো—লেহন করে ফিরছে সদ্যস্নাতা নতমুখী মেয়েটার সর্বাঙ্গ।

ঋতব্রত বুঝতে পারলে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতেই মেয়েটি টাঙানো কাপড়ের আড়ালে ভিজে কাপড় ছাড়ছিল তখন। ওর দিকে পিছন ফিরলে যে দরজার দিকে মুখ করতে হয় একচক্ষু হরিণের মতই খেয়াল করেনি তা মেয়েটি।

"আসুন আমার সঙ্গে।"

মহিলাটি ঋতব্রতকে সঙ্গে করে পথে নামেন। দু পা গিয়েই উত্তর দিকে দেখিয়ে দেন এল/৩০ নম্বর বাড়ির ভগ্নস্তূপ। বলেন, এই ভগ্নস্তূপটি যদি সারাই করা হয় তাহ'লে তিনি এটায় উঠে আসবার চেষ্টা করবেন।

ঋতব্রত এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে—কেন উনি বারবার পার্টিশন দেওয়ালের কথা বলেন। কেন তাঁর ঐ পাকা হলঘর ছেড়ে এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে আশ্রয় নেবার ব্যাকুলতা। কিন্তু ঋতব্রত নিরুপায়। এ ঘরটি মেরামতের কথা নেই। বল্লে, "এটা তো মেরামত করা হ'বে না। তবে আমি দেখছি,

আপনার ঘরটায় একটা পার্টিশন দেওয়াল দিয়ে দেবো আমি। আপনার পরিবারে কজন লোক?"

"আমি আর আমার ঐ মেয়ে কমলা।" তারপর একটু ইতস্তত করে ফের বল্লেন, "দেখলেই তো বাবা সব নিজের চোখে। অমন হাটের মধ্যে কি থাকা যায় সোমত্ত মেয়ে নিয়ে? সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারিনা। না আমি, না মেয়ে। একা মানুষ, হাটে বাজারে যাই, ডোল আনতে যাই—মনটা পড়ে থাকে বাড়ির দিকে। সরলা মরে বেঁচেছে—কমলাটাও যদি—"

কি ভেবে চুপ করে যান আবার। ওর দিকে ফিরে বলেন, "সরলা আমার বড় মেয়ে। পার্টিশনের পরেই মারা যায়।"

"ও!" ঋতব্রত চুপ করে যায়।

"আর ওরই বা দোষ কি? ভগবান শুধু রূপই দিয়েছেন, কিন্তু···যাক্, তুমি বাবা যা হয় একটা ঝাঁপ টাঁপ টাঙিয়ে একটু আড়াল করে দিও আমার দিকটা।"

দেবে। ঋতব্রত তা নিশ্চয়ই দেবে। কথা বলতে বলতে ওরা ফিরে আসে এল/২৯ ব্যারাকে। মেয়েটি, কমলা নাকি যার নাম, তখন বাইরে একটা বাঁশের উপর মেলে দিচ্ছিল ভিজে কাপড়খানা। হঠাৎ চোখাচোখি হ'য়ে গেল ঋতব্রতের সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ সে দৃষ্টি নত করলে। সত্যিই সুন্দরী মেয়েটি। বছর সতেরো বয়স হ'বে। ঠিকই বলেছে ওর মা। যে রূপ হ'তে পারত ওর পক্ষে পরম কাম্য নিজের বাড়িতে—এখানে, এই পরিবেশে সেই রূপ-যৌবনই হয়তো হ'য়ে পড়েছে তার চরমতম শত্রু! এই হলাহলপ্রভব পঙ্ক-সমুদ্রের মাঝ থেকে কি করে উঠে এল এমন সদ্যস্নাতা কমলা সুধাভাণ্ড হাতে? মনের পটে ভেসে উঠল ঋতব্রতের গ্রীক-ভাস্কর্যের সদ্যস্নাতা ভেনাসের ছবি—আর তারই পাশাপাশি ফুটে উঠল আর একখানা চিত্র! ছিঃ! অন্তরবাসী পশুটার গলা টিপে ধরেছে ঋতব্রত।

অন্য কোনও সুদৃশ্যের কথা মনে করবার চেষ্টা করল সে—বোটানিক্যাল

গার্ডেনের ফুলের সম্ভার—গঙ্গায় স্বর্ধাত্ত! অন্য দিকে মন দিতে হবে তাকে। অন্য কোনও দৃশ্য—কোনও ছবির কথা। মনের নেগেটিভটার উপর বার বার নিতে লাগলো অন্যান্য ছবির স্ন্যাপসট—যাতে প্রথম আলেখ্যটার আর পাঠোদ্ধার করা না যায় কোনওদিন!

কথা হচ্ছিল সুপারেণ্ডেন দফাদারের বাড়ির বারান্দায় ব'সে। সান্ধ্য-আসরে ওরা দুজনে বসে গল্প করছে। ঋতব্রত বল্লে, "এবার আপনার বাড়িটায় হাত দেওয়া যাক। আপনার ঘরের চালটাতো ঝাঁজরা হ'য়ে গেছে। এটা এতদিন সারায় নি কেন সেনগুপ্ত?"

"আমিই বারণ করেছিলাম।"

"আপনিই? কারণ?"

"এমনিতেই মশাই কত কথা শুনতে হয় আমাদের। আমি আপনার ঠিকাদারকে ডেকে বলে দিয়েছি—সব ব্যারাক সারিয়ে, সব স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত করে তবে আমারটায় হাত দেবে। কোন শালা না বলতে পারে কিছু।"—বলে হা হা করে হাসলেন খানিক। তারপর বল্লেন, "তা যেন হ'ল, কিন্তু মিস্টার আউট-অব-প্লাম্বের পিছনে আপনি লেগেছেন কেন বলুন তো? দিন না মশাই ওর লেডিস রুমটা করে—"

"না, উনিতো লেডিস ওয়েটিং রুমটা চান না। উনি বলেন ও'র বাড়িতে চাকরদের একটা ঘর করে দিতে।"

"আঃ! আবার আপনি উল্টো-পাল্টা কথা বলেন। সেদিন বল্লাম না আপনাকে, যে চাকরের ঘর নয়—ওটাই লেডিস ওয়েটিং রুম। বউকে জানেননি—মাঝে মাঝে ওঁকে লেডিদের এন্টার্টেন করতে হয় না কি? এক-খানা ঘরে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। পাশে আর একটা ছোট কামরা থাকলে কত সুবিধা।"

স্তম্ভিত হ'য়ে যায় ঋতব্রত। এত কথা জানতো না সে।

"আপনি আর জানবেন কোথা থেকে। এ ক্যাম্পে শ্রীমান নক্র এবং শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র হ'চ্ছেন যুগল কেষ্ট ঠাকুর। রামলীলার অনেক খবরই পাই। এক একবার ইচ্ছাও হয় হাতে নাতে ধরে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিই। তারপর ভাবি মরুগ্‌গে যাক্। ক্যাম্পের মেয়েরা যদি দু'পয়সা রোজগার করে আমি বাধা দেবার কে? তবে মাঝে মাঝে এমন বিশ্রি খবর আসে। মানে অর্থনৈতিক চাপে তিল তিল করে ভদ্রঘরের মেয়েকে এমন ছিপে খেলিয়ে গাঁথে ওরা, যে ভাবলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আপনি জানেন, ক্যাম্প থেকে দৈনিক রেল স্টেশনে মেয়ে চালান যায়। তারা ফেরে ভোরের বাসে।"

ঋতব্রত বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না তার।

"আপনি কি করে জানলেন এত কথা? আমি তো কই শুনিনি কিছু?"

"আপনার না শুনলেও চলে। আমার পক্ষে সব খবর রাখতে হয়। কার হাঁড়িতে কত চাল মাপা হয় তা পর্যন্ত খবর রাখতে হয় আমাকে। ও হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনার বিরুদ্ধে সাধুচরণ ডাক্তার কিন্তু গুরুতর অভিযোগ এনেছে উপরওয়ালার কাছে।"

"তাই নাকি? আমার বিরুদ্ধে? কেন?"

"আপনি নাকি তার মেল-ওয়ার্ডটা সময়মত সারিয়ে দেননি। ঘর চাপা পড়ে দু'জন লোক জখম হ'য়েছে। ব্যাপারটা কি মশাই?"

ব্যাপারটা যে কি হ'য়েছিল ঋতব্রতও ঠিক জানে না। সেনগুপ্ত বলেছিল তার কথামত ছ'টা পুরানো শালের খুঁটির বাট্রেস দিয়ে দিয়েছিল বাইরে থেকে। তা সত্ত্বেও ঘরখানা পড়ে গেছে। ওয়ার্ক-সরকারই তাই বলেছে। মেজারমেন্ট বইতেও উল্লেখ আছে ছটা বল্লার কথা। অথচ ডাক্তারবাবু এবং তাঁর লোকজনেরা বলে শালের খুঁটি আদৌ দেওয়া হয়নি। চাপাপড়া ঘরটার তলা থেকে অবশ্য অনেক শালের খুঁটিই বেরিয়েছে। তবে সেগুলো আগে থেকেই ছিল কিনা বলা শক্ত। সেনগুপ্তের সঙ্গে এই নিয়ে সাধুচরণের বেশ মতান্তর হয়ে গেছে।

ওকে চুপ করে যেতে দেখে দফাদার নিজেই কথার মোড় ফেরালেন।

"হ্যাঁ, আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব।"

"বলুন।"

"ওই মেয়েটাকে—কি নাম যেন? কুসুম—ওকে আমিই দিয়েছিলাম আপনাকে। আপনি ওটাকে আজই জবাব দিন। আজ-কালের মধ্যেই আপনাকে আর একটা নতুন লোক দিচ্ছি আমি।"

"কেন বলুন তো? মেয়েটি তো কোন দোষ করেনি।"

"করেছে মশাই করেছে। সে খবর আপনি রাখেন না। গত বুধবার ও অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায়নি আপনার কলতলায়?"

"হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন সে কথা?"

"ওই তো বল্লাম, ক্যাম্পের সব খবর আমাকে রাখতে হয়।"

"তা, অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়াটা কি অপরাধ?"

"অপরাধ সেটা নয়। অজ্ঞান হ'য়ে যাবার পর আপনারা ওকে যে হাঁসপাতালে নিয়ে যান সেখানেই প্রকাশ পেয়েছে সে অসুস্থা।"

"অসুস্থা? কিন্তু কাজকর্ম তো করছে ঠিকই।"

"আপনি মশাই বড় বাজে বকান। খবর পেয়েছি মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়।"

একথা সেদিন রামশরণও বলেছিল বটে। সেদিনও ওর কথাটা বিশ্বাস হয়নি, আজও হ'ল না। ও তখন আগ্রহ দেখালো কুসুমের কাহিনী বিস্তারিত জানবার।

কুসুম এখানে প্রথম আসে একটি বছর তিনেকের শিশু নিয়ে। অল্পদিন পরেই ওর ঘরে যাতায়াত করতে দেখা গেল একটি লোককে। কঙ্কালসার প্রৌঢ় একটি। কুসুম ক্যাম্পে ভর্তি হবার সময় বলেছিল তার বাপ, মা, ভাই বোন অথবা শ্বশুরকুলের কেউ জীবিত নেই। তিন বৎসরের শিশুপুত্রটি নিয়ে একেবারে একা এসে সে আশ্রয় নেয় এই আশ্রয়শিবিরে। পরে এই

বিধবাটিকে পি. এল. তালিকাভুক্ত করা হয়। তাই হঠাৎ এই প্রৌঢ় লোকটির যাতায়াতে সন্দেহ হল দফাদারের। ডেকে পরিচয় নিলেন। লোকটি নাকি কুসুমের মামাতো বড় ভাই। নাম তারাপদ। কুসুম থাকতো এইচ. কিউ. ব্যারাকে। মাঝে মাঝে ওর দাদা তারাপদ আসে, খোঁজ খবর নেয়। দু'একবার জামা কাপড়ও এনে দিয়ে যায়। শেষে একদিন এইচ. কিউ. ব্যারাকের কয়েকজন বাসিন্দা এসে নালিশ করল কুসুমের সঙ্গে তারাপদর সম্পর্কটা সন্দেহ-জনক। অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতিতে নাকি দেখা গেছে ওদের দুজনকে দুএকবার। কথাটা দফাদার কানে তোলেন নি ; কারণ এ জাতীয় অভিযোগ কানে তুলতে গেলে ক্যাম্পের পরিচালন করা অসম্ভব। মাসের ত্রিশদিনই উপস্থিত হয় এই প্রকারের অভিযোগ। দিন যায়। আবার নালিশ আসে তাঁর কাছে। তারাপদ নাকি যক্ষারোগাক্রান্ত। তার ক্যাম্পে আসা বন্ধ করতে হবে। এবার অভিযোগটা উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ল না—কারণ সেটা এসেছিল এবার লিখিতভাবে। ডাক্তার সাধুচরণ এবার অভিযোগকারী। কুসুমের বাচ্ছাটার হয়েছিল টাইফয়েড। তাকে চিকিৎসা করতে গিয়ে কুসুমের শুভাশুভের প্রতি আকৃষ্ট হন সাধুচরণ। তারাপদর উপস্থিতিটা তাঁর বরদাস্ত হয়নি। তাকে পরীক্ষা ক'রে ঐ পত্র পাঠান তিনি ক্যাম্পের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়। তারাপদকে ডেকে পাঠানো হ'ল। এসে দাঁড়ালো আবার কঙ্কালসার লোকটি। চোয়ালের হাড় দু'টো উঁচু হ'য়ে আছে। চোখ দু'টো গভীর গর্তের ভিতর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়।

বাধা দিয়ে ঋতব্রত বল্লে, "আচ্ছা, লোকটার কি ডান গালে বড় একটা আঁচিল আছে ?"

"হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন ?"

এই লোকটাকেই তাহ'লে ঋতব্রত দেখেছে। লোকটা প্রায়ই আসে। ওর বাড়ির সামনে গাছতলায় বসে থাকে উবু হ'য়ে। কখনও কথা বলতে দেখেছে বাড়ির পিছনে কুসুমের সঙ্গে। এত কথা ঋতব্রতের হয়তো মনেই

থাকতো না—শুধু লোকটার কঙ্কালসার চেহারাটাই স্মরণ করিয়ে দিল সব কথা। কি করে যে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে শীর্ণ পা দু'টো এটাই যেন বিস্ময়। অবশ্য ওজনই বা কত হ'বে তার।

"নিন চা খান—এটি আমার মেয়ে উমা। কলকাতায় স্কুলে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছে বাপের কাছে।"

হাত দু'টি তুলে নমস্কার করে উমা। কতই বা বয়স! লীলার বয়সী হ'বে বোধহয়। লীলা ঋতব্রতের ভাইঝি। ওর মেজদা দেবব্রতের বড় মেয়ে। উমা নীরবে দু'কাপ চা নামিয়ে রেখে চলে যায়। ঋতব্রত তখন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে। তার মনে পড়ছে লীলার কথা। মেজদা চিঠি লিখেছেন, লীলাকে পছন্দ ক'রে গেছেন শ্রীরামপুরের সেই ভদ্রলোক। ওঁরা জ্যৈষ্ঠ মাসে ছেলের বিয়ে দেবেন না। পাত্র পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। আষাঢ় মাসে বর্ষা নেমে যাবে। তাই একত্রিশে বৈশাখ ওঁরা দিন দিয়েছেন। ঋতব্রতকে দিনদশেকের ছুটি নিয়ে অবিলম্বে যেতে লিখেছেন মেজদা। আর তাছাড়া হাজার দুই টাকার যোগাড় করতে হবে মেজদাকে। ঋতব্রত কি কিছু ধার দিতে পারেনা?

"কই চা খান। বিস্কুট নিলেন না যে?"

"হ্যাঁ নিই।"

আবার গল্প শুরু করেন দফাদার।

"বুঝলেন মশাই। তারাপদকে তো ঢালা হুকুম দিয়ে দিলাম আমার ক্যাম্প এলাকায় যেন না আসে কখনও। বেটা আমার পা জড়িয়ে ধরলে। কুসুমের ছেলে তাহ'লে নাকি বাঁচবেনা। কুসুমের ছেলের তখন তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। বুঝলাম সবই; পিসতুতো বোনের ছেলের জন্যে তো প্রাণ কাঁদছে তার! ধমক দিয়ে বের ক'রে দিলাম বেটাকে। তারপর থেকে আর সে কখনও আসেনি। আমি ভেবেছিলাম এরপর বুঝি কুসুমের মতিগতি বদলেছে। তাই আপনার ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন শুনছি, —স্বভাব না যায় মলে।"

"কুসুমের ছেলেটির কি হ'ল ?"

"কে ? ওর সেই বাচ্ছাটা ? সেটা ডাক্তারবাবুর ডেথ রেটের অঙ্কটাকে একঘর এগিয়ে নিয়ে গেল মাত্র। আর বলিহারি ডাক্তার, মশাই, ঐ সাধুচরণ ! বাচ্ছাটা মারা যাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই খবর পেলাম জাল পড়েছে এইচ. কিউ. ব্যারাকে। ক্যাম্প-অবতংসের বিচিত্র বীভৎসে আটকা প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে মেয়েটা। তার কিছু দিন পরেই আপনি এলেন। আমি ওকে এনে ঢুকিয়ে দিলাম আপনার ওখানে। এইটাই হচ্ছে আপনার উপর ডাক্তার সাধুচরণের চটবার তৃতীয় কারণ।"

"প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ দু'টি কি জানতে পারিনে ?"

"এক নম্বর লেডিস ওয়েটিং রুম, আর দু'নম্বর তাকে 'নক্র' বলা।"

বলে হো হো করে হাসলেন ভদ্রলোক প্রাণ খুলে। ঋতব্রত সত্যই অবাক হ'ল। খবর রাখেন বটে দফাদার। কোথায় নিভৃত কক্ষে সে ডাক্তারকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে তা পর্যন্ত খবর রাখেন উনি। অথচ এটা জানেন না যে, রাত্রের অন্ধকারে আজও আসে এখানে তারাপদ।

"আচ্ছা, কুসুমের পূর্ব-ইতিহাস জানেন না কিছু ? ওর স্বামী মারা যায় কি করে ?"

"আজ উঠুন। রাত ন'টা বেজে গেছে। মেয়েটাকে তাহ'লে কালই বিদায় করছেন তো ?"

"ওকে কেন তাড়াবো তা তো বল্লেন না ?"

"বল্লাম যে ও অসুস্থা।"

"কিন্তু আমার ওখানে তো তেমন কোনও ভারী কাজ করতে হয় না।"

"ভারি মুশ্‌কিল তো মশাই আপনার মত ব্যাচিলরকে নিয়ে। ওকে তাড়াবেন না তো কি সব দায়-ঝক্কি নিজের কাঁধে নেবেন ? শেষকালে লোকে যে আপনাকেই কলঙ্ক দেবে।"

ঋতব্রতের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে হো হো করে হাসলেন দফাদার।

"কি, এখনও বোঝেন নি কিছু? বিধবা কুসুম অন্তঃস্বত্ত্বা। যান্, বাড়ি যান্।"

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার মিস্টার ডাট এসেছেন কাজ পরিদর্শনে। বিলাতী য়ুনিভার্সিটির ছাপ আছে দত্তসাহেবের ললাটে। বিংশ-শতাব্দীতে জন্মালেও উনবিংশ শতকের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ছাপ রয়েছে তাঁর দেহে মনে। কথা বলতে গিয়ে বারবার 'মেরিকার কথা উঠে পড়ে। ম্যাসাচুসেট্স্-এর দিনগুলো তিনি ভুলতে পারেন নি আজও। সমুদ্রপারের দেশটাকে 'হোম' বলে উল্লেখ করেন যখন তখন। হেসে ফেল্লে কিন্তু আর রক্ষা নেই! চলনে, বলনে, টুপিতে, টাইয়ে তিনি পুরোদস্তর সাহেব। বাংলা উচ্চারণে একটু বাধ বাধ ভাব—ইংরাজী ইয়াঙ্কিদের মত। পাইপটাকে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত তাঁর অঙ্গের একটি অংশ মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কথা বলার সময় লোকে মুখ থেকে পাইপটা হাতে নেয়—উনি কথা শুরু করার আগে হাতের পাইপটা মুখে তোলেন।

এসে নামলেনই তিনি তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে। কি জানি জংসন স্টেশনে কেলনারের হুইস্কি ফুরিয়ে যাওয়াই এটার কারণ কিনা! দত্তসাহেবের পিছন পিছন দুই ওভারসিয়ার আর ঠিকাদারের মিছিলের পুরোভাগে ঘুরছিল ঋতব্রত। কথাবার্তা হচ্ছিল আদ্যোপ্রান্ত ইংরাজীতেই। তর্জমা ক'রে দিলাম কিছু কিছু—

"এল/২৯ ব্যারাকটা কোন্দিকে?"

"এগিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতী।"

"আই সী।"

ওরা সদলবলে চলল এল/২৯ ব্যারাকের দিকে। এত ঘর থাকতে এটাই বা দেখতে চাইলেন কেন দত্তসাহেব? ভাবে ঋতব্রত। ওঁর পক্ষে তো কোনও ঘরের নম্বর জানা বা মনে রাখা সম্ভবপর নয়!

ওদের পিছু পিছু চলেছে একপাল ছেলে-বুড়ো। অকাজের খেয়াল-

খুশিতে দিন কাটে ওদের। এ এক নতুন দৃশ্য। চল, মজাটা দেখাই যাক, ভাবখানা তাদের। দত্তসাহেব এল/২৯ ব্যারাকে এসে পৌঁছলেন সদলবলে।

বড়খোকা উবু হ'য়ে বসে দাঁতন করছিল বারান্দায়। রাস্তার টিউবওয়েলে কমলা বসে এঁটো বাসনগুলো ছাই দিয়ে মেজে তুলছিল। ওদের আসতে দেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গায়ের কাপড় একটু টেনেটুনে নিল। ঘরের ভিতর সেই আবক্ষ দাড়িওয়ালা লোকটি কি একটা বই পড়ছিল জোরে জোরে। দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে খালি গায়ে পাগলটা একমনে যেন শুনছে তা। বেড়ালের একটা বাচ্চাকে ধ'রে টানাটানি করছে দু'টি উলঙ্গ শিশু।

ওদের ঢুকতে দেখে সবাই যে যার হাতের কাজ বন্ধ রেখে এগিয়ে এল। এলনা কমলা। আর এলনা পাগলটা; একটা শিশুকে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে থাকল সে একটু দূরে।

"এ ঘরে ক'টা শালবল্লি বদলানো হ'য়েছে ?" প্রশ্ন করেন দত্তসাহেব।

"একচল্লিশটা স্যর।" জবাব দেয় জীবেন কর। এম. বি. খুলে পাতাটা বের ক'রে ধরে সে।

"লেট মি সী। দেখি, কোন্ একচল্লিশটা ?"

জীবেন আর ব্রজেন একে একে গুনে যেতে লাগলো। বাধা দিয়ে দত্তসাহেব বল্লেন, "কিন্তু সবগুলোতেই তো আলকাতরা মাখানো। কোন্টা নতুন, কোন্টা পুরানো বুঝবো কি ক'রে ? পুরানো বল্লায় আলকাতরা দিয়েছ কেন ?"

জীবেন তাকায় সেনগুপ্তের দিকে। সেনগুপ্ত ফিরলো ঋতব্রতের দিকে

"আর য়ু অল ডাম্ ? বোবা নাকি সব ? পুরানো বল্লায় আলকাতরা দেওয়া হয়েছে কার হুকুমে জানতে পারি কি ?"

ঋতব্রত এগিয়ে আসে, "আমিই বলেছিলাম স্যর।"

"এ্যাণ্ড হোয়াই? কেন?"

"ঠিকাদারের মাল বেশি এসে গিয়েছিল। তাই কিছু বল্লাতে লাগিয়েছে। তার মাপ তোলা হয় নি।"

"ছাণ্ড্‌ ইওর মেজারমেণ্ট ফর কোলটারিং! আলকাতরার মাপ চুরি ক'রে কেউ লাভ করতে বসে না। একচল্লিশটাই নতুন খুঁটি দেওয়া হয়েছে তা আমি বুঝবো কি ক'রে? সব ক'টার রঙই তো নিগারের মত কালো ক'রে তুলেছ!"

সমস্ত দায়িত্বটা ঋতব্রতের। ওর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সেনগুপ্ত আর সিংজী মিলে এই কাণ্ডটা করেছে। মনে পড়ল লিখিত অর্ডার দেবার সময় ওদের দু'জনের ইঙ্গিতপূর্ণ হাসির কথা।

দত্তসাহেব ঋতব্রতের দিকে ফিরে বল্লেন, "নাউ টেল্‌ মি বাবা মুস্তাফা, হুইচ ইস্‌ আলিবাবাস্‌ কোয়ার্টার্স?"

কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করছে ঋতব্রতের। মরিয়া হ'য়ে মিথ্যা কথা বলছে সে। চাকরি-জীবনে তার প্রথম অনৃতভাষণ!

"পুরানো শালের খুঁটিগুলোতে আলকাতরা লাগাবার আগে আমি গুনতি করে নিয়েছিলাম।"

"তবে বইতে সই করা হয়নি কেন?" ওর নাকের ডগায় মেলে ধরেন মেজারমেণ্ট বইটা।

"তখনও মাপ ওঠেনি এম. বি-তে। আমার নোটবইতে টুকে রেখেছি।" মিথ্যাভাষণের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে কিন্তু এস. ডি. ও. সাহেব! খাতাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মিস্টার ডাট। কুড়িয়ে নিল জীবেন কর। লজ্জায়, অপমানে ঋতব্রতের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছিল। দেখলে ঘরশুদ্ধ লোক ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। মুখভঙ্গি করে তখনও দাঁতন করছে বড়খোকা। একগোছা ঝকঝকে বাসন হাতে নিয়ে দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কমলা। চোখাচোখি হ'তেই সরে গেল আড়ালে। শ্মশ্রুধারী

বৃদ্ধ উস্‌খুস্‌ করছে ও কোথায়। পাগলটা উঠে দাঁড়িয়েছে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে। তার বাঁধন আল্‌গা ক'রে ন্যাংটো ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে দত্তসাহেবের পায়ের কাছে।

"আমরার একটা দরখাস্ত আছে স্যর।"

দত্তসাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন। ভিড় ঠেলে বড়খোকা সামনে এগিয়ে এল।

"আমরার হকল ঘরই পার্টিশন করতে হইব।"

"টেল'এম নো পার্টিশন্‌স্‌ উড্‌ বি কন্সট্রাক্‌টেড্‌।"

সেনগুপ্ত তর্জমা ক'রে বল্লে, "পার্টিশন করা হবেনা কোথাও।"

"এইডা তবে কি?" কমলাদের ঘরের অসমাপ্ত পার্টিশনটার দিকে দাঁতনটা উঁচু করে দেখাল বড়খোকা।

"ইয়েস্‌! হোয়াটস্‌ ইট্‌? আই থিংক্‌ ইট্‌স্‌ নট্‌ এগেন ইন্‌ য়োর ডাইরেকসন্‌স্‌ বোস?"

"হ্যাঁ, এটাও আমিই করতে বলেছি। বিশেষ কারণ ছিল।"

"স্পিক্‌ ইংলিস্‌, বোস। আই ডোণ্ট লাইক দীস্‌ হিদেন্‌স্‌ শুড্‌ ফলো আস্‌।"

"আই হ্যাড্‌ স্পেশাল রিসন্‌স্‌ স্যর।"

"স্পেশাল রিসন্‌স্‌ মাই ফুট!"

তারপর জীবেনের দিকে ফিরে বল্লেন, "এটাকে ভেঙে দাও।"

অপমানে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে ঋতব্রতের মুখ। পাশ ফিরতেই নজরে পড়ল দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান হয়ে যাওয়া মা ও মেয়ে। আবার চোখাচোখি হ'ল ঋতব্রতের সঙ্গে। খুক্‌ খুক্‌ ক'রে কেশে উঠল ওপাশ থেকে বড়খোকা। থ্যাক্‌ থুঃ! বাইরে থুথু ফেলে এল সে।

"না, ওটা ভাঙবে না জীবেন!" হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঋতব্রতের মুখ দিয়ে।

"বাই জোভ! হোয়াট ড্যু মীন্‌!" ঘুরে দাঁড়ালেন এক্সিকিউটিভ

এঞ্জিনিয়ার মিস্টার ডাট্।. কড়া মেজাজের অফিসার বলে সারা ডিপার্টমেণ্টে তাঁর সুখ্যাতি আছে। ঋতব্রত তখন মরিয়া! মুহূর্তের মধ্যে চরম অবস্থাটাও ভেবে নিয়েছে সে। পদত্যাগপত্র? হ্যাঁ, তাতেও সে পেছপাও হবেনা। তারপর দেখল জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আছেন মিস্টার ডাট।

"আই মীন আই শ্যাল বেয়ার দি কস্ট্ ফ্রম্ মাই ওন পার্স। আই হ্যাভ অল্‌রেডি গিভ্‌ন্ হার ওয়ার্ডস্।"

"হার?" চকিতে মিস্টার ডাটের নজরে পড়ে কমলা একদৃষ্টে চেয়ে আছে অপমানে লাল হ'য়ে যাওয়া ঋতব্রতের মুখের দিকে।

"আই সী! এ লেডি ইন্ কোশ্চেন। ওয়েল দেন এ্যাস্ য়ু প্লীজ।"

খুশি হ'য়ে ওঠেন মিস্টার ডাট্। নিজের যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সম্ভবত। হঠাৎ পাশে দাঁড়ানো ন্যাংটো ছেলেটাকে প্রশ্ন করেন, "তোমার নাম কি আছে?"

হয়তো সাহেব দেখতে অভ্যস্ত নয়, নয়তো অনভ্যস্ত এ জাতীয় খাস্তা বাংলায়। ছেলেটি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে শুধু। দত্তসাহেব হিপ্ পকেট থেকে একটি আধুলি বের ক'রে গুঁজে দিলেন ন্যাংটো ছেলেটার হাতে—"মিষ্টি খাবে তুমি।"

হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়ে ওপাশ থেকে পাগলটা। ছেলেটার হাত থেকে আধুলিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় ঠিক যে ভঙ্গিতে মিস্টার ডাট ছুঁড়ে ফেলে-ছিলেন মাপের খাতাখানা। তারপর নগ্ন শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে বল্লে, "Time o Da´na os et do´na fe-ren´tes, My boy."*

সমস্ত ঘরটা তখনও নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ। অশিক্ষিত পাগলটা যে ছ্যাট্-ম্যাট্-ফ্যাট্ ক'রে ইংরাজী বলবার ব্যর্থ চেষ্টা করবে এটা যেন অবিশ্বাস্য! সকলের উপর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে পাগল তার শিশুকেই আবার বল্লে, "আই এ্যাম স্পিকিং ল্যাটিন, মাই চাইল্ড। আই ডোণ্ট লাইক স্লাট্ কন্‌ভারসেসন্

* গ্রীকরা যদি উপহারও নিয়ে আসে তবু তাদের বিশ্বাস করা চলে না, খোকা।

অফ, দি হিদেন্‌স্‌ বি ফলোড বাই দীস্‌ ইংলিসস্পিকিং জেন্টল্‌মেন টু।"

এবার কান লাল হবার পালা মিস্টার ডাটের। অপমানে, লজ্জায় তিনি বেগুনী হ'য়ে গেলেন।

ঋতব্রত পরে জেনেছিল পাগল মৈমনসিং জিলা স্কুলের রিটায়ার্ড হেড-মাস্টার। ডবল এম. এ.।

কুসুমের জীবনের মাঝের অংশটা, অর্থাৎ যৌবনাংশ সংগ্রহ করেছিলাম ম্যাডাম বোসের কাছে। গিয়েছিলাম ঋতব্রতের বাসায় ওটা যোগাড়ের চেষ্টায়। সে বাড়ি ছিল না। মিসেস বোস বসালেন আমাকে। চা খাওয়ালেন। আমার উপন্যাস কতদূর অগ্রসর হ'ল সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বারবার বল্লেন, "আমার কথাটা লিখেছেন তো? কই, কি লিখেছেন দেখি? আমার কিন্তু অনেক কোয়ালিফিকেসন্স আছে। সব কথা লিখছেন তো?"

আশ্বাস দিলাম তাঁকে। যথাযোগ্য সম্মান দেবো প্রত্যেক চরিত্রকেই। অর্থাৎ আমার রচনাশৈলীতে যতখানি সম্ভব। একটু পরেই বল্লাম, "আজ উঠি। এসেছিলাম যে উদ্দেশ্যে তা তো আজ হ'লনা দেখছি।"

উদ্দেশ্যটার বিষয়ে উনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। শুনে বল্লেন, "ওমা, তাই নাকি? কুসুমের কথা সেই পর্যন্ত লিখে ফেলে রেখেছেন? আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিনা।"

উঠে গিয়ে আঁচল থেকে চাবি নিয়ে কাঠের আলমারিটা খুললেন। তারপর একটা কাঠের ছোট বাক্স খুলে বের করলেন একতাড়া চিঠি। বেছে বেছে একখানি নিয়ে বসলেন আমার সামনে।

"শুনুন। মানে সবটা শুনে কাজ নেই আপনার। না হ'লে এটাই দিয়ে দিতে পারতাম আপনাকে।"

তারপর নিজের মনেই পড়তে লাগলেন। কোথা থেকে শুরু করবেন

বোধহয় তাই স্থির করতে পারছিলেন না। জানি তো ঋতব্রতকে। এত এলোমেলো কথাই লিখতে পারে! হয়তো মিসেস বোসের লজ্জা পাবার মত কোনও কথা আছে ওটায়। হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি চাপল মাথায়। অতর্কিতে ছোঁ মেরে তুলে নিলাম চিঠিখানা। হকচকিয়ে উঠলেন মিসেস বোস। খানিকটা হাত কাড়াকাড়ির পর চিঠিটা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করল আমার বুকপকেটে।

"এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু! ছি ছি, দিয়ে দিন বলছি ও চিঠি! না, ওখানা কিছুতেই দেখতে পাবেন না আপনি। উনি ভীষণ রাগ করবেন কিন্তু।"

"উনি যদি ভীষণ রাগই করেন তবে সামলাবেন আপনি। চিঠিখানা যার লেখা তার আবার মালিকানা সত্ব কিসের? যার বাক্স থেকে খুঁজে পাওয়া যায় সত্বটা তারই। আর আপাতত যখন আমার বুকপকেটে আছে তখন মালিক আমিই।"

এই চিঠিখানা মনে হয় ঋতব্রতের আগের চিঠিখানার ঠিক পরেই লেখা। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকেও একখানা চিঠি এসেছে ওর নামে দেখা যাচ্ছে —

"সুচরিতাসু—

তোমার একুশে বৈশাখের চিঠি এই মাত্র পেলাম। তোমার পত্রপ্রাপ্তি এবং আমার কলম বার করে লিখতে বসার মধ্যে আমার ঘড়ির বড় কাঁটাটা একটা সমকোণ রচনা করবারও সময় পেল না। বোঝ, কত ভালো ছেলে হয়েছি! কুসুমের গল্পটা কি হবে জানতে চেয়েছ তুমি। অর্থাৎ ছোটগল্প, বড় গল্প অথবা উপন্যাস। এবার ভারি মুশকিলে ফেলেছ তুমি। সেটা আমি কি জানি? আমার কাছে তো এ তিনের বার—একটা জীবনী। তোমার কলমের ডগায় সেটা কি রূপ পরিগ্রহ করবে তা আমি কি ক'রে বলবো? কুসুমের কথা বলছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে জানাতে চাই, ইতিমধ্যে তোমাদের

কাগজের জন্যে একটা কবিতা লিখেছিলাম। নিশ্চয়ই যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি কোথাও। তবে কোন্ বাক্সের কোন্ খোপে অথবা কোন্ বইয়ের কোন্ ভাঁজে, তা এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। তুমি কুসুমের কথা জানতে চেয়েছ, কিন্তু এখন আর তার গল্প লিখতে ইচ্ছা করছে না। এখন লিখতে ইচ্ছা করছে অন্য একটি মেয়ের কথা। তার নাম কমলা। মেয়েটি সত্যই যেন কমলা। এই পঙ্কিল পরিবেশে কি করে ফুটল অমন কমল তাই ভাবি। অবশ্য পঙ্কেই তো কমল জন্মায়। মেয়েটিকে দূর থেকে আমি কয়েকবার দেখেছি মাত্র। কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। প্রথম তাকে দেখি একটি অসতর্ক মুহূর্তে। সব কথা তোমাকে আজ লিখতে পারলাম না। ভগবান যদি দিন দেন তখন জানাবো। তবে প্রথম দর্শনের পর থেকেই ওর নামে একটা কবিতা লিখবো লিখবো ভাবছি। ঈস্, অত চটে যাচ্ছ কেন? আরে না, না, মিথ্যা গল্প বানাচ্ছিলাম। কমলা ব'লে কোনও মেয়েই নেই ক্যাম্পে।

হ্যাঁ, কুসুমের কথা। কোথায় শেষ করেছিলাম যেন? সেই 'বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তানী বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা' অবস্থায়। আরে, হ্যাঁ বাপু! তেরো বছরের মেয়ের প্রতি ও বর্ণনা খাটে না, সেটা আমিও বুঝি।

শিশু ভাবে 'যে দিন আমি প্রথম বড় হবো'। শুনে তোমরা হাসো। মানুষ কি এক দিনে বাড়ে? মানুষের বয়স বাড়ে দিনে দিনে, পলে অনুপলে। তা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ঘটে না। অন্তত কুসুমের বয়স একদিনেই বেড়েছিল পাঁচ বছর—প্রায় রিপ্ ভ্যান উইঙ্কল্-এর মত। পরদিন থেকে সে একেবারে অন্য মানুষ।

ঘর থেকে বার হয় না। মায়ের হাতে হাতে কাজ করতে যায়। অনভ্যস্ত হাতে কিছুই করা সম্ভব হয় না। গাল খায় মায়ের কাছে। ছোট বোন কামিনীর কাছে শুনতো অভিযোগ—'মেজদি তুমি কী বোকা!' কামিনীর কাছে সংসারের পাঠ নিতে শুরু করল কুসুম। শিখল ড্রেস করে কাপড় পরতে গেলে আঁচলের জন্যে কতখানি কাপড় হাতে রেখে কোমরে কুঁচি গুজতে

হয়। ঝাঁট দেওয়া থেকে, বিছানা পাতা, মোচা-এঁচড় কোটা। ক্রমে রান্না করা, বড়ি দেওয়া, আচার বানানো।

ঘরের জানালা থেকে বসে বসে দেখত বাপের পাঠশালায় বসে সুর ক'রে নামতা মুখস্ত করত ছেলের দল। কখনও কখনও বিশ্বনাথ আসত। পণ্ডিত-মশায়ের কাছে নিত কাদম্বরী অথবা বিক্রমোর্বশীর পাঠ! "অপর্যাপ্তপুষ্প-স্তবকাবনম্রা—" শ্লোকটা পড়বার সময় বিশ্বনাথের দৃষ্টি বই থেকে উঠে আটকে যেত পাশের বাতায়নে। সেখানে সঞ্চারিণী পল্লবিনী কোন লতা সরে যেত বিদ্যুৎচমকের মত। কিশোর বয়সের বন্ধুরা কুসুমকে ভুলল সহজেই। ভুলল না বিশ্বনাথ। সে তখন তারুণ্যের মধ্যাহ্ন গগনে। নতমুখী ভৎর্সিতা বালিকার মুখখানা আর কিছুতেই ভুলতে পারলে না সে।

কুসুম তার বিচরণ ক্ষেত্র সংকীর্ণ করল বটে, কিন্তু বাহির বিশ্ব তাকে ক্ষমা করল না। ওকে মাঝে নিয়ে যে ঝগড়াটা হয়েছিল সেটাকে বালসুলভ চপলতা বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ ছিল বালকদের পক্ষেই। সমাজপতিরা অত সহজে ক্ষান্ত হলেন না। আবদুলের বাপ এসে পণ্ডিতকে শাসিয়ে গেল। পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোকও এসে পাঁচ কথা শুনিয়ে গেলেন নিরীহ পণ্ডিতকে। ঘরের মধ্যে চুপ করে সব সহ্য করলে কুসুম।

পল্লীগ্রামে তেরো বছরের মেয়েকেই অরক্ষণীয়া ব'লে গণ্য করা হয়। কুসুমের জন্য পাত্রের সন্ধান করছিলেন পণ্ডিতমশাই, কিন্তু গেছো-মেয়ে বলে একটা দুর্নাম তার আগেই ওর সহজ পরিণয়ের পথটিকে ক'রে রেখেছিল কণ্টকিত। যে মেয়ে গাছে ওঠে, ফুটবল খেলে, ক্ষেত থেকে অনায়াসে কপি চুরি করে নিয়ে যায়—সে পণ্ডিত বংশসম্ভূতা হলেও গ্রহণীয়া নয়! কুসুমের বর জোটে না।

এ ভাবেই কেটে যায় দীর্ঘ দু'টি বছর। ব্যর্থ সন্ধানে পণ্ডিতমশাই হতাশ হয়ে পড়েছেন। ইদানিং 'মহিমার্ণবেষু' মার্কা চিঠিপত্র আর দিয়ে যায় না ডাকপিয়ন সপ্তাহান্তে। তিনিও বন্ধ করেছেন চিঠিপত্র লেখা। পণ্ডিতগৃহিণী

এসে মাঝে মাঝে তাগাদা দেন, "ওগো অমন হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকো না। যা হয় কিছু করো।"

পণ্ডিত জবাব দেন না। নস্যদানি থেকে একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে পরিপাটিরূপে নাসাপ্রান্ত মুছে নিয়ে বলেন, "গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

পণ্ডিতমশায়ের পরিবারে দুটি বছরে পরিবর্তনটা দৃষ্টিগোচর না হলেও লক্ষ্মীপুর গ্রামে এসে গিয়েছিল এরই মধ্যে যুগান্তর। য়ুনিয়ন বোর্ডের ইলেক্‌সনে প্রবীণ জমিদার হরিহর গাঙ্গুলীর পরাজয় এবং আবদুল গনির বাপের প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তিই লক্ষ্মীপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের সংবাদ অন্য রকম। ঢাকার রায়টের নানান মুখরোচক সংবাদ পল্লবিত আকারে এসে পৌঁছতো লক্ষ্মীপুর গ্রামে। পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ধূমায়িত হচ্ছিল অন্তরালে। গোপন বৈঠক বসছিল এ পক্ষে ও পক্ষে। একদিন হরিহর গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে শান্তি-সম্মেলনও হয়ে গেল একটা। হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়ে শপথ নিলে গ্রামে তারা কোন অশান্তি আসতে দেবে না। হরিহর গাঙ্গুলীর বাড়ির বড় আঙিনায় জমায়েৎ হলেন গ্রামের গণ্যমান্য অতিথিবর্গ। আবদুলের বাপ হলেন সে সভার সভাপতি। হরিহর গাঙ্গুলী সকলকে মিষ্টিমুখ করাবার আয়োজনও করেছিলেন। শান্তি-সম্মেলনের আয়োজনে আশ্বস্ত হল সবাই। সভার উদ্বোধনে বিশ্বনাথের ক্লাবের ছেলেরা এল উদ্বোধন সংগীত গাইতে। বিশ্বনাথ তখন ব্যস্ত ছিল ভাঁড়ারে। সমবেতকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্, সুজলাং সুফলাং' গান শুরু হ'তেই সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। দেখা দেখি উঠে দাঁড়াল সভাস্থ সবাই। চিকের পর্দার ওপাশে কুসুমরা বসেছিল। তারাও উঠে দাঁড়াল। গান তখন চলেছে 'মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং'—সভাপতি মণ্ডপ ছেড়ে ধীরে ধীরে নেমে এলেন। নেমে এলেন অন্যান্য গণ্যমান্য মুসলমান অতিথিরা। ছুটে আসেন হরিহর প্রমুখ উদ্যোক্তারা। "ব্যাপার কি, চলেন কোথায়?"

"মাপ করবেন গাঙ্গুলীমশাই। খোদা আপনার দয়া করবেন। কিন্তু

আমরা তো এ গান শুনতে আসিনি। এ গান সম্বন্ধে সব কথাই তো জানেন। অপমান করবার জন্যেই যে আমাদের ডেকেছিলেন তা বুঝতে পারিনি।"

"সে কি? সে কি?"

বন্ধ হয়ে গেল বন্দেমাতরম্ সংগীত।

আপোষে ঠিক হ'ল, 'সারে যঁহাসে আচ্ছা' গাওয়া চলতে পারে। কিন্তু সে গান কারও জানা নেই। অগত্যা আবার আপোষে ঠিক হ'ল 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা' গাওয়া হক। এ গান জানতো ক্লাবের ছেলেরা—কিন্তু রাজী কেউ হ'ল না গাইতে। বিশ্বনাথ এসে বল্লে, "বন্দেমাতরম্ গাওয়া যেখানে পাপ, আমি বা আমার ক্লাবের ছেলেরা সেখানে থাকবে না।"

তেড়ে এলেন হরিহর গাঙ্গুলী, বাধা দিলেন সভাপতি।

"ওদের যেতে দিন গাঙ্গুলীবাবু। আমরা কিছু মনে করিনি।"

তিনি খবর রাখেন অনেক গূঢ় ইতিহাসের। জানতেন এ জাতীয় ছেলেদের মুখের 'বন্দেমাতরম্' সংগীত লাঠি চার্জ করে, গুলি চালিয়েও থামানো যায় না। বিনা সংগীতেই সভার কাজ সারা হ'ল। ক্লাবে ফিরে গিয়ে ছেলেরা সার দিয়ে শেষ করলে তাদের অসমাপ্ত সংগীত।

এই ঘটনার সাতদিন পরে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে বসল 'মিলাদ শরিফ'। গ্রামের ইতরভদ্র সমস্ত হিন্দুর নিমন্ত্রণ ছিল সেদিন। বিশ্বনাথ ক্লাবে বসেই শুনতে পেল গান হচ্ছে ও পাড়ায় সমবেতকণ্ঠে 'সারে যঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থঁা হমারা হঁ্যায়।'

উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দিল সে মহাকবি ইকবাল রচিত মহাসংগীতকে—সে দৃশ্য দেখল না কেউ।

কেউ দেখেনি একথা বলা চলে না। নির্জন কুস্তির আখড়ার অনতিদূরে ছিল একজন লোক। মাসাধিক কাল ধ'রে বিশ্বনাথের প্রতিটি পদক্ষেপ সে নোট করে যাচ্ছে।

এর পরেই লক্ষ্মীপুর গ্রামে দ্রুতগতিতে ঘটে গেল কয়েকটি ঘটনা। সবিস্ময়ে

একদিন সকলে শুনল সদলবলে বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে পুলিস রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার ছিল নাকি গোপন যোগাযোগ। শান্তি-সম্মেলন আর মিলাদ শরিফ দিয়ে কিন্তু অনিবার্য দুর্দৈবকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। কালবৈশাখীর মতই এসে গেল দাঙ্গার ঢেউ লক্ষ্মীপুর গ্রামেও।

স্মরণাতীত কাল থেকে যারা পাশাপাশি বাস করে এসেছে, কি আশ্চর্য, দেখা গেল তারা দুই জাতি। পরস্পরের শত্রু। যে বিজ্ঞানী এই অদ্ভুততম আবিষ্কারটি করলেন কলম্বস, নিউটন, আইনস্টাইনের পাশে তাঁর স্থান হল কিনা জানি না, কিন্তু ওঁদের আবিষ্কারের চেয়ে তাঁর আবিষ্কারের ফলাফলটা কম চমকপ্রদ নয়। দাঙ্গার দাবানল এসে পৌঁছলো লক্ষ্মীপুরেও। ডাকাতি হয়ে গেল একদিন গ্রামে।

লক্ষ্মীপুরে সবচেয়ে ধনী হরিহর গাঙ্গুলী—তারপর রায়রা। গনিরাও বড়লোক। ডাকাত পড়ল কিন্তু এ তিনবাড়ি বাদ দিয়ে পণ্ডিতের বাড়িতে। পণ্ডিতের পাঠশালা ঘরে আগুন দিয়ে, গৃহ-দেবতাকে বিকলাঙ্গ করেই তারা চলে গেল। টাকাকড়ি নিয়ে গেল না কিছু—কারণ তা তারা নিতে আসেনি। তারা যা নিতে এসেছিল, তা কিন্তু নিয়ে গেল ঠিকই। নির্মল অথবা বিশ্বনাথের কানে খবরটা অবশ্য পৌঁছয়নি ; তারা তখন লৌহ-কপাটের অন্তরালে।

ভাগ্যক্রমে সেই দিনই ধলেশ্বরী দিয়ে নৌকা ক'রে যাচ্ছিলেন ফণী হাজরা—কি একটা তদন্তে। ফণী হাজরা থানার ছোট দারোগা। তাঁর প্রচেষ্টায় তালপুকুরের পাড়ের লখা সা'র পোড়ো ভিটে থেকে উদ্ধার করে আনা হ'ল বন্দিনীকে। মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা কপাল চাপড়ালেন, বাপ বসেছিলেন বিকলাঙ্গ গৃহ-দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে মাথায় হাত দিয়ে। ছোট বোন কামিনী রোয়াকের খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখছিল বিস্ফারিত চোখে। উঠান ভরে গেছে এক গাঁ লোকে। ধূলা-কাদার মাঝখানেই উঠানের উপর বসে আছেন মা। তাঁর কোলে মাথা গুঁজে নিশ্চল পড়ে আছে দিদি—একরাশ খোলা চুল লুটোচ্ছে কাদায়।

কলঙ্কিনী কুসুমের গল্প এখানেই আপাতত শেষ করছি। চিঠিটা এমনিতেই বেশ বড় হ'য়ে গেছে। শীঘ্রই একবার কলকাতা যেতে পারি। তোমার চিঠিতে অভিযাত্রিকের সম্পাদনায় অমল ঘোষের সাহচর্য পাচ্ছ লিখেছ। তাঁকে তো চিনলাম না। এটি কি তোমার গগনের নবাবিষ্কৃত তারকা? আলাপ করার বাসনা রইল। লীলার বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেছে একত্রিশে বৈশাখ। মেজদা লিখেছেন। দিন সাতেকের ছুটি নিচ্ছি তাই। আচ্ছা, তুমি কি মাসীমা অথবা মেশোমশাইকে আমাদের কথাটার কোনও ইঙ্গিত দিয়েছ? নাকি আমিই লিখব? কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য কলকাতা যাচ্ছি। মুখেই গিয়ে বলা চলতে পারে। তাতে কিন্তু ভারি লজ্জা করবে আমার। তুমি পত্রপাঠ জানিও। যাতে কলকাতা যাবার আগেই খবরটা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। তাহলে তাঁদের জবাবটাও মৌখিক শুনে আসতে পারি। অবশ্য তুমি যখন আমার সহায় আছ তখন জবাবটা পূর্বাহ্নেই আন্দাজ করতে পারি।

ভালবাসা ও শুভেচ্ছা রইল—

ইতি—"

"আপনার সঙ্গে একজন লোক দেখা করতে চায় স্যার।"

"ডেকে দাও।"

রতনের পিছন পিছন প্রবেশ করে একজন লোক। হাতে একটা ক্যাম্বিশ ব্যাগ—একটা ভাঙা ছাতা। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো—তার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আছে পায়ের দুটি আঙুল। ধুতিটা খাটো ক'রে পরা, কোঁচাটা পাট করে ফের কোমরে গোঁজা। হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালো।

ঋতব্রত দেখেই চিনতে পারল তাকে—তারাপদ।

একটু মজা করবার জন্যেই পরিচিত সুরে ঋতব্রত বলে, "কি খবর তারাপদ? আবার তুমি ক্যাম্পে যাতায়াত করছ ক'বে থেকে?"

লোকটা হতভম্ব হ'য়ে গেল। বোকার মত চেয়ে রইল শুধু। গলার কাছে কণ্ঠার হাড়টা ওঠানামা করতে লাগল কেবল।

"কি হ'ল? কি বলবে বলনা? তোমার বোনের কথা তো?"

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা কোনক্রমে বল্লে, "হুজুর কি আমাকে চেনেন?"

ঋতব্রত হাসল, বল্লে, "তোমাকে কি আজ থেকে চিনি? যাক্, বল তোমার কি আর্জি।"

"হুজুর আমার সম্বন্ধে কি জানেন?"

"সেটা এ ক্ষেত্রে বিচার্য নয়। তুমি যেজন্যে এসেছ তাই বল।"

"আপনি আমার কথা কার কাছে শুনেছেন?"

বিরক্ত হয় ঋতব্রত। এক কথা বারবার ভালো লাগে না তার। বলে, "বাজে কথা বল না। কাজের কথা কি বলতে চাও বল।"

হঠাৎ বদলে যায় কঙ্কালসার লোকটা। হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে বল্লে, "নমস্কার। আমার কিছুই বলার নেই।"

লোকটা চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। তাকে ফিরে ডাকে ঋতব্রত।

"কি হ'ল তোমার? চলে যাচ্ছো কেন? কি বলবে বলনা।"

তারাপদ ফিরে আসে। একটু ইতস্তত করে বলে, "আজ্ঞে কুসুমের কথাই বলতে এসেছিলাম। ওর শরীরটা খারাপ। শুনলাম দফাদার সাহেব ওকে অবলা-আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। তাই বলছিলাম—" মাঝপথে চুপ করে যায়।

"তাই কি বলছিলে—বলনা।"

হঠাৎ লোকটা জড়িয়ে ধরে ঋতব্রতের দুটি পা। "আপনি আমাদের বাঁচান স্যার।"

"কি হল? আঃ, পা ছাড়।"

ওকে সোজা করে বসিয়ে সমস্ত খবরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করে

ঋতব্রত। কুসুমকে অবলা-আশ্রমে পাঠাতে তারাপদর ঘোর আপত্তি। অথচ এরকম অসুস্থা মেয়েকে হয়তো ক্যাম্পে রাখতেও রাজী হবেন না দফাদার সাহেব। তাই তারাপদর অনুরোধ যেন ঋতব্রত আর কিছুদিন কুসুমকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়। ইতিমধ্যে তারাপদ কলকাতায় কোনও বস্তিতে বাসা ঠিক ক'রে ওকে নিয়ে যাবে। ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে যায় ঋতব্রতের সর্বাঙ্গ! তবে তো দফাদারের অনুমান মিথ্যা নয়। এ অবস্থায় কুসুমকে নিয়ে গিয়ে কোনও বস্তিতে তোলার কল্পনা করে কি করে এই কঙ্কালসার লোকটা? আর সেই প্রস্তাবে ও সাহায্য প্রত্যাশা করে ঋতব্রতের কাছে!

"কুসুমের অসুখটা কি?" প্রশ্ন করে ঋতব্রত।

ইতস্তত করে তারাপদ। হাপরের মত বুকটা ওঠাপড়া করে তার।

"তুমি জানো তার অসুখটা কি?"

নীরবে নতনেত্রে লোকটা মাথা নেড়ে জানায় সে জানে।

"এ অসুখ তাকে কে এনে দিয়েছে তাও জানো অনুমান করি?"

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলে লোকটা। কান্নায় ভাঙা অনেক কথা বলে ওঠে একসঙ্গে।

"বিশ্বাস করুন তার কোনও দোষ নেই। পাপ কুস্‌মি করতে জানে না।.........ওকে যারা চিনতো তারা কল্পনাও করতে পারে না......আমি হলপ করে বলতে পারি কোন অন্যায়, কোন পাপ করেনি কুস্‌মি। আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি আজ, তবে যেন বজ্রাঘাত হয় আমার মাথায়।" হাত দুটো শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে নাটকীয় ভঙ্গিতে।

এক ধমকে থামিয়ে দেয় তাকে ঋতব্রত।

"সমস্ত জেনেশুনে কুসুমকে নিয়ে একসঙ্গে কোনও বাড়িতে ওঠার কল্পনা করছ কি করে তুমি? কলকাতায় কি সমাজ নেই? সেখানে পাড়ার ছেলেরা তোমাকে গুঁড়িয়ে ফেলবেনা?"

"কেন? অসহায় দুঃস্থা বোনকে নিয়ে এক বাড়িতে থাকা কি অন্যায়? পাপ? কুসুম আমার বোন, নিকট আত্মীয়।"

"নিকট? কত নিকট?"

"আজ্ঞে?" লোকটা হয়তো শুনতে পায়নি ঋতব্রতের প্রশ্ন।

"দেখ, হাড় ক'খানির মায়া রাখ? তা যদি রাখ, তা হ'লে আর ওপথে যেও না। পিসতুত বোনের প্রতি যেটুকু কর্তব্য তুমি করেছ, তাই যথেষ্ট। এটুকুর জন্যেই তোমাকে চাবুকে বের করে দেওয়া উচিত ক্যাম্প থেকে।"

মাথা নীচু করে বসেছিল সে উবু হ'য়ে ওর চেয়ার থেকে অনতিদূরে। একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে নীরবে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল।

আশ্চর্য! এই প্রেতযোনিসম্ভূত চরিত্রহীন যক্ষারোগীটাকে কী করে সহ্য করে কুসুমের মত মেয়ে! ভেবে বিস্ময় লাগে। কুসুমও এমন কিছু সুন্দরী নয়—কিন্তু অপূর্ব স্বাস্থ্যবতী। ছেলেবেলা থেকে তার ব্যায়ামপুষ্ট শরীরটা একটা বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। বয়সের অঙ্কে তার হয়তো অতিক্রান্ত যৌবন, কিন্তু শরীরে কোথাও ছাপ পড়েনি একতিল। পড়লে আজ হয়তো তার এ দুর্দশা হ'ত না। সাধুচরণের লোলুপ দৃষ্টি থেকেও হয়তো সে আত্মরক্ষা করতে পারতো। আর ছিল তার চুল। কোমর ছাড়িয়ে নিতম্বের ওপর পড়তো খুলে দিলে। ঘনকৃষ্ণ কেশদাম যেন একটা চালচিত্র রচনা করত। আশ্চর্য! অথচ এই চুলই একদিন কেটে ফেলেছিল সে নিজের হাতে। সেই অনুশোচনাতেই বোধহয় বেশী যত্ন নিয়েছে চুলের পরবর্তী জীবনে। কতবার অসময়ে বাড়ি ফিরে ঋতব্রত দেখেছে ভিতরের বারান্দায় একটা আরশি আর চিরুনি নিয়ে সে বসেছে চুল আঁচড়াতে। ওকে দেখে দ্রুতপদে উঠে গেছে রান্নাঘরে। এই সব অসংলগ্ন মুহূর্তেই কুসুমের ঘনকৃষ্ণ কবরী নজরে পড়েছে ঋতব্রতের। না হ'লে সামনে সে সর্বদা মাথায় ঘোমটা তুলে থাকতো।

"স্যার ?"

"হ্যাঁ, বলো।"

"তা হ'লে ?"

"বল্লাম তো। তাছাড়া তুমি চাইলেও কুসুম তোমার সঙ্গে যেতে রাজী হবে না।"

"হবে স্যার। সে মত দিয়েছে। ডাকব তাকে ?"

"না সে মত দেয়নি। দিতে পারে না। দেওয়া অন্যায়। ডাকতে হ'বে না তাকে।"

ঘরে ক্ষণিক নীরবতা। হঠাৎ নড়ে উঠল ভিতরে ঝাঁপের দরজাটা।

দুজনেই চোখ তুলে দেখল সাদা থানের প্রান্তভাগ দেখা যাচ্ছে দ্বারের পার্শ্বে। সমস্ত আলোচনাটাই তাহ'লে তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হ'য়েছে।

"ভেতরে এস কুসুম। বলো সাহেবকে যদি কিছু বলতে চাও।" বল্লে তারাপদ।

কুসুম তখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

ঋতব্রত জোর দিয়ে বল্লে, "তুমি ভুল করছ তারাপদ। তুমি যে রাস্তা দেখাচ্ছ ওকে তাতে ওর সমূহ সর্বনাশ। অবশ্য সর্বনাশের বাকিও রাখনি কিছু তুমি। তুমি যাও। ওকে অবলা-আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো। ভদ্রভাবে, যতদূর সম্ভব এ অবস্থায়, জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করব আমি।"

আবার চুপচাপ।

ধীরে ধীরে ঘরে এসে দাঁড়াল কুসুম। মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টেনে দিয়ে বল্লে, "আমি ওঁর সঙ্গেই যাবো। আপনি শুধু ব্যবস্থা করে দিন।"

নতনেত্রে বল্লে কথাক'টা। তারপর আনতনয়নেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঋতব্রত উঠল চেয়ার ছেড়ে। পায়চারি করতে লাগল চেয়ারের পিছনে। খানিকপরে থেমে বল্লে, "বেশ, তবে তুমি ব্যবস্থা করে এসে নিয়ে যেও।"

তারাপদকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই বেরিয়ে গেল সে। পথে বেরিয়েই খেয়াল হ'ল ছাটটা নিতে ভুলেছে। প্রখর হ'য়ে উঠেছে তখন রৌদ্রতাপ। ফিরে এসে টেবিল থেকে তুলে নিল ছাটটা। ওকে ফিরতে দেখে তারাপদ উঠে দাঁড়াল, বল্লে, "বিশ্বাস করুন স্যর, কুসুমের সর্বনাশ আমি করিনি। তার সঙ্গে কোনও অবৈধ সম্পর্ক নেই আমার। ঈশ্বরের দিব্যি!"

কোনও জবাব না দিয়ে শ্বতব্রত আবার পথে নামল।

প্রস্তাবটা শুনে বিরক্ত হ'লেন দফাদার। বল্লেন, "এটা কি রকম হ'ল মিস্টার বোস? অবলা-আশ্রমের সেক্রেটারি রাজী হ'য়েছে ওকে নিয়ে যেতে। আমিও সব রকম ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি। এখন তো আর রদ হ'তে পারে না। আর তা ছাড়া ওকে রেখেই বা আপনার লাভ কি?"

"কুসুম যেতে চায় না।"

"না চাইলেও আপনার বোঝা উচিত যাওয়াটাই ওর পক্ষে মঙ্গল। ক্যাম্পের ভেতর ওকে আর রাখা চলে না। ক্যাম্প হ'লেও এখানে একটা সমাজ আছে। সেখানে সে ক্ষমা পাবে না। এসব বিষয়ে আলোচনা কত মুখরোচক তা তো বোঝেনই—বিশেষ যারা নিষ্কর্মা বসে ডোল খায়। তারাপদ হতভাগা আর ক্যাম্পে আসে না। সময়েই স'রে পড়েছে সে।"

"না তারাপদ এ জন্যে দায়ী নয়!"

"তারাপদ নয়? আপনি কি করে জানলেন?"

শ্বতব্রত চুপ করে যায়।

"আপনি যে মশাই আরও ঘুলিয়ে দিলেন ব্যাপারটা! আপনি কিছু জানেন?"

"না; তবে তারাপদ নয়, এটুকু জেনেছি।"

"আই সী!" জ্রকুঞ্চিত ক'রে চুপ করে যান দফাদার।

"যাই হোক। ও নোংরা ব্যাপারে আমাদের যাবার দরকার কি? কিন্তু ক্যাম্প-সুপার হিসেবে ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমি কর্তব্য মনে করি। ওকে কেন্দ্র ক'রে এখানে একটা অসন্তোষ অথবা কেলেঙ্কারি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।"

"সরিয়ে অবশ্য আমিও দিতে চাই। তবে অবলা-আশ্রমটা আপনি বাতিল করে দিন।"

"আপনি সরিয়ে দেবেন? কোথায় পাঠাবেন ওকে?"

"ওর একজন আত্মীয়ের কাছে কলকাতায়।"

দফাদার তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন ঋতব্রতের দিকে। ভাবছিলেন তিনি অন্যমনস্কভাবে—এ ছোকরাকে তো সে রকম মনে হয়নি প্রথমে! প্রসঙ্গটা এখানেই চেপে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হ'ল তাঁর। আবার তাকালেন তিনি ঋতব্রতের দিকে। নাঃ! প্রাচীন অভিজ্ঞ অফিসার হিসাবে এই নাবালকটিকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দেওয়াটা অধর্ম হ'বে।

"একটা কথা বলব ঋতব্রতবাবু, কিছু মনে করবেন না?"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল ঋতব্রত।

"আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক অনেক বড়। আজ বাদে কাল রিটায়ার করব আমি। সংসারে অনেক কিছু আমি দেখেছি যা দেখবার আপনার সুযোগ হয়নি। সেই দাবিতেই বলতে চাই কয়েকটা কথা—"

"বলুন। আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের মতই দেখেছি এখানে এসে পর্যন্ত।"

"দেখুন, আপনার বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে। আপনি এ বিষয়ে কতদূর অবহিত, আমার জানা নেই। এর সঙ্গে আপনার অফিসিয়াল পোজিসন কতখানি জড়িত, তাও আমার অজানা। সে-কথা আলোচনা করাও আমার পক্ষে অন্যায়। চাকরিজীবিদের একটা 'মটো'র কথা হয়তো আপনি শুনে থাকবেন: "য়ু শুড নট ওনলি বি অনেস্ট বাট্ শুড প্রিটেণ্ড টু বি দি সেম।" আপনার বিরুদ্ধে কতগুলি দরখাস্ত উপরে গিয়েছে জানেন? জানেন না।

আপনার ডিপার্টমেন্টে ক'খানা পড়েছে আমার জানার কথা নয়। যদিও আন্দাজ করি সেখানেও যাচ্ছে ওগুলো। তা না হ'লে আপনার দত্তসাহেব সোজা এসে এল/২৯ ব্যারাকের নাম করতেন না—"

"আমি অবশ্য এতকথা কিছুই জানতাম না। তবে সন্দেহ হ'য়েছিল আমারও।"

"আমার কথা এখনও শেষ হয়নি ঋতব্রতবাবু। আমি তো বলেছি, আপনার ডিপার্টমেন্টে কি দরখাস্ত যায় তা আমি জানি না, জানা সম্ভবও নয়, কিন্তু আমাদের হেড অফিসে আপনার নামে যে-ক'খানা দরখাস্ত গেছে, প্রত্যেকটিই দেখেছি আমি।"

"কি কি অভিযোগ এসেছে আমার নামে ?"

এতক্ষণে হা হা করে হেসে ওঠেন মিস্টার দফাদার।

"এটা যে আমার ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল সিক্রেট!"

অপ্রস্তুত হ'ল ঋতব্রত। কথাটা আগে খেয়াল হয়নি তার।

"তাই বলছিলাম কুসুমকে আটকে রাখা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হ'বে না। এমনিতেই এল/২৯ ব্যারাকে নিজের পয়সায় একখানা পার্টিশন তুলে দেওয়ায় আপনার নামে যথেষ্ট মুখরোচক কাহিনী তৈরি হ'য়ে গেছে।"

"কিন্তু আপনি তো জানেন না—এল/২৯ ব্যারাকে—"

"আবার ভুল করছেন ঋতব্রতবাবু। আমি সব জানি। কিন্তু ঐ; শুধু সাধু হ'লেই চলবে না, আপনি যে সাধু এটার প্রচার চাই। এ বড় বিচিত্র জায়গা। তিল অনায়াস গালগল্পে তালে পরিণত হয় এখানে। শুনবেন ? সেদিন লেডি সুপারের ফেয়ারওয়েলে আপনি কয়েকটা ফটো তোলেন মনে আছে ? সেটাকে বলা হ'য়েছে,—"

গট গট ক'রে ভেতরে চলে যান দফাদার। একখণ্ড কাগজ নিয়ে এসে পড়ে শোনালেন মাঝখান থেকে—"ক্যামেরা হস্তে যিনি দিবারাত্র ক্যাম্পের ষোড়শী এবং যুবতী মেয়েদের ফটো তুলিয়া বেড়ান তাঁহার পক্ষে এই প্রকার

গর্হিত কার্য অস্বাভাবিক নহে। হ্যাঁ, ইনি পরিদর্শক বটে ;—সমস্ত ক্যাম্পটি-কেই চুটাইয়া পরিদর্শন করিতেছেন, স্নানরতা যুবতীর ফটো তোলা তো সামান্য কথা—দিবারাত্র যখন তখন যে কোন ঘরে ঢুকিয়া নারীর রূপ সন্দর্শন করাই নাকি ইঁহার একমাত্র কার্য। কোনও একটি যুবতী ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতেছে জানিয়াও ইঁহাকে বিনা সংবাদে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াছে, এমন প্রত্যক্ষদর্শীর সংবাদ আমরা রাখি। বাস্তু হারাইয়াছি বলিয়া কি আমরা শালীনতাবোধও হারাইয়াছি ?"

কাগজখানা ভাঁজ ক'রে পকেটে রেখে দফাদার একটা সিগারেট ধরালেন। দুজনেই নীরব। ঋতব্রতই প্রথমে কথা বল্লে,

"না, কুসুমকে পাঠানোতে আমার আপত্তির অন্য কোনও কারণ নেই। আচ্ছা তবে খুলেই বলি আপনাকে—"

"থাকনা !" বাধা দিলেন দফাদার "আমার তরফের যেমন অফিসিয়াল সিক্রেট আপনাকে জানালাম না—তেমনি আপনারও যদি কোন বাধা থাকে, তবে থাক না। আমি শুধু বলছিলাম কাজটা করার আগে ভেবে দেখুন দুদিন। তার পরেও যদি ওকে রাখতে চান, সে দেখা যাবে তখন।"

"আচ্ছা বেশ, তবে তাই হোক। আজ উঠি।"

পায়ে পায়ে ঋতব্রত নিজের ব্যারাকের দিকে এগিয়ে চলে। কিউ. সি. আই. ব্যারাকের চালটা ছাওয়া হচ্ছে। উপরে উঠে পাঁচ ছয় জন লোক খড়ের আঁটি গুঁজে দিচ্ছে বাতার সঙ্গে। নীচে থেকে জন দুই লোক ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে পোয়ালগুছি। স্তূপাকার করা আছে খড়ের আঁটি। এন/৩ বিল্ডিংটার চাল নামানো হয়েছে। এটায় রানীগঞ্জ টালি বসবে। একটা লোক বসে বসে পুরানো টালি থেকে সিমেন্টের চটা ছাড়াচ্ছে। ছুতার মিস্ত্রি রাফ্টারের ওপর পার্লিনগুলো আঁটছে স্ক্রু ক'রে। ঋতব্রতের নজরে পড়ল পার্লিন-গুলোতে রঙ করা নেই। রাফ্টারেও রঙ করা হয়নি। অথচ তার বার বার

ক'রে বলা ছিল প্রাইম কোট রঙ না দিয়ে কোনও ট্রাম-মেম্বার ওঠাতে পারবে না। ওয়ার্ক-সরকার গদাধর ছাতি মাথায় দিয়ে কাজ তদারক করছে। শতব্রতের মনে পড়ল এই গদাধরকেই সপ্তাহ খানেক আগে ও বুঝিয়েছিল কেন রঙ না দিয়ে কাঠ চাপাতে বারণ করেছে সে। বুঝিয়েছে যে আগে রঙ করা না থাকলে রাফ্টারের উপর পার্লিন যেখানটায় বসে সেই সঙ্গমস্থলটি আর কিছুতেই রঙ করা যায় না পরে। দুদিন আগে হ'লে সে ছুটে গিয়ে পড়তো ওখানে। কৈফিয়ৎ তলব করত ওয়ার্ক-সরকারের। বাধ্য করতো ঠিকাদারকে সব কটি পার্লিন খুলিয়ে, রঙ করিয়ে ফের লাগাতে। কিন্তু আজ আর তার কোনও উৎসাহই নেই। দেখেও মুখ ঘুরিয়ে সে চলে গেল। ক্যাম্পের দৈনন্দিন জীবন চলেছে একই ভাবে। সিংজীর ট্রাকখানা চলে গেল পাশ দিয়ে। করোগেটেড টিন আসছে কলকাতা থেকে সোজা ট্রাকে। হাত তুলে ইয়াসিন নমস্কার করল তাকে। ইয়াসিন রামশরণের ড্রাইভার। স্টেশন থেকে ইয়াসিনই ওকে নিয়ে এসেছিল প্রথমদিন ক্যাম্পে, রামশরণের জীপ চালিয়ে। রাস্তার পাশে টিউবওয়েলে স্নান করছে কয়েকটি মেয়ে। বালতি, ঘড়া, হাতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। এক নজর দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল শতব্রত। স্নানরতা যুবতীর কানে পার্শ্ববর্তী একজন কি একটা বলল। কলকণ্ঠে হেসে উঠল সবাই নিজেদের মধ্যে। দ্রুতপদে পার হ'য়ে গেল সে এই এলাকাটা। পীচের রাস্তার উপর শুল, ঘুঁটে, ধান বিছিয়ে শুকোতে দিয়েছে ওরা। ঠিক রাস্তার মাঝবরাবর; যাতে দুদিকে গাড়ির চাকা দুটো চলে যেতে পারে। এর পরেই রাস্তার বাঁ হাতী কয়েকটা পাবলিক ল্যাট্রিন। এ্যাসবেসটস শীটের ছোট ছোট শেড। পাশাপাশি আট দশটা। সামনের একটার চটের পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল একজন মেয়ে। ওকে দেখে এ্যাবাউট টার্ন করল। এক হাতে মগ অপর হাতে মাটি। ঘোমটা টানার উপায় নেই। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাই এসব ক্ষেত্রে এদের লজ্জা প্রকাশের প্রকৃষ্টতম-পন্থা। এ এলাকাটাও শতব্রত দ্রুতপদে পার হ'ল।

দুপাশে দুঃস্থ নরনারীর সংসার যাত্রা নির্বাহের সাধারণ দৃশ্য। দেওয়ালময় ঘুঁটে। টিনের চালে উঠিয়ে দিয়েছে লাউ-কুমড়ার ডগা। কাঁথা, কাপড়, বড়ি শুকোচ্ছে রোদ্দুরে। তেল মাখিয়ে পিঁড়ি পেতে শুইয়ে দিয়েছে সদ্যোজাত শিশুকে বারান্দায়। দড়ির উপর একটা কাপড় টাঙিয়ে রৌদ্র থেকে মাথাটা বাঁচিয়ে রেখেছে। পিট পিট করে দেখছে নবাগত অতিথিটি আজব দুনিয়াকে। এদের দেখলে মনে হয় না এগুলো এদের ঘর নয়, এরা এখানেই মানুষ হয়নি; —এরা এখানে প্রবাসী। বরং মনে হয় এরা যেন এখানে, এমনিভাবে আবহমান কাল ধরে বসবাস ক'রে আসছে। কংক্রিটের চওড়া ক্রীট-ওয়েটার উপর খাপরা দিয়ে ঘর কেটে কি একটা খেলা খেলছে অর্ধ উলঙ্গ শিশুর দল। কে জানে ওদের খেলায় আইন কেমনতর! একটা বাচ্চা মেয়ে চোখ বুজে একটা একটা ক'রে ঘর এগুচ্ছে আর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করছে—'আউট?' তার সঙ্গীরা বলছে 'নট!' আউট-নট, আউট-নট করে খেলা এগিয়ে চলেছে। ম্লান হাসি হাসলে ঋতব্রত। ওর মনে হ'ল ঐ চক্ষুষ্মান মেয়েটির বাধ্যতামূলক অন্ধপদক্ষেপের আর্ত-জিজ্ঞাসায় যেন গভীরতর কোন করুণ রাগিনীর মূর্ছনা আছে। পদস্খলন ওর অনিবার্য নিয়তি। দাগের বাইরে পা পড়লেই সঙ্গীরা হৈ-হৈ করে উল্লাস প্রকাশ করবে "আউট! আউট! আউট!"

ওপাশে এল/২৯ ব্যারাকে একজন কাকে উদ্দেশ্য করে যেন চোখা চোখা গাল পাড়ছে। অশ্রাব্যতম ভাষা তার। সেখানে জটলা পাকিয়েছে মেয়ে-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। অশ্লীল ভাষাটায় প্রতিবাদ নেই কারও। বস্তিজীবন সম্বন্ধে ঋতব্রতের অভিজ্ঞতা নেই। উপন্যাসলব্ধ জ্ঞানমাত্র। কিন্তু এরা তো বস্তিবাসী নয়। এদের মধ্যে আছে ভদ্র, শিক্ষিত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। ওরা বিড়ি পাকাতে পাকাতে গীতাপাঠ করে, অম্লানবদনে ল্যাটিন উদ্ধৃতি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। এদের পক্ষে বস্তিবাসীর নিম্ন অশিক্ষিত রুচি তো স্বাভাবিক নয়। দুদিন আগেও ছিল এরা সমাজবদ্ধ জীব। পূজা-অর্চনা করতো, সত্যনারায়ণ, কথকতা, পাঁচালী

গান শুনতো। ছেলেদের পড়াতো পাঠশালে। ক্ষেতে-খামারে, কোর্টে-কাছারিতে নিজের নিজের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতো। ঐশ্বর্য হয়তো ছিল না, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। স্বাচ্ছন্দ্যও হয়তো সব ঘরে ছিল না—ওপারেও হয়তো ছিল অভাব-অনটনের সংসার। তবু সংযম-শালীনতাবোধ ছিল। অন্তত পাকা-সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে অশ্লীল গালাগাল উপভোগ করবার মত রুচি ছিল না মেয়ে পুরুষে মিলে। কেন এমন হয়? মনে আছে এই নিয়ে তর্ক করেছিল একদিন দফাদারের সঙ্গে।

দফাদার বলেছিলেন, "কোনও 'গেইনফুল অকুপেশনে' ওদের রাজী করাতে পারবেন না মশাই।"

ঋতব্রত সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। খুঁজে খুঁজে সে আবিষ্কার করেছিল তিনচার ঘর লোককে। নিজের গ্রামে তারা ঘরামির কাজ করতো। বেতের কাজ, বাঁশের কাজ করতে জানে, জানে চাল ছাইতে। ওদের কিন্তু কিছু-তেই রাজী করাতে পারেনি। রামশরণ অবশ্য ফুরনে খাটায় তার ঘরামিদের। কিন্তু তাদের ডেলি রেট দাঁড়ায় সওয়া তিনটাকার মত। ঋতব্রত পাঁচটাকা পর্যন্ত দর দিয়েছিল। ডেলিরেটে কাজ করাবে সে। রাজী হয়নি। সাড়ে পাঁচ? ছয়? সাড়ে ছয়? রোখ চেপে গিয়েছিল ঋতব্রতের। দৈনিক মজুরি মিটিয়ে দেয় যদি? শেষে ছ'টাকা বারো আনায় দুজন মাত্র রাজী হ'ল। বিজয়ীর হাসি হেসে ঋতব্রত ফিরেছিল অফিসে। সে হাসি কিন্তু ফুরিয়ে ছিল রাত পোহালেই। কেউ কাজে আসেনি। কৌতূহল হ'য়েছিল ওর। কেমন যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছিল সে। বিশ্বাস হয়নি নগদ টাকার লোভেও এই লোকগুলো কর্মবিমুখ হয়ে থাকবে। পরদিন সকালেই সে আবার গেল সেই দু'জনের খোঁজে। একজন বাসায় ছিল না। অপর জন বসে বসে গল্প করছিল। ওকে দেখে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে গেল। ঋতব্রত কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত দেখতেই হ'বে। ডেকে পাঠাল তাকে। লোকটা এসে বল্লে, "জ্বর হ'য়েছে স্যার। আজ যেতে পারব না।"

নতশিরে ফিরে এসেছিল ঋতব্রত। ঘটনাটা অকপটে জানিয়েছিল দফাদারকে। শুনে হা হা করে হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, "আরে মশাই ছ'টাকা বারো আনা কেন—দশটাকা করে আগাম মজুরি মিটিয়ে দিলেও ওরা রাজী হ'বেনা।" বিশ্বাস হয়নি ঋতব্রতের; কিন্তু প্রতিবাদও করেনি। কারণ যেটুকুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে পেয়েছে সেটাই যে অবিশ্বাস্য!

"বুঝছেন না আপনি যতটাকাই দিন না—আপনি তো দেবেন তিন চার মাস। তারপর?"

"তারপর? তারপর কি?"

"তারপর তো আর তাকে পি. এল. রাখব না আমি। রোজগার করবার ক্ষমতা আছে প্রমাণিত হ'য়ে গেলে স্থায়ী পোষ্য হ'বে কি ক'রে? ডোলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা কেউ অত সহজে খোয়াতে চায়? পাঁচ-সাত বছরেই আমরা এদের ক'রে তুলেছি এক সৃষ্টিছাড়া জীব! পৃথিবীর ইতিহাসে জানি না এমন শ্রেণীর জীব কোনও যুগে কখনও ছিল কিনা। দে আর এ ক্লাস অফ্ পারপেচুয়াল প্রফেসনাল লিগালাইজড বেগারস্!"

কথাটা আজও বাজে ওর কানে। ওরা নাকি আইনসঙ্গত চিরস্থায়ী এক শ্রেণীর ভিক্ষাজীবি প্রাণী! অসহ্য!

"তোমাকে একটা কথা বলছিলাম বাবা।· শুনছ!"

ঘুরে দাঁড়ালো ঋতব্রত। এতক্ষণে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁচেছে সে। সেই প্রৌঢ়া বিধবা ভদ্রমহিলাটি। কমলার মা।

"বলুন।" বিরক্তভাবে তাকালো সে।

"বলছিলাম কি···ইয়ে···শুনলাম দরমার বেড়াটা আপনি নিজের খরচে করে দিচ্ছেন। দেখুন এ নিয়ে নানান কথা···মানে, তাছাড়া আপনিই বা কেন···অর্থাৎ—"

"প্রয়োজন হলে খুলে টান মেরে ফেলে দেবেন ওটা।"

সশব্দে ঝাঁপের দরজাটা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল সে। অসহ্য! এরা কি তাকে এক মুহূর্তও স্থির হ'তে দেবে না?

ঋতব্রত জানতেও পারল না বাইরে দাঁড়িয়ে নতমুখী একটি মহিলার সমস্ত মুখ অপমানে, লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছে।

মেজদা আবার তাগাদা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। জবাব দিতে হ'বে একটা। ছুটির দরখাস্ত আগেই করেছে। ক্যাজুয়াল লীভ সে পাবেই। টাকাটার কথা কিন্তু সে ভেবে কোনও কূলকিনারা করতে পারেনি। মেজদা অবশ্য এবারের চিঠিতে লিখেছেন হাজার খানেক টাকা অফিস থেকে ধার পেয়েছেন। বাকি একহাজার টাকা তিনি আশা করেছেন ধার হিসেবে ঋতব্রতের কাছে। প্রথম মাসের মাহিনা এখনও এসে পৌঁছয়নি। এ মাসেই ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে সবে চাকরিতে ঢুকেছে ঋতব্রত। শীঘ্রই শ'তিনেক টাকা পাবে সে মাহিনা। তাও যদি এ. জি. বি. স্লিপ এসে পৌঁছয়। ট্রেনিং পিরিয়ডে শ' আড়াই টাকা জমেছে তার পোস্ট অফিসে। হাজার টাকা রাতারাতি সে কোথায় যোগাড় করবে? ভরসার মধ্যে আছে একটা ইন্‌সিওরেন্স পলিসি। বছর দুই চলছে সেটা। শুনেছে পলিসি বন্ধক দিয়ে কোম্পানি থেকে টাকা ধার নেওয়া যায়; কিন্তু ওর পলিসির এখন শৈশবাবস্থা। এ অবস্থায় কি ধার দেবে কোম্পানি? কি জানি? অভিজ্ঞ একটা লোকও নেই যার কাছ থেকে একটা পরামর্শ নেওয়া চলে।

"স্যার, ঠিকাদার সাহেব একবার দেখা করতে চায়।"

"কে রামশরণ? আসতে বল।"

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে রামশরণ সিং এসে প্রবেশ করল।

"কি খবর সিংজী?"

"হামার ইনডেন্টটা স্যর? আজ সাতদিন হইয়ে গেল সতীশবাবু ওটা পাস করাচ্ছেন না। হমার লরি আজ বসিয়ে গেল।"

"সতীশ ?"

ও পাশের টেবিল থেকে সব-ডিভিশনাল ক্লার্ক সতীশ উঠে আসে।

"ইন্‌ডেন্টটা তৈরি হ'য়ে আছে স্যার—উনিই হ্যাণ্ড-রিসিটে সই করছেন না ?"

"হেণ্ড-রিসিট তো কালিবাবুকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে পারেন সতীশবাবু।"

"কালিবাবু কেন রাম, শ্যাম, যদু, মধু যে কোনও বাবু সই করলেই চলতে পারে ; কিন্তু যাকে সই করতে পাঠাবেন তার নামে একটা অথরাইজেসন লেটার থাকবে তো ?"—জবাব দেয় সতীশ।

"ব্যাপারটা কি ?" প্রশ্ন করে ঋতব্রত।

"ব্যাপার কিছুই নয়। আচ্ছা আমি বুঝিয়ে বলছি। কনট্রাক্ট অনুযায়ী আমরা ওঁকে চব্বিশ গেজি টিন সরবরাহ করব এখানে অর্থাৎ সাইটে। বিল থেকে প্রতি হন্দরে সাতাশ টাকা করে রিকভারি হবে। এ ভাবেই চলছিল। একবার ওয়াগন আসতে দেরি হওয়ায় উনি ঘোষাল সাহেবের আমলে দরখাস্ত করেন যেন মালটা ওঁকে কলকাতাতেই ডেলিভারি দেওয়া হয়। উনি নিজ ব্যয়ে ওটা সাইটে আনেন নিজ লরিতে।"

ঋতব্রত জিজ্ঞাসা করলে সিংজীকে, "তাই নাকি ? এতে আপনার লাভ ?"

"হ্যাঁ স্যার! লাভ কুছু নাই আছে। লেকিন ওয়াগনে মাল আসতে দুতিন মাস কোরে দেরি হোবে আর হমার মিস্ত্রি বসে থাকবে ই কেমন কোরে চ'লে ? ফিন কাজ যেতোদিন দেরি হোবে, হমার এসট্যাবলিস্‌মেণ্ট ভি বাড়তে চলবে।"

এই জন্যেই এ পরিশ্রমটুকু স্বীকার করে নিয়েছে রামশরণ। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চায় সে। ঠিকাদার রিকুইজিশন দেয়, ওভারসিয়ার রেকমেণ্ড করে। তখন ঠিকাদারের কাছে হ্যাণ্ড-রিসিটে সই করিয়ে এস. ডি.

ও. একটা রিকুইজিশন দেয় কলকাতার স্টোরের উপর। সেখান থেকে সিংজীর লরিতে মাল আসে। লিস্ট মিলিয়ে সেটা ঠিকাদারের স্টোরে ওঠে। টিনের সংখ্যা সাইজ প্রভৃতি রোড-পারমিট মিলিয়ে দেখে নেয় স্টোরের ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ক-সরকার।

হ্যাণ্ড-রিসিটে সই করে ইনডেন্টটা নিলে রামশরণ। বল্লে, "রোড পারমিট দিলেন না সতীশবাবু?"

ঘরের ও প্রান্ত থেকে জবাব দিলে সতীশ, "ওর সঙ্গেই পিন দিয়ে গাঁথা আছে।"

আবার ব্যাগ খুলে কাগজগুলি দেখে মিলিয়ে নিয়ে উঠল রামশরণ।

"আচ্ছা রাম রাম স্যার।"

"আপনি কি এখনই কলকাতা যাচ্ছেন?"

"হাঁ, কেন?"

"তাহলে বসুন। একটা চিঠি দিয়ে দিই। খুব জরুরী। এটা পৌঁছে দিতে হবে।"

"হাঁ হাঁ জরুর।"

প্যাড বার করে চিঠি লিখতে বসল শতব্রত। একখানা নয়, দুখানা চিঠি লিখল সে। মেজদাকে লিখল শনিবার সন্ধ্যা বেলা পৌঁছবে। টাকার যোগাড় এখনও হয়নি। দ্বিতীয় চিঠিখানা সে লিখল এক বন্ধুর কাছে। যে বন্ধু মারফৎ জীবনবীমাটা করেছিল। তাকে খুলে লিখল হাজার খানেক টাকার বিশেষ প্রয়োজন তার। পলিসিটা বাঁধা রেখে টাকাটা ধার করা চলে কিনা এটাই তার জিজ্ঞাসা। খামদুটো বন্ধ করে উপরে ঠিকানা লিখে রাম-শরণের হাতে দিল। বল্লে আজই যেন পৌঁছয় এদুটি।

"বহুৎ খুব" বলে সসম্ভ্রমে চিঠি দুটো ব্যাগে পুরে রামশরণ রওনা দিল। তারপর জীপটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেই খামদুটি বার করে খুলে ফেল্লে রামশরণ।

রামশরণ যে চিঠিদুটি খুলে পড়েছিল এ কথা আমি, এ কাহিনীর লেখক আমি তা কি করে জানলাম এ প্রশ্নটা জাগা স্বাভাবিক। বলছি। মেজদার চিঠিখানা যে সে খুলেছিল তার প্রমাণ যথাস্থানে দেবো। বন্ধুর চিঠিখানা যে খুলে পড়েছিল তার প্রমাণ আমি নিজে। অফিসে বসে কাজ করছি। বেয়ারা এসে কার্ড দিল।

"আর. এস. সিং, কণ্ট্রাক্টর এ্যাণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।" বেহা-রার পিছন পিছন যে ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন তিনি আমার পূর্ব পরিচিত নন। হাতের ইঙ্গিতে বসতে বলে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালাম।

"হামি রিৎবাবুর কাছ থেকে আসছে।"

"রিৎবাবু? তিনি কে?"

"রিৎব্রৎবাবু!" ব্যাগ থেকে একখানি চিঠি বার করে দিলেন মাড়োয়ারী অথবা সিন্ধি ভদ্রলোক। খামটা উল্টে পাল্টে দেখলাম। হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত। কে এই রিৎব্রৎবাবু অথবা হৃদব্রৎবাবু? খামখানা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল ঋতব্রতের চিঠিখানা। ভাবলাম খামটা বন্ধ করে ঠিকানাটা বোধ হয় ডিক্‌টেট্‌ করেছিল কাউকে, হয়তো ক্লার্ককেই। অপর সম্ভাবনাটা মনে জাগেনি। সেটা বুঝি আজ, যখন পরে শুনলাম ঠিকানাটা ঋতব্রত নিজেই স্বহস্তে লিখেছিল। আমি তখন চিঠিটার মধ্যেই তন্ময় হয়ে গেছি। পড়ে বল্লাম, "আচ্ছা এর জবাব ডাকে দেবো আমি। আর কিছু কথা আছে?"

একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোক বল্লেন, "কি বলব রিৎব্রতবাবুকে? রূপেয়ার ইন্তাজাম হয়ে যাবে?"

দেখলাম ঋতব্রত চিঠির মর্ম জানিয়েছে পত্রবাহককে এবং জেনে আসতেও বলেছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা জরুরী। ভদ্রলোককে বসিয়ে আমি ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের ঘরে খবরটা জানতে গেলাম। ঘুরে এসে জবাবটা তখনই লিখে দিলাম ঋতব্রতকে। ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের ঘরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম

গত দুটো প্রিমিয়াম না পড়ায় তার পলিসিটা ল্যাপস্ হয়ে পড়ে আছে। কলেজ-হোস্টেল থেকে আনডেলিভার্ড হয়ে ফিরে এসেছে প্রিমিয়াম নোটিস। কোম্পানি ওকে দেশের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে তারপর। সেটা ফিরে আসেনি বটে, তবে জবাবও আসেনি। এক্ষেত্রে পলিসি নতুন করে চালু না হওয়া পর্যন্ত ঋণের প্রশ্নই ওঠে না। এই কথা কটা জানিয়ে বন্ধ খামটা ভদ্রলোকের হাতে দিলাম।

ভদ্রলোক শুধালেন, "রুপেয়ার কি হোবে স্যার ?"

"এখন হবে না।"

"দুচার রোজ বাদে ভি হোতে পারে না ?"

ভাবলাম টাকাটা এঁরই গর্ভে যাবে বোধ হয়, না হ'লে এঁর এত গরজ কেন ?

বল্লাম, "আমার যা লেখার চিঠিতেই লিখেছি।"

"বহুৎ খুব।" নমস্কার করে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন ভদ্রলোক।

মেজদাকে লেখা চিঠিখানাও যে রামশরণ খুলেছিল তার সাক্ষী ইয়াসিন।

"তুমি সত্যি কথা বলছ ?"

"হাঁ স্যর, মিথ্যা বলে আমার লাভ ?"

"লাভ আছে বইকি। রামশরণ তোমাকে অপমান করে, জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বলছ—রামশরণের নামে দুটো মিথ্যা কথা বল্লে আমি যদি তার উপর বেশী রাগ করি তাহ'লেই তোমার লাভ।"

"আমি যদি মুসলমানের বাচ্ছা হই, তবে যা বলছি সত্যি বলছি হুজুর। আপনি আপনার দাদাকে, আর সেই বীমাকোম্পানির অফিসে দু'খানা চিঠি খামবন্ধ ক'রে দিলেন ; গাড়ি ক্যাম্প এলাকা পার হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ওই হারামি সেই দুটো খামই খুলে পড়ল। ক'লকাতায় পৌঁছে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাকে পয়সা দিল। আমি খাম কিনে আনলাম। তার উপরে ঠিকানা লিখে আবার বন্ধ করে দিলে স্যর!"

"আচ্ছা তুমি যেতে পারো।"

অবশ্য ইয়াসিনের সঙ্গে ঋতব্রতের এ কথোপকথন হ'য়েছিল অনেক পরে। সে কথা যথাসময়ে বলব।

"সুচরিতাসু

কলকাতা থেকে আজই ফিরলাম। লীলার বিয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। তার বিয়ের খবর দিয়ে এবং আমার চারদিনের ছুটিতে কলকাতা যাবার খবর দিয়ে ইতিপূর্বে অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ তোমাকে যে চিঠি দিই তা নিশ্চয়ই তুমি পেয়েছ এতদিনে। আশা করছি, আর শুধু আশা করছি কেন নিশ্চিত জানি আমার চিঠি পাওয়ার আগেই তুমি রওনা হ'য়ে গিয়েছিলে। কিন্তু তুমি কলকাতা ত্যাগ করেছিলে ২৭শে। দুদিনেও কেন আমার চিঠিখানা পৌঁছলো না বুঝলাম না। চিঠি আমি নিজে হাতে ডাকবাক্সে দিয়েছি এবং তারিখটাও মনে আছে। কারণ ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে দিয়ে ফিরছি, দেখলাম মাইনর স্কুলের প্রাঙ্গণে একটা জনতা। ভাবলাম 'আমাদের দাবি মানতে হ'বে' জাতীয় মিটিং বুঝি। অন্যমনস্ক হ'য়ে চলে আসছিলাম। বক্তার কয়েকটা কথা কানে গেল, 'তিনি সুদূর চীন থেক্যা, জাপান থেক্যাও নানান সম্মান পাচ্ছিলেন।' কে এই ভাগ্যবান পুরুষ? তবে কি কোন শোক-সভা? একটু আগিয়ে যেতেই দেখলাম টেবিলের উপর একখানি ফটো। ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে মুখখানি। তবু সাদা ফুলের মধ্য থেকেও দেখা যাচ্ছে শুভ্রকেশ, সিত-শ্মশ্রু। প্রণাম করলাম কবিকে। এই কর্মহীন লোক-গুলি এটুকু আয়োজন না করলে আমার মত কর্মবীরের খেয়ালই ছিল না সেদিন পঁচিশে বৈশাখ। প্রতি বৎসর, গত বৎসরও এ দিনটা কী উন্মাদনার মধ্যেই কেটেছে। আর আজ?

যাই হোক। সুতরাং পঁচিশে বৈশাখ চিঠি ডাকে দেওয়া হ'য়েছে এতে কোনও সন্দেহ নেই—অথচ সাতাশের আগে সেটা নিশ্চয়ই কলকাতা

পৌঁছয় নি। কারণ, পেলে আমি কলকাতা যাচ্ছি জেনেও তুমি বান্ধবীর বিয়েতে মধুপুরে চলে যেতে না। এর আগের চিঠিতে লিখেছিলাম, বাড়িতে মধুপুর যাচ্ছি বলে আমার এখানে চলে এস। তোমাদের বাড়ি গিয়ে যখন শুনলাম মাসীমার কাছে, যে তুমি বান্ধবীর বিয়েতে মধুপুর চলে গেছ, তখন ছাঁৎ ক'রে উঠল মনের মধ্যে। ভাবলাম বকুলতলা ক্যাম্পে সত্যিই যাওনি তো? অসম্ভব মনে হ'লেও তোমাদের মত দুঃসাহসিকাদের পক্ষে সবই স্বাভাবিক! তাই যে ক'দিন কলকাতায় ছিলাম ঘুরে ফিরে ঐ কথাই মনে হ'ত। ভাবতাম, না, তাহ'লে তো ক্যাম্প থেকে পরদিনই ফিরে যেতে তুমি।

অভিযাত্রিক অফিসে গিয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল ঘোষের সাক্ষাত পাওয়া গেল না। শুনলাম কয়েকদিন ধরে তিনি আসছেন না। কুসুমের গল্পটা এ সংখ্যায় প্রকাশ করছ দেখলাম। আমি গ্যালি প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে এসেছি। বাকি গল্পটা এই সঙ্গে পাঠালাম।

হ্যাঁ কোথায় যেন শেষ করেছিলাম? ও এবারও তো সেই "বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তানী বিললাপ বিকীর্ণ মূর্ধজা" অবস্থায়।

দিন কেটে যায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে। দাঙ্গার দিনগুলো কেটে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসে গ্রামবাসী। তবু দু'পাড়ায় সেই আগে-কার দিনগুলো যেন আর সত্যিই ফিরে এল না! অত সহজে কি ভোলা যায়? যায় হয়তো, কিন্তু যাতে ভোলা না যায়—একদল লোক সেই প্রচেষ্টাই ক'রে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু ওদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখতে বসিনি আমি। আমার কাহিনী একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সে কথাই বলি। পণ্ডিতমশাই অল্পদিন পরেই শয্যা নিলেন। মাস দুই তিন রোগ-ভোগের পর সংসারের ভাবনা ভাবার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন তিনি। পণ্ডিতের বিধবা দুই অনূঢ়া কন্যা নিয়ে পড়লেন অগাধ জলে। পণ্ডিতের ব্রহ্মোত্তর ভূ-সম্পত্তি ছিল পিতৃপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

তারই আদায়ে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চলতো। সমাজে ওঁরা ছিলেন পতিত। দুই নাবালিকা নিয়ে বিপদগ্রস্ত হ'লেন বিধবা। পণ্ডিতের মৃত্যুসময়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপদ এসেছিল দেখাশুনা করতে। এ অবস্থায় এ পরিবার ছেড়ে তার চলে যাওয়া সম্ভব হ'ল না অচিরে। বিধবার ভাই লিখলেন সপরিবারে তাঁর সংসারে চলে যেতে, কিন্তু কুসুমের মা তাতে রাজী হ'লেন না। প্রথমত তা হ'লে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির আদায়পত্র যাবে সম্পূর্ণ বন্ধ হ'য়ে, আর দ্বিতীয়ত ভ্রাতৃবধূকে তিনি চিনেছিলেন ভালো রকমই। খররসনা সেই রমণীটির সম্মুখে কলঙ্কিনী অরক্ষণীয়া অষ্টাদশী কন্যা নিয়ে উঠতে কিছুতেই তিনি রাজী হলেন না। অগত্যা তারাপদই থেকে গেল এ সংসারে। ভ্রাতৃবধূর তাতে আপত্তি নেই। আদায়পত্র ক'রে যদি থাকতে পারে থাকুন না।

গেল কেটে আরও বছর তিনেক। কুসুম একেবারে বাড়ি থেকে বার হয় না। সাত আট বছর পরেও কোনসূত্রে সেই একদিনের কলঙ্কের কথা কোথায় উঠে পড়ে! বাড়ির পিছনের ছোট ডোবাটায় স্নান করতে যাওয়া ছাড়া বাড়ির চৌকাঠ পার হ'ত না সে। বাইরের যা কিছু কাজ করতেন বিধবা নিজে অথবা তারাপদ। কামিনী শুধু ধলেশ্বরী থেকে জল নিয়ে আসতে যেত। কুসুমের গোটা ইতিহাসটা একমাত্র কুসুমই জানে। বাড়ি থেকে ডাকাতেরা তাকে ধরে নিয়ে যাবার পর তাকে উদ্ধার করবার পূর্ব পর্যন্ত কি ঘটেছিল কিছুই সে বলেনি কাউকে। ফণী দারোগার কাছেও সে বার বার মাথা নেড়ে অস্বীকার করেছিল। সে কাউকে চিনতে পারে নি। তাকে অপহরণের সময় সে নাকি চীৎকার ক'রে ওঠে। তখন ডাকাতদলের মধ্যে একজন তার মাথায় আঘাত ক'রে এবং ফলে সে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। জ্ঞান হ'লে দেখে পুলিসে তাকে ঘিরে আছে। তার কথা বিশ্বাস করলে মেনে নিতে হয় পুরো আঠারো ঘন্টা সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। না, শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন সে দেখে নি। ফণী দারোগা ডাক্তার দিয়ে তাকে পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর দুটি হাত ধরে পণ্ডিত বলেছিলেন, "যা হ'য়ে

গেছে তারপর আর টানা হেঁচড়া করবেন না দারোগা বাবু। মা তো বলছেন তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।"

যারা নির্যাতিত তারা কেস চালাতে চায় না। বড় দারোগা কাশেম আলিও কেসটা চেপে যেতে পারলেই বাঁচেন। অগত্যা নিবৃত্ত হ'তে হ'ল ফণী দারোগাকেও।

অথচ অনেকেরই বিশ্বাস পুরো আঠারো ঘণ্টা সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল না। তবে সে স্বীকার করল না কেন? কেন করবে? নিজের কলঙ্কের কাহিনী নিজমুখে স্বীকার করা কি এতই সোজা? কামিনীও মাঝে মাঝে আড়ালে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছে—কিন্তু লজ্জায় পারে নি। ছি ছি, কি ভাববে মেজদি! কুসুম নিজে থেকেই বরং কখনও বলেছে কামিনীকে, "অজ্ঞান যদি না হ'য়ে পড়তাম, তবে নিশ্চয়ই চিনতে পারতাম ওদের! গাঁয়ের কেন—ভিন-গাঁয়ের অনেক ছেলেকেই তো আমি চিনি। ওরা প্রায় সবাই আমার ছেলে-বেলার বন্ধু।" বন্ধু! কথাটা উচ্চারণ ক'রে হাসে সে। কামিনী হঠাৎ ইচ্ছা করেই অন্য কথা পাড়ে, "আমার টেবিলক্লথটায় সুতো তুলে দিবি মেজদি?"

"দে।" হাত বাড়ায় কুসুম।

আবার একটা বজ্রপাত হ'ল এ সংসারে।

একদিন সন্ধ্যায় ধলেশ্বরীতে জল আনতে গিয়ে কামিনী আর ফিরল না। পরদিন তার লাস পাওয়া গেল ইসলামপুরের ঘাটে। কামিনী সাঁতার জানতো না। আগেই বলেছি পণ্ডিতমশায়ের সংসারে এই মেয়েটিকে দৃঢ়-শাসনে বেঁধে রাখা হ'য়েছিল। তাই নদীমাতৃক দেশ ধলেশ্বরী-বিধৌত লক্ষ্মীপুর গ্রামে সেই ছিল বোধ হয় একমাত্র নারী যে সাঁতার জানতো না। এটাকে সবাই আকস্মিক দুর্ঘটনা বলেই মেনে নিল। কিন্তু সেটা যে দুর্ঘটনা নয়, কুসুম তা জানতে পেরেছিল অনেকদিন পরে। সে কথা যথা সময়ে বলা যাবে।

বাড়িতে আবার পড়ে একটা শোকের ছায়া। কি জানি নিভৃতে বিধবা।

জননী যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তখন 'মেয়েটা মরে বেঁচেছে' ভাবখানা আসে কিনা। কামিনীর মৃত্যুর মাসদুই পরে একদিন তিনি কুসুমকে বল্লেন, "বৃন্দাবনে যাবি কুসমি? চল্, এখানকার সব বেচে দিয়ে জগন্নাথকে নিয়ে আমরা বৃন্দাবনে চলে যাই। সেখানেই পড়ে থাকবো দুটি প্রাণী। রাধারমণের দেশে কি ভিক্ষা মিলবে না?"

গৃহদেবতা গোবিন্দের নতুন নামকরণ করেছিলেন পণ্ডিত ৺জগন্নাথ। অঙ্গহানি হবার পরও পণ্ডিত গৃহদেবতার নিত্যপূজা ব্যাহত রাখেন নি। গ্রামের অন্যান্য পণ্ডিতেরা এসে বলেছিলেন, "এ কিসের পূজা তুমি করছ পণ্ডিত। তোমার গোবিন্দের হাত ভেঙে গেছে। অঙ্গহানি হলে পূজা করা যায় না ঠাকুরের। তুমি নবদ্বীপ থেকে বিধান আনাও।"

পণ্ডিত হেসেছিলেন ওদের মূর্খামিতে।

"পাগল? এ আমার ঠাকুরের লীলা। লুকোচুরি খেলাই স্বভাব যে ও'র। গোবিন্দ আমার হাত গুটিয়ে জগন্নাথ সেজেছেন!"

তাঁর নিত্যপূজা অব্যাহত ছিল। উপরন্তু ভোগের সময় নিমীলিত নেত্রে তিনি ভোগ খাইয়ে দিতেন ঠাকুরকে। গোবিন্দ যে হাত গুটিয়ে জগন্নাথ হ'য়েছেন। ফলে পরিবারবর্গের কাছে সেদিন থেকে ৺গোবিন্দের নতুন নামকরণ হ'য়েছিল—৺জগন্নাথ। এবং পরিবারের বাইরেও নতুন নামকরণ হয়েছিল পণ্ডিতের—পাগল।

মায়ের প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে গেল কুসুম। তারও আর ভাল লাগছিল না লক্ষ্মীপুরের বিষাক্ত বাতাস। ঠিক হ'ল মাসখানেকের মধ্যেই সমস্ত বিক্রয় ক'রে, টাকাটা পোস্ট-অফিসে রেখে সামান্য পাথেয় নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়বে বৃন্দাবনের তীর্থপথে। হয়তো হ'তও তাই। কিন্তু আবার একটা ঘটনায় ছেদ পড়ল এ ব্যবস্থায়।

একদিন সন্ধ্যায় বাড়ির পিছনের পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে ফিরছে

কুসুম—কাঞ্চন গাছের আড়াল থেকে কে যেন এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। অস্ফুটে কুসুম বললে,

"বিশুদা!"

"হ্যাঁ আমি। চিনতে পেরেছ দেখছি।"

দীর্ঘ চার বছর পরে ওদের সাক্ষাৎ।

"তুমি কোথা থেকে এলে বিশুদা? কবে এসেছ গ্রামে?"

"গ্রামে আমি এসেছি আজই। রাত ভোর হবার আগেই আমি চলে যাবো। আমার সময় অল্প। শোন, আমি ফেরারী আসামী, এ অঞ্চলেই গোপনে অর্গানাইজ করছি। আমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে কাউকে বলবে না। বুঝেছ?"

কুসুম ঘাড় নেড়ে জানায় সে বুঝেছে।

"আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে। হ্যাঁ, হরিহর গাঙ্গুলীমশাই। তিনি আমাদের পিছনে না থাকলে এ গ্রামে কাজ করা অসম্ভব হ'ত আমাদের পক্ষে। শোন কুসুম, তোমাকে এসব কথা বলছি বটে, কিন্তু এগুলি অত্যন্ত গোপনীয় খবর। কখনও কাউকে কোনও কথা বলবে না।"

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও অল্পেই স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে কুসুম। ছেলে-বেলা থেকেই আঘাত পেয়ে পেয়ে কুসুম হ'য়ে উঠেছিল কুলীশকঠোর। সে হেসে বললে, "তবে এত কথা বলছ কেন আমাকে? জাননা, মেয়েদের পেটে কথা থাকে না?"

বিশ্বনাথের কথা শুনে ওর মুখের হাসি কিন্তু মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

"তোমাকে তো সে জাতের মেয়ে বলে ভাবিনা আমি। জানো কুসুম, আমাদের দলে এমন মেয়েও আছে যারা—যাক্, তোমাকে যা বলতে চাই বলে নিই এই বেলা। আমার সময় অল্প—"

বাধা দিয়ে কুসুম বলেছিল, "আমাকে তোমাদের দলে নিতে পারোনা বিশুদা?"

"না, এখন না। মাসীমার কথাটাও ভেবে দেখো!"

"তবে আমি কি করবো? বৃন্দাবনে চলে যাবো?"

"না, তা'হলে তুমি আমাদের দলে আসবে কি করে? তুমি এখানেই প্রতীক্ষা করো—"

"কিন্তু—" ইতস্তত করে কুসুম।

"হ্যাঁ, আমি বুঝি। তুমি বরং এক কাজ ক'র। আমাদের দলের কোনও ছেলেকে বিয়ে করে আপাতত গ্রামেই থাক।"

হাসলে কুসুম।

"তুমি কি আমার সব কথা এখনও শোননি বিশুদা?"

"হ্যাঁ শুনেছি।"

"তবে ও কথা বলছ? সব কথা জেনে আমাকে বিয়ে করবে কে?"

"আমি যদি পাত্র এনে দিই? তুমি রাজী আছ?"

আবার হেসে ফেললে কুসুম, "পাত্রটি কি রকম না জেনে বলি কি করে?"

"তুমি···তুমি আমাকে বিয়ে করবে কুসুম?"

বিদ্যুৎপৃষ্টের মত একপা স'রে গেল কুসুম কথাটা শুনে।

"না।"

"না?···তবে অবশ্য অন্য পাত্র দেখতে হবে। আমি ভেবেছিলাম······ হয়তো আমারই ভুল হ'য়েছে···তুমি আমাকে মাপ কর কুসুম।"

"মাপ চাইবার কি আছে এতে? কিন্তু তুমি কি ক'রে ভাবতে পারলে বিশুদা আমার সমস্ত কলঙ্কের বোঝা নিয়ে তোমার নির্মল জীবন কালিমালিপ্ত করতে রাজী হব আমি?"

"ও শুধু এই জন্যেই—"

"নিশ্চয়!"

"অন্য কিছু নয়?"

"অন্য আবার কি?"

"ও বুঝেছি! শোন, ভুল বুঝেছ তুমি। তোমার ও ঘটনাটাকে কলঙ্ক বলে মনে করিনি আমি। সেরকম গুরুর কাছে শিক্ষা পাইনি তো। তুমিই বা কি ক'রে ওটাকে কলঙ্ক বলে মেনে নিয়েছ তাই ভাবি।"

একটু হেসে বললে, "হবেই তো! বাপের পাঠশালায় গিয়ে তো বসনি কোনদিন। তাঁর শিক্ষা আর পেলে কোথায়?"

"আমার এতবড় কলঙ্কটাকে তুমি উড়িয়ে দিতে চাও? তুমি জানো সে আঠারো ঘন্টা আমি কোথায় ছিলাম? সত্যিই আমি অজ্ঞান হ'য়েছিলাম কিনা? সজ্ঞানে আমার উপর—?"

"না তা জানি না। তবে এটা জানি, তা ঘটে থাকলেও তুমি সন্ত প্রস্ফুটিত কুসুমের মতই অপাপবিদ্ধ।"

এত মধুর কথা জীবনে শোনেনি কুসুম। আবেশে তার চোখ মুদে এল। স্বপ্নাবেশে সে শুনলে বিশ্বনাথের কথা—"জাননা আমার গুরুদেব বলতেন হাত ভাঙলে ঠাকুর অশুচি হয় না। হাত যে ভেঙেছিল সেটা তো প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু তাতে তো তাঁর নিষ্ঠা একতিলও কমেনি। সমাজের চোখে তোমার বাবার ঠাকুর বিকলাঙ্গ, বর্জনীয়, তুমি কলঙ্কিনী। সমাজের চোখে আমিও পতিত—জেলফেরত আসামী! জেলে বসে পাঁচ জাতের সঙ্গে লপসি খেতে হ'য়েছে আমায়। আমিও পতিত, তুমিও আমার কলঙ্কিনী রাই!"

মধু! মধু! এত মধুর কথা সহ্য করতে পারবে না কুসুম। তার সদ্যস্নাত সিক্ত মাথাটা আশ্রয় খোঁজে কুণ্ঠিগীর বিশ্বনাথের কপাটবক্ষে।

এরপরে কুসুমের বিবাহের কথা বলতে হয়, কিন্তু সে বিয়ের খবর কে রাখে? পণ্ডিতমশায়ের মেয়ের বিয়েতে বাজল না সানাই। বাজল না শাঁখ। হুলুধ্বনি দিল না কেউ। ভূরিভোজ খেলনা ইতরভদ্র। হরিহর গাঙ্গুলীর উপস্থিতিতে গোপন কক্ষে রাত্রির তৃতীয় যামে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন পুরোহিত;—মন্ত্রমুগ্ধের মত তা উচ্চারণ করে গেল কুসুম আর বিশ্বনাথ।

বিধবা জননী দাঁড়িয়েছিলেন দ্বারের পাশে—তারাপদ পুরোহিতের নির্দেশমত ফাইফরমাস যোগান দেয়, আর বাইরের দ্বারে দাঁড়িয়ে ঘড়ি হাতে প্রতীক্ষা করছিল একজন ছেলে। বিশ্বনাথের দলের লোক। বিবাহ অন্তে সে বরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে রাত ভোর হবার আগেই।

পূর্ব আকাশ ফর্সা হ'য়ে আসে। তারাপদ কয়েক গ্লাস শরবৎ নিয়ে এল। তাই পান ক'রে পথে বের হ'তে গিয়ে বিশ্বনাথ দেখল রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হ'য়ে গেছে। সঙ্গী একাই চলে গেল। বিশ্বনাথকে সমস্ত দিন অপেক্ষা করে যেতে হ'ল। লুকিয়ে থাকতে হ'ল বিশ্বনাথকে গোয়ালে। পরদিন বেরিয়ে পড়ল সে রাত্রের অন্ধকারে। কালরাত্রি।

এরপরে কুসুমের বিবাহিত জীবন। যতদূর আন্দাজ করছি রঙ চড়িয়ে গল্প করবার অবকাশ সেখানে অল্প। কচিৎ কখনও আসত বিশ্বনাথ রাতের অন্ধকারে—আবার বেরিয়ে পড়তো রাত পোহাবার আগেই। প্রতিবেশীরা কোন সূত্রে খবরটা পেল জানি না—কিন্তু বোঝা গেল আঁধার রাতের বরের স্বরূপ জেনে ফেলেছে অনেকেই। ফলে নবদম্পতির বিচ্ছেদগুলি দীর্ঘতর হ'তে লাগল শুধু।

চিঠিটা এমনিতেই বড় হ'য়ে গেছে। সংক্ষেপে শেষ করছি তাই কুসুমের ইতিহাস। কুসুমের বিয়ের বছর চার পাঁচ পরে ওর মা মারা যান। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় ধরা পড়ে বিশ্বনাথ। বছর তিনেক সে ছিল এবার জেলে। তারাপদই কুসুমকে দেখাশুনা করত। পঁয়তাল্লিশ সালের মাঝামাঝি ওরা দেশের বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে মনস্থ করলে। অনেকেই তখন ধীরে ধীরে চলে আসছে বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে—অনিবার্য কারণে। জিনিসপত্র, আসবাব, গরু, ক্রমে ক্রমে বিক্রি করে দিল তারাপদ। বিশ্বনাথ তখন হিজলির জেলে। জমি ও বাড়ির জন্যেও খদ্দের খুঁজে বেড়ায় তারাপদ। এই সময়ে পুরানো বাক্স ঘাঁটতে গিয়ে কামিনীর একটা লক্ষ্মীর কৌটো খোলে কুসুম। কৌটোটার চাবি ছিল না। মাঝে মাঝে আনি

দোয়ানি ফেলতো ঐ কৌটোয়। দুই বোনে আন্দাজ করতো কত জমলো। কামিনীর মৃত্যুর পর এটা খোলে নি কুসুম। বিশ্বনাথের জেল হবার পর—যুদ্ধের বাজারে, দুর্ভিক্ষের বাজারে যখনই খুলতে গিয়েছে—কামিনীর স্মৃতি এসে বাধা দিয়েছে তাকে। আজ বাড়িঘর ছেড়ে যাবার আগে কৌটোটা ভেঙে ফেলল সে। একরাশ আনি দোয়ানির মাঝ থেকে বের হ'ল একটুকরো জীর্ণ চিঠি—

"মেজদি! তুই কবে এ চিঠি পড়বি জানি না। ততদিনে আমার শোকটা সামলে যাবে—আমার অপঘাত মৃত্যুর কারণটাও সইতে পারবি তুই। মাকে কিছু বলিস্ না লক্ষ্মীটি! কথাটা না বলে যেতে পারছি না। যে তোর সর্বনাশ করেছে, সেই আমার এই পরিণামের জন্য দায়ী। যে কারণে মুখ ফুটে তুই স্বীকার করতে পারিস নি, সেই কারণেই আমিও কিছু বলতে পারলাম না তোকে মুখ ফুটে। তার চিঠিগুলো সব পুড়িয়ে দিয়ে গেলাম—নইলে দেখতিস্ অশ্লীল প্রস্তাবটার বিনিময়ে কি পরিমাণ লোভ আর ভয় সে দেখিয়েছে প্রতিনিয়ত। সমাজে একঘরে পতিত পরিবারের অরক্ষণীয়া একটি মেয়ের অনেক রকম পরিণামই হ'তে পারতো। তবে আবদুল গনির অঙ্কশায়িনী হওয়ার চেয়ে ধলেশ্বরীকেই বরণ করে নিলাম।

যতদিন পরেই পাস্ এ চিঠি, আমার জন্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলিস্।

—ইতি হতভাগিনী তোর কুমু।"

কুমুর শেষ অনুরোধ কুসুম রাখতে পারেনি। চোখ দিয়ে তার একফোঁটা জল আসেনি। জ্বালা করে জ্বলে উঠেছিল তার চোখ দুটো। কতকগুলো ভুলে যাওয়া দৃশ্য মনে পড়েছিল তার—আর মনে পড়েছিল সদাহাস্যময় তার স্নেহের বোনটিকে—কামিনী, তার কুমু!

তারাপদকে চিঠিখানা দেখায়নি কুসুম। দেখিয়েছিল বিশ্বনাথকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর সে যখন জেল থেকে ছাড়া পেল। বিশ্বনাথ চিঠি

পড়ে একটা কথাও বলেনি। চোয়ালের হাড়ছুটো শুধু কঠিন হ'য়ে উঠেছিল তার।

দলে দলে গ্রামবাসী তখন বেরিয়ে পড়ার জন্যে উদগ্রীব। দুটি সদ্যোজাত শিশুরাষ্ট্রের সন্তান তখন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করছে। এপার ওপার। বিশ্বনাথের ক্লাবের সভামুক্ত কয়েকটি সভ্য আবার ধরা পড়ল জননিরাপত্তা আইনে। কুসুম আর দেরি করতে রাজী নয়। বললে, "ওগো চল আজই বেরিয়ে পড়ি। ফিরে এসে পরে সম্ভব হ'লে জমি বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে। এখানকার দেনাপাওনা তো চুকলো।"

বিশ্বনাথ শুধু বললে, "দেনাপাওনা সব এখনও চোকেনি কুসুম। একটা বড় কাজ এখনও বাকি আছে। তুমি আর তারাপদ আজই রাতে রওনা হ'য়ে যাও। যেমন করে পার কলকাতায় পৌঁছে এই ঠিকানায় উঠো। আমি কয়েকদিন পরে গিয়ে মিলব তোমাদের সঙ্গে। আমার হাতের কাজটা সেরেই যাবো।"

"কি আবার তোমার এমন জরুরী কাজ?" শুধায় কুসুম।

"ঐ যে বললাম একজনের ঋণ শোধ করতে হবে।"

"কে সে?"

"আবদুল গনি!"

শিউরে উঠেছিল কুসুম। বারণ করেছিল বিশ্বনাথকে। তার পায়ে মাথা খুঁড়েছিল—কিন্তু সংকল্প থেকে একপাও টলাতে পারেনি তাকে। সেই রাত্রেই তারাপদের সঙ্গে শিশুপুত্রের হাত ধরে রওনা হয়ে গেল কুসুম। বিশ্বনাথও রওনা হ'য়ে গেল তার আরব্ধ কাজের উদ্দেশ্যে। বিদায় নিল স্বামীস্ত্রী।

এই বিদায়ই ওদের চিরবিদায়। কুসুমের সঙ্গে বিশ্বনাথের নাকি আর দেখা হয়নি। আবদুল গনির খুন হবার খবরটা সে পড়েছিল কাগজে, কারণ আবদুল তখন একটি রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা। বিশ্বনাথের ফটোসমেত

পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিটাও সে দেখেছে। বিশ্বনাথকে কিন্তু পুলিসে খুঁজে পায়নি। কুসুমও নয়। যে ট্রেনে বিশ্বনাথরা কলকাতা রওনা হয়েছিল কোন দুর্ঘটনায় সে ট্রেনের কোন হিন্দু যাত্রীই পৌছতে পারেনি তাদের এপারের নিরাপদ আশ্রয়ে!......

ঋতব্রতের সে চিঠিতে কুসুমের কথা ছিল ঐটুকুই। বাকি যা, তা এ কাহিনীর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। এ চিঠিখানা সে কলকাতা থেকে ফিরে এসে লিখেছিল দেখা যাচ্ছে। কাহিনীর পারম্পর্য রাখতে হ'লে ঋতব্রতের কলকাতা যাবার আগে যে ঘটনাটা ঘটে, সেটা এখানে লিপিবদ্ধ করা দরকার।

করোগেটেড টিনের ইনডেণ্ট আর দু'খানা চিঠি নিয়ে রামশরণ যেদিন চলে গিয়েছিল তার পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা সে ফিরে এল ক্যাম্পে। ঋতব্রত তখন তার ছ'পায়াতে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ভাবছে নানান কথা। কলকাতার ডাকে ক্যাজুয়াল লীভের কোনও জবাব আসেনি তখনও। জবাব পায়নি রেখা মিত্তিরকে লেখা চিঠিখানারও।

রতন এসে খবর দিলে সিংজী দেখা করতে চায়। ঋতব্রত উঠে বসে। গায়ে একটা গেঞ্জি চড়ায়। এসে বসে রামশরণ নমস্কার করে।

"সিংজীর কি খবর?"

"খবর তো আচ্ছাই। আপনার চিট্টি ভি লিয়ে এসেছি।" শার্টের কানাটা তুলে ফতুয়ার পকেট থেকে দুখানি চিঠি বার করে রাখল টেবিলে। ঋতব্রত ক্ষিপ্র হাতে চিঠি দুখানা নিয়ে পড়তে লাগল। প্রথমেই মেজদার চিঠি; সেখানা শেষ করে আমার লেখা চিঠিখানা পড়তে লাগল। অন্য-দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল রামশরণ। ঋতব্রতের কপালে যে কুঞ্চন-রেখা জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে ঋতব্রত সচেতন ছিল না—কিন্তু সমস্তই

নজরে যাচ্ছিল রামশরণের টেবিলের উপর রাখা শেভিং-সেটের গোল আয়নাটায়।

রতন এসে দাঁড়াল, "চায়ের জল বসাবো ?"

রামশরণ তাকে ডাকলে, "এ রতন ভাই, শুনোতো। পহিলে মেরে লিয়ে এক পাকিট সিগ্রেট লাও। দেখো ভাই কাঁচি মৎ লানা—ক্যাপটান্ লাও গে।"

একটা টাকা গুঁজে দিলে রতনের হাতে।

রতন একটু বিরক্ত হ'ল হয়তো, কারণ কাঁচি ছাড়া ক্যাপস্টান সিগারেট কাছের স্কুলবাজারে পাওয়া যাবে না। তাকে যেতে হ'বে সেই গোলবাজার অবধি। তবু টাকাটা নিয়ে রতন বেরিয়ে পড়ে।

ঋতব্রতের খেয়াল হ'ল রামশরণের উপস্থিতিটা অগ্রাহ্য করেছে সে এতক্ষণ। বল্লে, "সিংজী আবার সিগারেট ধরলে কবে থেকে ?"

"খাইনা হামি, আবার কভি কভি ভি খাই।"

জানালা দিয়ে গলা বার করে কি যেন দেখল রামশরণ। রতন ততক্ষণে বড় রাস্তায় উঠে পড়েছে।

"আপনার ঔর ভি একটা চিঠি আছে স্যার।"

"আরও চিঠি ? কই দেখি ?" হাত বাড়ালে ঋতব্রত।

আংরাখাকার আর এক পকেট থেকে বার ক'রে আনল সিংজী একটা মোটা খাম। দিল ঋতব্রতের হাতে। নাম ঠিকানা কিছুই লেখা নেই উপরে। ঋতব্রত খামটা খুলতে লাগল। খুক্ খুক্ ক'রে কাশল রামশরণ। হঠাৎ থুথু ফেলতে উঠে গেল বাইরে। ঘরে যখন ফিরে এল খামের অবগুণ্ঠন তখন আবার বন্ধ হ'য়ে গেছে। সিংজী আসন গ্রহন করল। পকেট থেকে একটা ডিবা বার ক'রে একখিলি পান ফেলে দিলে মুখ গহ্বরে, বল্লে, "একটা লিবেন নাকি স্যার ?"

ঋতব্রত স্থির হ'য়ে বসে রইল, হ্যাঁ না জবাব দিলে না। একটু ইতস্তত করে সিংজী ফের বল্লে, "কবে কলকাতা যাচ্ছেন স্যার ?"

"এটা আপনি নিয়ে যান।"

বন্ধ ভারী খামটা ঋতব্রত ছুঁড়ে দিলে রামশরণের কোলের উপর। একটু চমকে উঠল সিংজী, "কেন স্যার? কি কসুর হ'ল হমার?"

"কসুর আপনার নয়, কসুর আমার। আপনার সঙ্গে কাজ করতে হ'চ্ছে। আপনি ভুল বুঝেছেন মিস্টার সিং, আমি ও জাতের লোক নই।"

"এতে এ্যান্যায় কি আছে স্যার? আপনি হমার জন্তে এত পরিসন করলেন—"

"আপনার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আর কোনও আলোচনা করব না। আপনি যেতে পারেন।"

উঠে দাঁড়াল ঋতব্রত। চোখমুখ তার লাল হয়ে উঠেছে।

"আপনি হমার জন্তে পরিসন করেন নাই?"

"না! আপনার জন্তে আমি কিছুই করিনি। যা করেছি, তা শুধু আমার কর্তব্যই করেছি। তার পারিশ্রমিক আমি ঠিকই পেয়ে থাকি। ছিঃ, এ বিষয়ে—"

"লেকিন—", বাধা দিয়ে বললে রামশরণ, "—কোলটারিং? ওহি রোজ আপনি হমাকে না বাঁচাইলে তো হামি মরতম্ স্যার!"

হা হা করে হাসলে রামশরণ। আপাদমস্তক জ্বলে গেল ঋতব্রতের। সেদিনকার অপমানের দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল বুঝি। বললে, "আমি আবার বলছি আপনি ভুল বুঝছেন মিস্টার সিং। পুরানো বল্লাতে আলকাতরা লাগাতে দেওয়ার পিছনে যে এই হীন ষড়যন্ত্র ছিল, তা আমি তখন বুঝিনি। হ্যাঁ, আপনারা আমাকে বোকা বানিয়েছেন! তার জন্তে যথেষ্ট অপমানও হয়েছে আমার সেদিন। কিন্তু আজকের এই অপমান—এ আমি জীবনেও ভুলব না। আপনি যেতে পারেন।"

যাবার কিন্তু কোন লক্ষণ রামশরণের দেখা গেল না।

"যো হইয়ে গেছে, ও তো হইয়েই গেছে স্যার। বিল্ তো হামি পাইয়েই গেছি। এখন তো ও ফিন্ লোটানো যাবে না। লেকিন আপনি ভি কুছু না নিলে যে হমার মন মানবে না। ও তো স্রিফ অধরম্ হোবে।"

"জানি না ধর্মজ্ঞান বলতে আপনি কি বোঝেন! টাকাটাই বোধহয় আপনাদের কাছে চরম ধর্ম! কিন্তু টাকার উপরেও একটা জিনিস আছে যার নাম ইমান্। কথাটার মানে আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না—তাই ও আলোচনা থাক। কিন্তু এক্ষুনি আমার ঘর থেকে আপনি চলে না গেলে, আমি লোকজন ডাকতে বাধ্য হ'ব।"

এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল রামশরণ।

"আপনি হমাকে ঘরসে নিকাল দিলেন স্যার?"

"এই সোজা কথাটা আরও আগেই বুঝতে পারবেন আশা করেছিলাম।"

অপমানে এতক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে রামশরণ ঠিকাদার। ঋতব্রত যে এতটা রূঢ় হতে পারবে এটা সে কল্পনাই করেনি। তবু অদ্ভুত তার সংযম। কোনও কথা না বলে ধীরপদে সে এগিয়ে গেল দ্বারের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ আপনি আমীর এস. ডি. ও. আছেন,—হামি গরীব ঠিকাদার আছি। আজ আপনি হমাকে ইনসল্ট করতে পারেন। লেকিন হামি ভি কুত্তা নেই, হামি ভি আদমি আছি।"

"সে পরিচয় পেলে খুশি হ'ব।"

দপ্ করে জ্বলে উঠল সিংজীর চোখ দুটো। ঠোঁট দুটো ঈষৎ উন্মোচিত হল—কিন্তু কিচ্ছু বললে না। যুক্তকর অবহেলাভরে কপালে ঠেকিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল রামশরণ সিং।

অন্ধকার ঘরে ঋতব্রত পায়চারি করে। রতন লণ্ঠন জ্বেলে রেখে যায়নি। কথায় কথায় সন্ধ্যা উৎরে গেছে। পকেট হাতড়ে একটা দেশলাই জ্বালে ঋতব্রত। সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজতে থাকে। একটা সিগারেট না ধরালে উত্তেজনাটা কমবে না। আর, কোথায় যে ফেলে কাজের জিনিস!

টেবিলের উপরে নাই, বালিসের তলায় নাই, ছাড়া বুশ-কোটটার পকেটে? তা-ও নাই।

"কি খুঁজছেন স্যার?" রতন এসে দাঁড়ায়।

"আমার সিগ্রেটের প্যাকেট?"

"এই যে।" রতন এগিয়ে দেয় আনকোরা একটা নতুন প্যাকেট। আগ্রহে সেটা থেকে খুলে একটা মুখে দিতে গিয়ে কি ভেবে হঠাৎ থেমে যায় ঋতব্রত। সিগারেট সমেত প্যাকেটটা টান মেরে ফেলে দেয় বাইরে। থমকে দাঁড়ায় রতন, "স্যার?"

"যা এক প্যাকেট ক্যাপস্টান নিয়ে আয়।" একটা টাকা বার করে দেয় ঋতব্রত। একটুখানি অবাক হয়ে চেয়ে থেকে আবার পথে নামে রতন।

তাকে গোলবাজার যেতে হবে। স্কুলবাজারে ক্যাপস্টান পাওয়া যায় না।

লীলার বিয়েতে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। ঋতব্রতের বন্ধু হিসাবেই নয়। ওর মেজদা এবং মেজবৌদির পরিচিত গণ্ডীর একটা নিকটবর্তী স্থলেই ছিল আমার অবস্থিতি। বিয়েবাড়িতে ঋতব্রতের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলার সময় ছিল না; কাজের ভীড়ে একবার শুধু বললে, "কাল তোর অফিসে যাবো বারোটা নাগাদ। বিশেষ জরুরী দরকার।"

পরদিন সে সত্যিই এসেছিল আমার অফিসে। আমার কাছে ও হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। তার নাকি তখনই এক হাজার টাকা ধার চাই। যে কোনও সুদে, যে কোনও শর্তে। সন্দেহ হল। পীড়াপীড়ি করলাম। ভাঙলে না কিছু। শুধু বললে, লীলার বিয়েতে তাকে একজনের কাছ থেকে টাকাটা ধার নিতে হয়েছে; কিন্তু তার কাছে অধমর্ণ থাকতে চায় না। লোকটা কে, সেখানে কত সুদ দিচ্ছে কিছুই বলবে না। অগত্যা নিজের

একাউণ্ট থেকে টাকাটা দিতে হ'ল। জিজ্ঞাসা করল, কত সুদ? বললাম "টাকাটা আমারই; পোস্টাফিসের সেভিংস খাতা থেকে তুলে দিয়েছি মাত্র।" বৎসর খানেক ধরে ইনস্টলমেণ্টে টাকাটা ফেরৎ পেয়েছিলাম। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। সেভিংস ব্যাঙ্ক হারে সুদ কষে সে শেষ ইনস্টলমেণ্টে সে টাকাটাও যোগ দিয়ে দিয়েছিল। মনে আছে, মনি-অর্ডার কুপনে লিখেছিল, "জানি এ ক'টাকায় তুমি কিছু বড়লোক হবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে থাকলে তোমার যে টাকাটা জমতো, আমিই বা তার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব কেন?"

এটা ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য! ওর বিবেকটার একমাত্র উপযুক্ত উপমান সজারুর কাঁটা। তার জন্য কষ্টও পেয়েছে সারাজীবন। 'আদর্শ' বলে কি একটা অপার্থিব জিনিসকে আঁকড়ে ধরে কতকগুলো মূর্খ দুনিয়ায় যাবতীয় অত্যাচার সহ্য করে যায়—ও হচ্ছে সেই মূর্খ দলেরই একজন। ঐ আদর্শে আঘাত লাগলে সজারুর কাঁটার মত ওর বিবেকটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই জন্যেই হয়তো চাকরিজীবনে সকলের সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করে গেছে। দেখেও দেখতে না পাওয়াটা যে একটা বড় বিদ্যার অন্তর্গত, তাতে যে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই, এটা বুঝতে অমিত রায়ের মত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। সংসারের চৌদ্দ আনা লোক এ সত্যটা বোঝে। দুনিয়ার এই চৌদ্দ আনা অংশের কত ভগ্নাংশ অন্যায় করে তা জানি না, তবে বাকী অংশটা যে নির্বিচারে 'অন্যায় সহে' তা হলপ করে বলতে পারি। জগতের তাবত অন্যায় দৃশ্যের সম্মুখে এরা সর্টসাইট—অনুচিত কাজের বাজারে অন্যমনস্ক। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ 'এন্‌জেলরা' যেখানে পদক্ষেপ করতে দ্বিধাগ্রস্ত—বাকী দু'আনা সেখানে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। তাদের সংজ্ঞা মূর্খ। ঋতব্রত এই মূর্খের দলের একজন। আর সেই মূর্খামিটা করতে পারার জন্যেই তার যেন একটা বেপরোয়া বড়াই আছে। পাঁচজনের মতের তোয়াক্কা না রেখে এই বেপরোয়া ভাবপ্রকাশটার সংজ্ঞা সাধুভাষায় দুষ্টিকটু। ক্যাম্পজীবনে সে যে বাড়াবাড়িটা করেছিল তার পিছনে ছিলেন

সমধর্মাবলম্বী আর একজন মূর্খসম্রাট! তাঁর কথাই বলব এবার। কিন্তু তার আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে ওর টাকা ধার করার ব্যাপার দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। এ সন্দেহের নিরসন করেনি কোনও দিন ঋতব্রত। তবে সন্দেহটা নিরাকরণ হল মেজবৌদির সঙ্গে আলাপচারিতে একদিন। মেজবৌদি বললেন, "ঠাকুরপো তো আজকাল চিঠিপত্রই লেখে না। তোমাদের লেখে-টেকে নাকি?"

বললাম, "কই না। লীলার বিয়ের আগে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল লোক মারফৎ। সেটাও কাজের চিঠি। কে এক আর. এস. সিং নিয়ে এসেছিল চিঠিটা।"

"ও রামশরণ সিং? ওকে চেন না? ও হচ্ছে ঠাকুরপোর ঠিকাদার। লীলার বিয়েতে একটা জড়োয়া হার দিয়েছিল। এমন চমৎকার হারটা জানলে, একটা করে ফুল আর তার পাশে—"

গহনার প্যাটার্নের প্রসঙ্গ থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এ লোকটাকে চিনলেন কি করে আপনারা? ঋতব্রতই নিমন্ত্রণ করেছিল বুঝি?"

"কে ঠাকুরপো? ওরে বাবা! তাকে নেমন্তন্ন করার জন্যে ঠাকুরপোর কী রাগ! কি করে জানব বল ভাই? ও লোকটাকে তো ওই পাঠিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। একবার চিঠি নিয়ে এল। পরের বার ওর হাতেই টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। টাকাটা যেদিন নিয়ে এল সেদিন কী কাণ্ড! তোমার দাদা সেদিন বাড়িতে। টাকাটার ভাবনায় উনি তখন উদ্‌ভ্রান্ত। বিয়ের মাত্র তিন দিন বাকি। হঠাৎ ঠাকুরপোর পাঠানো টাকাটা এসে পৌঁছল। উনি এত খুশি হয়ে উঠলেন যে ভদ্রলোককে বসিয়ে নিয়ে রসগোল্লা সন্দেশ খাওয়ালেন।"

খিল খিল করে নিজেই হেসে ওঠেন মেজবৌদি, "তোমার দাদাকে তো চেন ভাই। হাত দিয়ে একটা পয়সা কখনও গলতে দেখিনি। হঠাৎ ভিতরে এসে হুকুম করলেন বাইরে দু' কাপ চা পাঠিয়ে দাও শিগগির। বল্টুকে

নগদ একটা টাকা দিয়ে খাবার কিনতে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ভাবলাম লীলার শ্বশুরবাড়ির বুঝিবা এল কেউ। বললেন, 'না, রিতু টাকা পাঠিয়েছে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিঠি দেয়নি ?' বললেন, 'না। মুখে বলতে বলেছে কয়েক-দিনের মধ্যেই আসবে।' তা ভদ্রলোক লোক ভালো। চা-টা খেয়ে অনেক গল্পসল্প করল। কোথায় লীলার বিয়ে দিচ্ছি, পাত্র কি করে। এর পর তোমার দাদার ওকে মৌখিক নিমন্ত্রণ না করাটা খারাপ দেখাতো না ?"

"নিশ্চয়ই।" জবাব দিলাম অন্যমনস্কের মত। "কেন, ওকে নিমন্ত্রণ করায় কি অসন্তুষ্ট হয়েছিল রিতু ?"

"অসন্তুষ্ট ? ভাগ্যিস সম্পর্কে বড়, তাই মারতে বাকি রেখেছে! তোমার দাদা বারণ না করলে উপহারটাও ফেরত দিয়ে দিতো। আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'মেজদা ওকে চিনল কি করে ?' বললাম, 'বারে! ওর হাতেই তো তুমি প্রথমবারে চিঠি পাঠালে, তারপর টাকা পাঠালে।' শুনে ঠাকুরপো চুপ করে গেল। সব কথা ওর মনে পড়ল বোধ হয়। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'টাকাটা কবে দিয়ে গিয়েছিল।' হিসাব করে তারিখটা বললাম। ও চুপ করে গেল।"

এখন বুঝতে পারি আমার দেওয়া হাজার টাকা কোথায় গিয়েছিল। ভারি ইচ্ছে হয় দৃশ্যটা জানতে। নোটের বাণ্ডিলটা কি ছুঁড়ে মেরেছিল রামশরণের মুখে ? টাকাটা ফেলে দেওয়ার সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে কিছু বাণী দান করেছিল নিশ্চয়ই! দুর্ভাগ্য আমার সে দৃশ্য আমার অজানা। ঋতব্রত সেকথা বলেনি আমাকে।

কিউ. সি. আই. ব্যারাকটা সারানো শেষ হয়ে গেছে। এন/৩ বিল্ডিংটার উপরের টালিগুলি বসানো হয়ে গেছে। মুলিবাঁশের দেওয়াল নতুন করে বাঁধছে ঘরামিরা। আগেকার দেওয়ালটা অনুমোদন করেনি ঋতব্রত। কারণ বাঁধুনির নয় ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ নয়। এই দেওয়ালটা তৃতীয়-বার বাঁধছে ঘরামিরা। প্রথমবার ঋতব্রত ওটা খুলতে আদেশ দেয়, কারণ সেটা

ছিল "বুকা বাঁধুনি", অর্থাৎ মুলিবাঁশ ফাটিয়ে তার অমসৃণ ভিতর দিক, বুকের দিক দিয়ে সেটা তৈরি করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার মসৃণ অংশ, অর্থাৎ পিঠা-মুলির বাঁধুনি দেওয়া হল বটে, কিন্তু বাঁধুনির খোপগুলা নয় ইঞ্চির জায়গায় দশ সাড়ে দশ ইঞ্চি ফাঁকে বাঁধা হয়েছে। সুতরাং রিজেকটেড!

ওয়ার্ক-সরকার নির্দেশ জানাতে গেল ঘরামিদের। ফলে একটা রীতিমত ঝগড়ার সৃষ্টি হল। ঘরামি মিস্ত্রিরা রুখে উঠেছে, এ কি অত্যাচার! বাঁশের চাটাই বুনানিতে আবার এক আধ ইঞ্চি কি? এ কি ঢালাই ছাদের রড সাজানো? গণ্ডগোল শুনে ছুটে এল ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত। ব্যাপারটা শুনে স্পষ্টই বিরক্ত হল সে। বিরক্তি প্রকাশ করতেও বিরত হল না। বস্তুত তার মতেও এটা অন্যায় জুলুম। ফলে ঘরামি মিস্ত্রিরা জো পেয়ে গেল। তারা আরও চড়া গলায় অস্বীকার করল আবার বদল দিতে। জিনিসটা হয়তো ঘনিয়ে উঠতো। সমাধান হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। রামশরণ সমস্তটা শুনে ঢালা হুকুম দিলে, "ফিন্ বদল দেও!" ঘরামিরা ফুরণে কাজ করে, তারা অস্বীকার করল। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল রামশরণ, "অত কোতায় তোমার কাম কি বাবা? এটো হামি তুমার কাছে লিয়ে লিলম। তুমি হমার কাছে এর নাপি পাবে। লেকিন সাবকো ফিন্ বদল দেও?"

এর পর আর কথা চলে না। ওয়ার্ক-সরকারের দিকে ফিরে হেসে বললে, "আপনার সাহেবকে বলবেন—নাফা হামি জরুর করবে। সুঁচ না যাইতে দিলে কি হোবে—হাঁথি হামি জরুর চালিয়ে লিবে!"

প্রতিপদে ঠোকাঠুকি চলেছে তখন ঠিকাদারের সঙ্গে। প্রতিটি আইটেম এত খুঁটিয়ে পরখ করছে, যে সন্দেহ হতে পারে—রিফ্যুজিদের বাড়ি নয়—তাজমহলের মেরামতি কাজ তদারক করছে কেউ। মাপে এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ কম হলেও শালখুঁটি নাকচ হয়ে যায়—নির্ভেজাল মগরা বালি ছাড়া কাজ হয় না—এমন কি এই কাজের জন্যেও 'স্লাম-টেস্ট', 'সিভ-টেস্ট' করিয়ে কাজ করাতে হবে বলে হুকুমজারি করতেও দ্বিধা করল না। রামশরণ

কোনও প্রতিবাদ করেনি। অননুমোদিত মাল গাদা দেওয়া থাকল ঠিকাদারের গুদামে। একটা প্রত্যাঘাত প্রতিনিয়তই আশঙ্কা করছিল ঋতব্রত। অচিরেই দেখা দিল সেটা। মিস্টার ডাট আর একবার পরিদর্শনে এলেন। হাতে রামশরণের দেওয়া ক্ষতিপূরণের একটা লম্বা ফিরিস্তি। বিভাগীয় গাফিলতিতে তার কি কি ক্ষতি হয়েছে তারই লম্বা লিষ্টি। রামশরণকে ডেকে ধমক দিলেন দত্তসাহেব।

"এসব কি ছেলেমানুষি করেছেন? তিন লাখ টাকার কাজে পাঁচ টাকা সাত টাকার দুশো খেসারত দাবি করতে দেখিনি কখনও আমার বিশ বছরের চাকরিজীবনে।"

কথাটা তিনি জানিয়েছিলেন ইংরাজীতেই এবং যে জবাবটা রামশরণ দিয়েছিল তার বিচিত্র ভাষায়—তার মর্মার্থ হল লাখো শালবল্লার ভেতর বেছে বেছে এক সুতো মাপে ছোট বল্লা বেছে নিয়ে দিতে সেও দেখেনি তার ত্রিশ বছরের ঠিকাদারী জীবনে! কথাটা বলেছিল সে বিনীত ভঙ্গিতেই, কিন্তু ভ্রূকুঞ্চিত হল দত্তসাহেবের।

স্টোর ঘুরিয়ে রামশরণ দেখাল অননুমোদিত মালের গাদা। দত্তসাহেব বিস্মিত হয়ে ঋতব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন সেগুলো কেন বাতিল হয়েছে।

"ওগুলো আণ্ডার স্পেসিফিকেসনের মাল স্যর।"

"আণ্ডার স্পেসিফিকেসন? মাই ফুট! দে আর শর্ট বাই ফ্রাক্সনস অব ইঞ্চেস! এ্যাকসেপ্ট দেম অল।"

"আপনি তা হলে লিখিত অর্ডার দিন স্যর।"

"দ্যাট আই কাণ্ট, য়ু নো।"

"ওয়েল! দেন আই কাণ্ট এ্যাকসেপ্ট্।"

ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হ'ল ডাটসাহেবের। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বল্লেন, "এ্যাম আই টু বিলিভ দি স্টোরি অব্ দি কণ্ট্রাক্টর দ্যাট য়ু হ্যাভ পারসোনাল মোটিভস্ ইন হ্যারাসিং হিম্, বোস?"

"ইট্‌স্‌ আপ্‌ টু য়ু টু বিলিভ এনিথিং য়ু প্লিস্‌।"

"আই সী।"

কোনও কাজ পরিদর্শন না করেই জীপে গিয়ে বসলেন দত্তসাহেব। এক-বার মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "বাই দি ওয়ে, হু কুক্‌স্‌ য়োর ফুড?"

"আমার একজন মেইডসার্ভেন্ট আছে এখানে, সেই রান্না করে।"

"মে আই নো হার নেম?"

সেনগুপ্ত শুনতে না পাওয়ার ভান করে এক পা পিছিয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিলে রামশরণ। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল ঋতব্রতের, বল্লে,

"নো য়ু মে নট! বিকজ দ্যাটস্‌ এগেন এ্যাবসোলিউটলি মাই পার্সোনাল এ্যাফেয়া'র্স!"

"আই সী!" জীপে উঠে ডাটসাহেব শুধু বল্লেন, "য়ু শ্যাল হ্যাভ টু পে হেভিলি ফর য়োর ইনসোলেন্স!"

"ইফ্‌ অনেস্টি ইজ ইনসোলেন্স ইন য়োর ডিক্সনারি আই অ্যাম রেডি টু পে ডিয়ারলি ফর মাই এ্যাকসন্স!"

একরাশ ধুলো উড়িয়ে জীপ রওনা হয়ে গেল।

ঘরে ফিরেই ক্যাজুয়াল লিভের জন্য একটা দরখাস্ত লিখে ডাকে দিয়ে রওনা হ'য়ে পড়ল ঋতব্রত। তাকে চীফ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে হ'বে। সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবে তাঁকে, তারপর দরকার হয় পদত্যাগ করবে সে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটার সামনে ঋতব্রত পাইচারি করছিল। স্টেশনের বাস কখন আসবে জানা নেই। তাড়াতাড়ি কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন, সুতরাং অবিলম্বে বেরিয়ে পড়েছে। কখন বাসের টাইম আছে, স্টেশনে ট্রেনই বা আসবে কখন খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। খেয়াল হয়নি ট্রেন বা বাস না থাকলে তাকে অহেতুক অপেক্ষা করতে হ'বে পথের মধ্যে।

ওর এই সব ছোটোখাটো কাজেই বুঝতে পারি কেন সে চাকরিজীবনের

প্রথম অধ্যায়ে শুধু ঝগড়াই করে গেল সবার সঙ্গে। যেটা করণীয় মনে করেছে, তখনই করেছে সেটা, অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করেই ; এবং কোনও রকমে রেখে ঢেকে করার চেষ্টা করেনি। ফলাফল বা লোকে কি ভাববে ভেবে দেখাটা যেন ওর প্রযোজন নেই। এর জন্যে যেন কোনও ক্ষেদও নেই তার। এই যে একঘণ্টা ধরে রাস্তার উপর পায়চারি করছে আর সিগারেট ধ্বংস করছে এর মাঝে কি একবারও অনুশোচনা হয়েছে তার—কেন কোনও খবর না নিয়ে রওনা হ'যেছিল ? আমার তো মনে হয় না !

"এক্সকিউস্ মি, আপনই কি কন্‌স্ট্রাকসন এস. ডি. ও. মিস্টার হৃদয়ব্রত ঘোষ ?"

ঘাড় ঘুরিয়ে ঋতব্রত দেখল একটা ল্যাণ্ড-রোভার এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। এক ভদ্রলোক, নিজেই চালক, ওকে জিজ্ঞাসা করছেন মুখ বাড়িয়ে। এগিয়ে এল সে, বল্লে,

"আমার নাম ঋতব্রত বোস।"

"ঠিকই ধরেছি !" ল্যাণ্ড-রোভার থেকে নেমে এলেন ভদ্রলোক। একটা কর্ডের প্যান্ট এবং বুশ-কোর্ট পরণে। মাথায় একমাথা প্ল্যাটিনাম-বর্ণ পাকাচুল, মুখে ধূমায়মান মস্ত চুরুট।

"আমার নাম সঞ্জীব চৌধুরী। আপনার সহপাঠি ত্রিদিব চৌধুরী আমার বড ছেলে।"

"তাই নাকি ? ও, ত্রিদিব এখন কোথায় ?"

"ডি. ভি. সিতে চান্স পেয়েছে একটা। বাই দি ওয়ে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? চলুন আমি একটা লিফ্‌ট দিয়ে দি।"

"আমি যাবো স্টেশনে। কলকাতা যাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। ত্রিদিবের বাবা আপনি।"

"ঘ্যাটস্ অল্, দ্যাটস্ অল্ ! কলকাতা যাচ্ছেন ? তাহলে স্টেশনে কেন—আমি বাই রোড কলকাতা যাচ্ছি। আমার সঙ্গেই যাবেন চলুন।"

সঞ্জীব চৌধুরীর ল্যাণ্ড-রোভারে ঋতব্রত চলল কলকাতামুখো। সঞ্জীববাবু অত্যন্ত আমুদে লোক—গল্পটা একটু বেশীই করতে ভালবাসেন। সারা রাস্তা তিনি নাগাড়ে ড্রাইভ করতে করতে চুরুট খেলেন, এবং চুরুট খেতে খেতে গল্প চালালেন। কোন একটি বিখ্যাত টার এ্যাণ্ড পেন্ট প্রডাক্টস্-এ কাজ করেন তিনি। চার অঙ্কের একটা মাহিনা পান। এ গাড়িখানা কোম্পানির। বার তিনেক সাগরপাড়িও দিয়েছেন কোম্পানির টাকায়। টার ম্যাকাডাম্ হাই-ওয়ে হ'চ্ছে বকুলতলা ক্যাম্পের ছ'মাইল উজানে। সেখানেই কাজ দেখতে আসেন তিনি প্রায়ই। ত্রিদিবের কাছেই শুনেছিলেন তিনি তার এক সহপাঠি হৃদয়ব্রত ঘোষ ক্যাম্প রিপেয়ার্সের কাজের তদারকিতে আছে। ওকে দেখে তাই আন্দাজে ধরেছিলেন। ঋতব্রত দেখল ওর নামটা আবার বিকৃত করেছেন ভদ্রলোক। সংশোধন করে দিল আবার, "আমার নাম ঋতব্রত বোস।"

"সো য়ু সেড জাস্ট নাউ। আই নো।"

সঞ্জীববাবু খোঁজ নিলেন কেমন কাজকর্ম চলছে। কি বুঝছে সে। নতুন চাকরিজীবনে কেমন লাগছে তার। সে জিজ্ঞাসার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার সুর ছিল যে, এই শুভ্রকেশ বৃদ্ধের কাছে অকপটে অনেক গল্পই ক'রে গেল ঋতব্রত। ধৈর্য ধরে সবটা শুনলেন চৌধুরী সাহেব। বল্লেন,

"এ্যাণ্ড হি আসক্‌ড হার নেম, এ ?"

"হ্যাঁ, তাই তো জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।"

"উড য়ু টেক্ মাই এ্যাডভাইস ?"

"বলুন।"

"সেই লোকটা—কি যেন নাম, তারাদাস না কি বল্লে, সে এলে মেয়েটিকে তার সঙ্গে যেতে দেবে না।"

"ক্যাম্প-সুপারের পরামর্শ মত নারী-আশ্রমেই পাঠিয়ে দেবো ?"

"সার্টেনলি নট্।"

"তবে ?"

"ভালো রান্না ক'রে যখন, রাখ না তোমার কাছে। পরে কোনও হাঁসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিও। অবশ্য আমার এ কথা বলা উচিত নয়। তোমার বিবেক যা বলে তাই কর। তবে আমি হলে ঐ রকম করতাম।"

"কিন্তু লোকে তো অন্য রকম ভাবতে পারতো আপনার সম্বন্ধে ?"

"আই কেয়ার এ ফিগ্ ফর দ্যাট্! ভাবলো তো বয়েই গেল। কে কি ভাবছে তার কি জান তুমি ? এই তো আমি। আমি তো তোমার কাজে অন্যায় কিছু দেখিনি।"

উৎসাহিত হ'ল ঋতব্রত। এই তো, তার মত দৃষ্টিভঙ্গির মানুষও তো আছে দুনিয়ায়। সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার পাশে। চৌধুরী সাহেব পিছনের সীট থেকে ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে তরল মত কি একটা গলাধঃকরণ করলেন।

"উড য়ু মাইণ্ড হ্যাভিং সম্ ড্রিংক ?"

তীব্র গন্ধে পানীয়টার জাত সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা করা যায় অনায়াসে। মাথা নেড়ে ঋতব্রত অসম্মতি জানায়।

"দেন হ্যাভ সম্ স্মোক্ এ্যাট লিস্ট।"

সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরলেন চৌধুরী।

"না থাক।" ত্রিদিবের বাবার সঙ্গে বসে ধূমপান করতে ইতস্তত করা অস্বাভাবিক নয়। দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব। কন্যা-পক্ষের লোক যে ভঙ্গিতে দুটি হাত বাড়িয়ে বরকর্তাকে অভ্যর্থনা করেন 'আজ্ঞা হোক' বলে—সেই ভঙ্গিতেই চৌধুরী বল্লেন, "দেন গেট ডাউন প্লীজ্।"

বিস্মিত ঋতব্রতের কণ্ঠ-নিসৃত বাক্যটার কোনও আক্ষরিক রূপ নেই। 'অ্যাঁ'—'আজ্ঞে' জাতীয় কি একটা বলতে চাইল সে। জবাবটা আসলে তার "?"

গম্ভীর ভাবে বলেন চৌধুরী, "আই ডোণ্ট এণ্টারটেন সচ্ কম্পানি।"

"কেন কি দোষ করলাম আমি ?"

"ক্যাম্পের সামনে দেখলাম সিগারেটের স্মোকস্ক্রীন রচনা করেছিলে, আর আমার অফার করা সিগারেট তুমি খাবে না ?"

হেসে ফেলে ঋতব্রত। বল্লে, "কী আশ্চর্য! সিগারেট খেতে ইচ্ছে না করলেও জোর করে খাওয়াবেন আপনি ?"

"নিশ্চয়ই না! সিগারেট খেতেই হ'বে—এ কথাতো বলিনি। আমি বলেছি সিগারেট না খেলে তোমাকে নেমে যেতে হ'বে শুধু।"

ধুধু করা প্রান্তরটার দিকে তাকিয়ে অগত্যা সিগারেট নিয়ে ধরালো ঋতব্রত। বল্লে, "হ্যাঁ আপনি কি বলছিলেন যেন ?"

গিয়ার বদলাতে বদলাতে চৌধুরী সাহেব বল্লেন, "লোক কি ভাবছে না ভাবছে না ভেবে যা মন চায় করে যাব।"

"আমি তো তাই করি—"

"ছাই কর! তা হ'লে এতক্ষণ সিগারেট ধরাচ্ছিলে না কেন ? ইচ্ছে করছিল না বলে ? দিব্যি তো ধোঁওয়া গিলছ এখন! অপরে কি ভাবছে না ভাবছে তোয়াক্কা না রেখে চললেই জীবনে উন্নতি করা যায়। য়ু অলওয়েস্ গেইন বাই দ্যাট্।"

"কিন্তু আমার তো তাতে বরাবর ক্ষতিই হ'য়েছে।"

"আলটিমেট্লি লাভ হ'বেই। এ অনেকটা ইংরেজদের যুদ্ধনীতির মত। মাইণ্ড নট লুজিং অল দি ব্যাটল্স্ বিকস্ য়ু স্যাল আলটিমেটলি উইন দি ওয়ার! বিশ্বাস হ'চ্ছে না ? আচ্ছা তবে আমার গল্প শোন। আঃ সিগারটা নিভে গেল। উড য়ু হেল্প মি ?"

ঋতব্রত দেশলাইটা জেলে হাতের আড়াল করে ধরে। সমান বেগে গাড়ি চালাতে চালাতে সিগারটা ধরিয়ে নিলেন চৌধুরী সাহেব। আশ্চর্য চৌধুরী সাহেবের ধূমপান রীতি। ল্যাণ্ড-রোভারে দূর পাল্লার ড্রাইভ করার

সময় যত ধোঁয়া বের হয় একজস্ট পাইপ দিয়ে, তার চেয়ে বেশী ধোঁয়া ছাড়ে তাঁর চুরুট। চেন-স্মোকিং-এর অপকারিতা সম্বন্ধে কেউ কিছু উপদেশ দিতে এলে বলতেন তিনি, "কি করব বল? দেশলাই কিনতে কিনতে ফৌত হ'য়ে গেলাম। দিস্ ইজ ওনলি টু কাট ডাউন বাজেট-হেড এক্সপেনডিচার অন ম্যাচবক্স।"

তাঁর গল্প শুরু করলেন চৌধুরী সাহেব

"কি বলছিলাম? আমার নিজের অভিজ্ঞতা? আজ আমি মস্ত অফিসার। অনেকের ঈর্ষার পাত্র। কিন্তু কি ভাবে আমি জীবন শুরু করি জানো? একজন সাধারণ রোড-সরকার হিসাবে! ছাব্বিশ বছর বয়সে এনট্রান্স পাস করি, ত্রিশ বছরে বি. এস. সি।"

অবাক হয়ে গেল ঋতব্রত। ওয়ার্ক-সরকার থেকে ঘষে ঘষে এতদূর উঁচুতে উঠেছেন সঞ্জীব চৌধুরী?

"কি ক'রে এতটা উঁচুতে উঠেছি জানো? শুধু বাঙালের গোঁর জোরে। তখন আমি উড়িষ্যায় পোস্টেড, ওয়ার্ক-সরকারি করি। সে যুগে উড়িষ্যার অনেকটাই ছিল বেঙ্গল পি. ডাব্লু. ডি-র অধীনে'। আজকালকার মত পঞ্চাশটা ডিপার্টমেণ্ট ছিল না তখন। বেঙ্গল পি. ডাব্লু. ডি-র চীফ এঞ্জিনিয়ারই ছিলেন সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি। আমার বয়েস তখন চব্বিশ পঁচিশ। বন্ধুদের বাবাদের সামনে তো নয়ই—লুকিয়েও বার্ডসাই খেতে শিখিনি তখনও। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় টাকা বারো চোদ্দ মাইনে পেতাম। ছাতি মাথায় দিয়ে রাস্তায় কুলি খাটাই। একদিন কাজ তদারক করছি, আগের রাত্রে 'রোড-ক্লোজ্‌ড্‌' লেখা সাইনবোর্ডটা সরিয়ে দিয়ে কয়েকটা লরি গিয়েছিল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। তাই এজিং ভেঙে গিয়েছিল অনেকটা। সেটা মেরামত করাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা মস্ত মটরগাড়ি এসে দাঁড়াল রাস্তা বন্ধের নিশানাটার কাছে। আমি যেখানে কাজ দেখছি সেখান থেকে ফার্লং দুই দূরে হ'বে। তবে রাস্তাটা সোজা থাকায় বেশ দেখতে পেলাম—

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে সাইন-পোস্টটা সরিয়ে দিল এবং আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। হর্ন দিতে দিতে তীব্র বেগে গাড়িটা এগিয়ে আসছে। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে মিস্ত্রি মজুররা পথ করে দিচ্ছে। আপাদমস্তক জ্বলে গেল আমার। রাস্তার পাশে শোয়ানো খালি ড্রামটা এনে রাখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে। নিজেও দাঁড়ালাম তার পাশে। কুলিরাও উঠে দাঁড়াল। গাড়িটা হর্ন দিতে দিতে এসে থামল আমার ফুট তিনেক দূরে। দেখলাম দুজন সাহেব আর একজন মেমসাহেব বসে আছে। ইংরাজী তখন বলতে পারিনা। সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে—ঐ যে তোমরা যাকে বল ক্লাস নাইন। তাই হিন্দিতে ধমক দিলাম ড্রাইভারকে। '—দেখতে পাওনা রাস্তা বন্ধ? অন্ধ নাকি তুমি?' নোটবই বার করে টুকে নিলাম গাড়ির নম্বর। ওকে বল্লাম ব্যাক করে গাড়ি পেছিয়ে নিয়ে যেতে। ডাইভারসন দিয়ে যেতে হবে।

ড্রাইভারও খেঁকিয়ে উঠল, 'দেখছ না দামী গাড়ি, নীচে নামলে কাদা লাগবে। আর তো এসেই গেছি। ড্রামটা সরাও।'

রুখে উঠলাম আমি। পাঁচকথা শুনিয়ে দিলাম। দামী গাড়ি বলে মাথা কিনেছে নাকি? বেটা বোধহয় ভেবেছে সাহেব-মেম দেখে ভিরমি খাবো আমি। আম্মো যশোরের বাঙাল। তেড়ে ধমক দিলাম। ড্রাইভার রুখে উঠল। তাকে থামিয়ে দিয়ে পিছনের সীটের মেমসাহেব বললে, 'এ বাবু, হমলোগকে যানে দো। বহুৎ জরুরী কাম হ্যায়।'

জরুরী কাম না হাতি। আপাদমস্তক জ্বলে গেল। নেহাৎ মেয়েছেলে—তাই শুধু বললাম, 'তা হয় না, মাপ করবেন।'

তখন তার পাশের সাহেবটা আমাকে কাছে ডেকে হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে দুখানা নোট। 'যানে দো হমলোগকে। গর্দামে যানে সে গাড়ি খরাব হো যায়গী।'

ছুঁড়ে দিলাম নোট দুটো ওর কোলে। কী ভেবেছে বেটারা। কালা আদমি মাত্রই কুত্তা? দু' টুকরো রুটি ফেলে দিলেই কুঁই কুঁই করবে? কিছুতেই

যেতে দেব না ওদের।

মেমসাহেবের মুখটা লাল হ'য়ে উঠেছে। বললে, 'চলাও!'

গাড়ি ঘরঘর করে স্টার্ট নিল। কিন্তু হলে কি হবে, রাস্তার মাঝখানে ড্রাম—বাকী রাস্তাটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছি আমি বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে, বাহুবদ্ধপাশ!

তখন নেমে এল ও পাশের লালমুখো বিরাটাকায় সাহেবটা। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। বেটার কোমরে ঝুলছে রিভলবার। ঝোলে ঝুলুক, আমারও পিছনে আছে দুশো কুলি—তাদের হাতে ধারালো গাঁইতি। হাতির মত গোদা গোদা পা ফেলে সাহেবটা এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। ঠিক মুখোমুখি নয়, আমার মাথাটা তার বুকের প্রায় কাছাকাছি। বললে, 'য়ু ওন্ট লেট আস গো?'

বললাম, 'নো, নেভার!'

সাহেব আমার কাঁধে সের দশেক ওজনের হাতখানা রেখে বললে 'ডু য়ু নো হু অ্যাম আই?'

বললাম 'নো। হমার জাননে কো কোই জরুরৎ নেহী।'

আমার কথায় কর্ণপাত না করে সাহেব বললে, 'আই এ্যাম দি চীফ এঞ্জিনিয়ার—বেঙ্গল পি. ডব্লু. ডি.!'

এর চেয়ে বজ্রপাত হলে ভাল ছিল!

চীফ এঞ্জিনিয়ারের নামটাই শুনেছি কেবল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এঞ্জিনিয়ারকেই জীবনে কখনও দেখিনি। এক্সিকিউটিভ একবার এসেছিলেন রাস্তা দেখতে। দুশো রোড কুলি সার দিয়ে সেলাম করেছিল তাঁকে। ওভারসিয়ার বাবুও তাঁর কাছে কেঁচোটি। অথচ এই ওভারসিয়ারকেই আমরা যমের মত ভয় করি। ওভারসিয়ার, এস. ডি. ও., ই. ই., এম. ই.—তার উপর নাকি থাকেন সি. ই.! ঈশ্বরকে না দেখেও আমরা যেমন তাঁর উপস্থিতিটা স্বীকার করে নিই—তেমনি কলকাতার কোন একটি ঘরে সি. ই. বলে একজন আছেন এটা পুঁথিগতভাবেই

জানা ছিল শুধু। সে দেবতাটি সাকার না নিরাকার জানা ছিল না। ভয়ে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।"

চৌধুরীসাহেবের ল্যাণ্ড-রোভারটা মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। হুংকার দিয়ে উঠলেন তিনি, "অব তুম মেরা গাড়িপর চঢ়, নেহী তো ম্যয় তুমারা উপর চঢ়্‌গা!"

চমকে উঠল ঋতব্রত। ব্যাপারটা কিছুই নয়। একসার গরুর গাড়ি আসছিল রাস্তার মাঝ বরাবর। একেবারে পাশ দেয়নি। পাশ কাটিয়ে রোড ক্রেশট থেকে নেমে অনায়াসেই যাওয়া চলত; কিন্তু সঞ্জীব চৌধুরী সে জাতীয় লোক নন। এক তিল পথ তিনি ছাড়বেন না মাঝরাস্তার। তাতে অ্যাকসিডেন্ট হয় সো ভি আচ্ছা! গরুর সিং-এ বনেটটা গিয়ে ঠেকল। ব্রেক কষে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। গাড়োয়ানের দোষ নেই; সে তাঁর গাড়ি আসছে দেখেনি। ফাঁকা পথ পেয়ে বেচারী ঘুমিয়ে নিচ্ছিল একটু। হঠাৎ শশব্যস্তে উঠে বসে গরুগুলোর ল্যাজ মলতে মলতে পাশে নামল। স্টার্ট দিলেন ফের চৌধুরী। গল্পেরও।

"কতদূর বলেছি? ও হ্যাঁ, চীফ এঞ্জিনিয়ারকে দেখে ঘাবড়ে গেছি। কিন্তু ঐ যে বললাম। আস্লো যশোরের বাঙাল! এক মিনিট পরে বললাম 'আপনাকে আমি চিনতাম না স্যর! সেলাম! কিন্তু তাহলেও বলব আপনারও যাওয়া উচিত নয় এই কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। কারণটা তো আপনিই ভাল জানেন।'

সাহেব আমার কাঁধটা ধরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিলেন। তারপর দুটো হাত পকেটে পুরলেন। আমার মনে হল বোধহয় আমার কলার-বোনটাই খুলে নিয়ে পকেটজাত করলেন তিনি। আমার দিকে তাকিয়ে ইংরাজীতে একটা কিছু বললেন। মনে হল 'ওঁয়াও! ওঁয়াও!'

ঈশ্বর জানেন কি বলেছিল সে। তার ভাষা তো বুঝিইনি, এমন কি ওটাতে আমাকে গালাগালিই দিলে, রাগ প্রকাশ করল, না, খুশি হল তাও বুঝলাম না।

গোদা গোদা পা ফেলে আবার গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়ি স্টার্ট নিলে। চীফ এঞ্জিনিয়ার শব্দটাই মালুম হয়ে থাক অথবা আমার সেলাম করাই লক্ষ্য করে থাক—মেট মুন্সি ততক্ষণে ড্রামটা সরিয়ে দিয়েছে। সামনের রাস্তা খোলা।

গোদা সাহেব ড্রাইভারকে কি বললে। পিছনের সাহেবের সঙ্গে কি কথাবার্তা হল। বিন্দু-বিসর্গও বুঝলাম না। শেষে গোদা সাহেব, মানে চীফ এঞ্জিনিয়ার আমায় কাছে ডাকলে। তখনও আমার কাঁধটা টনটন করছে। ভাবলাম কলার-বোনটা ফেরৎ দেবে বোধ হয়। জিজ্ঞাসা করলে, 'হোয়াট্‌স্ য়োর পোস্ট ?'

বললাম। দুই সাহেবে কি কথাবার্তা হল আবার। মনে হল পিছনের সাহেব আমার হয়ে কিছু সুপারিশ করছে। শেষে গোদা সাহেব রাজী হল যেন। ভাবলাম আমার কাঁধের হাড়খানাই ফেরৎ দেবার কথা হচ্ছে বুঝি। হঠাৎ পিছনের সাহেব পকেটে হাত চালিয়ে কি একটা সাদা মত বার করে আমার হাতে ফেরত দিল, বললে, 'মিট মি এ্যাট ক্যালকাটা।'

কাঁধের সাদা হাড়টা ফেরত নিলাম। গাড়ি স্টার্ট দিল—সামনে খোলা রাস্তা থাকলেও, অবাক কাণ্ড, গাড়ি ব্যাক করে ডাইভারসন্ হয়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছি। ছুটলাম তখনই ওভারসিয়ার বাবুর কাছে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পরদিনই এস. ডি. ও. সাহেবের অফিসে। সব শুনে সবাই অবাক। চীফ এঞ্জিনিয়ার যাবেন তা কেউ জানতো না। কোথায় গেলেন তিনি, কবে ফিরবেন কেউ খবর রাখে না। সাতদিন পরেও যখন তিনি ফিরলেন না তখন সবাই সন্দেহ প্রকাশ করল। আমি তখন কলার-বোনটা প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করলাম। আসলে সেটা পিছনের সাহেবের একটা নাম লেখা কার্ড। ঠিকানাও ছিল তাতে। নম্বরও দেখলাম। এস. ডি. ও. নম্বর জানতেন। সবাই আমার হঠকারিতার জন্য বাপান্ত করতে লাগল। মুখ বুজে গাল খেলাম সবার কাছে।"

বাধা দিয়ে শ্বতব্রত বললে, "তা হলে লাভ হল কি? চীফ এঞ্জিনিয়ারও গাল দিলে, তার ড্রাইভারও গাল দিলে—আবার সব শুনে আপনার অফিসের সবাইও গাল দিলে—"

সে কথায় কর্ণপাত না করে চৌধুরী সাহেব বলে চল্লেন, "কার্ড দেওয়া আর দেখা করার কথা যাকে বলি সেই তেড়ে মারতে আসে। ওখানে গেলে কয়েদ করে রাখবে। অপমানের শোধ নেবে। দিন সাতেক ইতস্তত করে একদিন ছুটি নিয়ে রওনা হলাম কলকাতামুখো। দেখিই না কি হয়। সেই আমার প্রথম পদার্পণ কলকাতায়। ঠিকানা খুঁজে গিয়ে পৌঁছলাম। বিরাট অফিস। টার প্রডাক্টস। সাহেব চিনতে পারলেন আমাকে। বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কত মাইনে পাই, কতদূর পড়েছি—বাড়িতে কে কে আছে ইত্যাদি। শেষে বললেন 'হমার কাছে কাজ করবে বাবু?'

রাজী হয়ে গেলাম। সেই থেকে এই ফার্মেই আছি আজ বত্রিশ বছর। আমার সততা আর একগুঁয়েমিতে মুগ্ধ হয়েছিল গ্রে সাহেব। ভীষণ ভালোবাসতো আমাকে। নাইট ক্লাসে সেই আমাকে ভর্তি করিয়ে দেয়। চাকরি করতে করতে পরীক্ষা দেওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে;—মায় এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফি-টাও দিয়েছিল। পরে অবশ্য স্কলারশিপের টাকাতেই পড়েছি আমি।

পরে জেনেছিলাম গ্রে-সাহেব চীফ এঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই সৎ কর্তব্যনিষ্ঠ ছেলেটিকে তুমি পুরস্কৃত করতে পার না? কোনও ইনক্রিমেণ্ট অথবা লিফ্‌ট্?'

চীফ বলেছিলেন, 'এটা তোমাদের মত প্রাইভেট ফার্ম নয় গ্রে, এখানে একটা নন-ম্যাট্রিককে তো আমি সাব-ওভারসিয়ার করতে পারি না।'

গ্রে বলেছিলেন, 'তাহলে ওকে দিয়ে দাও আমাকে। আমি ওকে দিয়ে প্রকৃত কাজ আদায় করে নেব। ও খাঁটি লোক। দেবে ওকে?'

'উইথ নো রিগ্রেট!'—হেসেছিলেন চীফ।

ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে আজ আমি উঠে এসেছি এইখানে। গ্রে সাহেবই অবশ্য এর জন্য প্রধানত দায়ী ;—কিন্তু তবু আমার মনে হয়—আমার উন্নতির মূলে রয়েছে সেই একদিনের গোঁয়ার্তুমি।"

ওদের গাড়ি তখন হাওড়া ব্রীজে উঠেছে।

স্বতব্রতের ডায়েরি থেকে খানকতক পাতা তুলে দিচ্ছি।

"কাল সকালে ক্যাম্পে ফিরে আসা গেল। পরশু সারা দিনটা চষে বেড়িয়েছি সারা কলকাতা। বন্ধু-বান্ধব যার বাড়িতেই গেছি খোঁজ নিতে—সে-ই অনুপস্থিত। এক একটা দিন এমনিই হয়। ভাগ্য যেন দিনের সবক'টি যাত্রাকে নিস্ফল করবার উদ্দেশ্যে আগে থেকেই ওদের সরিয়ে দেয়। রেখাদের বাড়িতে সকালে গিয়েছিলাম—তখন সে ছিল না। সন্ধ্যাবেলা আবার আসব বলে এসেছিলাম। অথচ দেখি সে সন্ধ্যায় সিনেমায় গেছে। রেখা যে আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান। চিঠিপত্রও লেখে না বহুদিন। সন্দেহ হচ্ছে আমার পূর্বের আশঙ্কা অমূলক নয়। আমার চিঠি পাওয়ার পরই সে মধুপুরে রওনা হয়। মধুপুরেই গিযেছিল কিনা কে জানে? হয়তো একটা Pleasure trip দিয়ে এল কোথাও অমল ঘোষের 'উইনসাম ম্যারো' সেজে! হবে নাই বা কেন? অমল ঘোষ বড়লোকের ছেলে। ব্রিফলেস হলে কি হবে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষই ব্যবস্থাটা পাকা করে গেছেন অধোস্তন চতুর্দশ পুরুষের অধোগমনের। সুতরাং রেখার মনের কথা আজ বোঝা সোজা। তার সব প্রহেলিকার অবসান হয়েছে। শ্রীমতী রেখা আজ আমার কাছে 'সরল-রেখাই', যদিও নগদ পেলাম তার প্রশ্নের বিস্তারটাই—জ্যামিতিক অর্থে। ভাল। খেলায় হারজিত আছেই—কিন্তু সাতখানা গোল খেলেও পরাজিত দলকে একবার খেলা সমাপ্তির টানা হুইশ্‌ল্‌টা শুনিয়ে দেওয়া হয়। আমার খেলা যে ফুরোল সেটা স্পষ্ট জানিয়ে হুইশ্‌ল্‌টা বাজিয়ে দেওয়ার ভদ্রতাটুকুও কি আমি আশা করতে পারি না?

কলকাতায় চাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও বোকা হলাম। তিনি কাজের কথাই আলোচনা করলেন শুধু। যে জন্যে কলকাতা গেলাম সে কথা বলবার উপক্রম করতেই ধমকে উঠলেন, 'আই ডোন্ট লাইক টু হিয়ার য়োর পারসোন্যাল ম্যাটার্স, বোস। এ্যাপার্ট ফ্রম সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল, আই হোপ য়ু হ্যাভ য়োর ওন সেন্স অব মর্যালিটি।'

এই সময় পিয়ন এসে দাখিল করল একটা ভিজিটিং কার্ড।

সেটা দেখে তিনি বললেন, 'আনে বোলো।'

তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ও প্রসঙ্গ চাপাই পড়ে গেল।

ক্যাম্পে যখন এসে পৌঁছলাম—মেজাজটা খিঁচিয়ে ছিল। আমার ঘরের সামনে এসে দেখি বিরাট জটলা। বারান্দায় একখানা চেয়ার পেতে দফাদার সাহেব আসীন। ঘটনাটা শোনা গেল। মুখরোচক তো বটেই—নাটকীয়ও! এরা সমবেত হয়েছেন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে—ক্যাম্পে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। রান্নাঘরের ভিতর উবুড় হয়ে পড়ে আছে কুসুম। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। শোনা গেল নাপিত ডেকে তার কেশ মুণ্ডন করা হয়েছে। শাস্তিটা সামান্যই—এই সেদিনও ইংল্যাণ্ডে ডাইনীদের পুড়িয়ে মারার নজির আছে। কুসুম দু নম্বর আসামী। প্রধান আসামীর দেখা পেলাম না—তাকে নিয়ে গেছে হাঁসপাতালে। রতন তো আমাকে দেখে হাউমাউ করে উঠল। তাকে থামিয়ে দিলাম। ঘটনাটা শোনা গেল দফাদারের মুখে। অপরাধ গুরুতর। এঁদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি না থাকলে এই রকম দুর্নীতি বন্ধ করা যেত না।

আগের দিন তারাপদকে বাস থেকে নামতে দেখেছিল ক্যাম্পের কয়েকটি সমাজসেবী উৎসাহী কর্মী। তারা খবর রাখে আমি কলকাতা গিয়েছি এবং আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রতনও গেছে গোলবাজারে যাত্রাদলের আসরে। কুসুমকে তার নির্দিষ্ট ব্যারাকে রাত দশটার সময়েও ফিরতে না দেখে এদের সন্দেহ হয়। অতঃপর অনুসন্ধান করা হয় আমার ঘরে। সেখানে দরমার দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল কুসুম ও তারাপদকে আপত্তিজনক অবস্থায়।

দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর হঠাৎ পাওয়া নির্জন সুযোগটা ওদের হয়তো একটু বেশী আত্মহারা করে দিয়েছিল। কারণ সমাজসেবীরা দরজার বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে দফাদার প্রমুখ গণ্যমান্য কয়েকজনকে নিয়ে আসবারও সময় পায়। মধ্যরাত্রে লণ্ঠনের আলোয়, সোরগোলে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকাটা। বিনা খরচায় সার্কাস দেখবার দর্শকের অভাব হয় না কোথাও। ভাঙা যাত্রার আসর থেকে রতনও ফিরে এসেছে সেই সময়।

কাল অত রাত্রে ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই আজ আমারই বারান্দায় বসেছে কোর্ট-মার্শাল! প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা সবাই হাজির। বিচারপতিই নাকি প্রধান সাক্ষী নিজে। বিচারে জুরীরা অর্থাৎ তাবৎ দর্শক আসামীদ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত করলেন। বকুলতলা রিলিফ ক্যাম্পের পেনালকোডে বলে এ অপরাধে পুরুষ অপরাধীকে ফরিয়াদী পক্ষের লোকেরা চাঁদা করে চপেটাঘাত বর্ষণ করবে এবং নারী অপরাধিনীর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না—শুধু তার মস্তক মুণ্ডন করা হবে। প্রথম শাস্তিটি বিচারের পূর্বে এবং দ্বিতীয়টি বিচারের পরে সম্পন্ন করাই প্রথা।

আমি আসবার আগেই পরামানিক দু নম্বর আসামীর শাস্তিবিধান সমাপ্ত করেছে। বারান্দার এক পাশে ধুলোকাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে মেঘকৃষ্ণ একরাশ চুল।

মনে পড়ল আর একদিনের কথা।···ছোট বোন কামিনী রোয়াকের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে দেখছিল বিস্ফারিত চোখে। উঠান ভরে গেছে এক গাঁ লোকে। ধুলোকাদায় উঠানের উপর বসে আছেন মা। তাঁর কোলে মাথা গুঁজে পড়ে আছে দিদি—একরাশ খোলা চুল লুটোচ্ছে কাদায়।

সেই একই দৃশ্য ;—তফাতের মধ্যে এখানে কাদামাখা চুলগুলো ওর দেহ-চ্যুত, এখানে নেই মায়ের কোলে মাথা গোঁজার সান্ত্বনা—আর বোধহয় তফাত এই যে এখানে বিচার করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে—এবারে গুণ্ডা কর্তৃক ধর্ষিতা নয় সে।

দফাদার বললেন, "মেয়েটাকে এখুনি চলে যেতে বল ক্যাম্প ছেড়ে। রাস্তায় গিয়ে বসে থাকুক। তারাপদ অবশ্য দু-চারদিন ক্যাম্পেই থাকবে এখন।"

কে একজন হুকুম তামিল করতে যাচ্ছিল। হয়তো ধরেই আনতো কুসুমকে। বাধা দিলে রতন। বললে, "বেশ তো। সাহেব তো এসে পড়েছেন। ব্যবস্থা উনিই করবেন এখন। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?" বেশ বাগিয়ে বললে কথাটা—সেই হাউমাউ ভাবখানা নেই। তার বাধা দেবার ভঙ্গিতে থতমত খেয়ে থেমে গেল লোকটা। কর্ণার্জুন যদি কখনও মঞ্চস্থ করি, কথা দিচ্ছি রতন, বিকর্ণর রোল তোর বাঁধা।

খেঁকিয়ে উঠল মারমুখী জনতা।

নরম সুরে হেসে দফাদারকে বললাম, "কেশাকর্ষণ পর্যায়টা তো সুসম্পন্নই হয়েছে—রাজসভার মাঝে বস্ত্রহরণ পর্বটা কি না করলেই নয়? সর্বসমক্ষে পথে আর তাকে নাই বার করলেন।"

দফাদার কথাটার জবাব দিলেন না। হয়তো বিচারকও আইনের দাস; এতটা করতে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছাও ছিল না। জবাব দিলেন ডেপুটি ক্যাম্প-সুপার ভৈরবচন্দ্র, "দুঃশাসনরা চেষ্টা করলেই কি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্ভব হয়? কলির কেষ্ট ঠাকুররা ঠিক সময় হাজিরা দেয়ই!"

সে কথায় কর্ণপাত না করে দফাদারকে বলি, "ওর মাথাটা কামিয়ে দেওয়াই বোধহয় চরম শাস্তি হয়েছে। এরা চলে যাক, আমি কুসুমের যাওয়ার জন্য গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করছি।"

"উঃ! কী দরদ রে"!—জনতার কণ্ঠ।

মাথা তুলে মনে হ'ল দ্বিতীয় সারি থেকে কথাটা বললে বড়খোকা।

আমি দফাদারকে বললাম, "এদের এখন যেতে বলুন।"

ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল বড়খোকা। "আমরা সরকারী জমিতে খারাইয়া আছি।"

এ উক্তিতে ক্যাম্প-সুপার দফাদার কোনও প্রতিবাদ করেন না। বুঝলাম

তাঁরও অনুমোদন রয়েছে কথাটায়। এবারও ধীরকণ্ঠে বললাম, "মিস্টার দফাদার, আশা করি আপনি এদের বুঝিয়ে দেবেন যে আমার বাড়ির সামনে কাউকে এভাবে হল্লা করতে আমি দেব না।"

দফাদার উঠে দাঁড়ালেন, "বেশ তো মেয়েটাকে আপনি বার করে দিন না কেন।"

"না, তা আমি দেব না।"

"কেন জানতে পারি কি?" প্রশ্নটা ভৈরবচন্দ্রের।

"আমার খুশি।"

অশ্লীলতম একটা ইঙ্গিত ভেসে এল ভীড়ের মধ্য থেকে। জনতার মধ্যে রয়েছে ঠিকাদারের লোক, মিস্ত্রি, মজুর, ওয়ার্ক-সরকারেরা। রতনও আছে। এবার ধৈর্যচ্যুতি হ'ল আমার—

"ক্যাম্পটা আপনার হ'তে পারে, এ ঘরখানা আমার। আমি দুঃখিত মিস্টার দফাদার, কিন্তু আপনি যখন এই সব কথা বরদাস্ত করছেন, তখন আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।"

দফাদার তখন দাওয়া থেকে নীচে নেমেছেন। বললেন, "আমি যাচ্ছি, কিন্তু কতদিন পরে মেয়েটিকে ছেড়ে দেবেন জানতে পারি কি?"

"পারেন। যতদিন না তারাপদ আরোগ্যলাভ করে, একমাসও হ'তে পারে, বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়।"

আবার একটা কি মন্তব্য শোনা গেল ভীড়ের মাঝে। এবার গর্জে উঠলেন দফাদার। ভীড় পাতলা হ'য়ে গেল। দফাদাররাও চলে গেলেন।

ঘরে এসে বসলাম। ক্যাম্পে এসে সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করেছি। একজন মাত্র বন্ধু পেয়েছিলাম ক্যাম্পে। খোয়ালাম আজ। মনটা আরও খারাপ হ'য়ে গেল। রতনকে বললাম কুসুমকে বলে দিতে সে যেন বাড়ির বাইরে না যায়। তার জন্য দুটি বেশী চাল দিতে বললাম হাঁড়িতে। রতন

বললে, "আজ একাদশী।"

রান্না কুসুমই করল। সামলে নিল সে নিজেকে, অল্পক্ষণেই। অনেক দুঃখের আগুনে পুড়ে কঠিন হ'য়েছে সে। অপমান তার অঙ্গের ভূষণ!

দুপুরে দেখতে গেলাম তারাপদকে। আমাকে দেখে কি বলতে গেল, পারল না। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ধারা। হাতখানা তুলে দেখাল—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানা।

ফিরে এলাম ঘরে। কাজে গেলাম না সারাদিন। চুপ করে পড়ে থাকলাম শুধু। কুসুমকে আমার বাড়িতেই রাখব যতদিন না ভালো হয় সে। এতে যে যত বাধা দিতে আসে আসুক, শুনব না। মনে পড়ল সঞ্জীব চৌধুরীর কথাগুলো। অফিসের ডাক নিয়ে এল রতন। চিঠি, চিঠি, আর চিঠি। বিল, প্রগ্রেস রিপোর্ট আর প্রোফর্মা। একখানা চিঠি এসেছে দেখলাম নতুন ধরনের। ক্যাম্প থেকে একটা দরখাস্তে জানানো হ'য়েছে এল/২৯ নম্বর ব্যারাকে কমলা নাম্নী একটি মেয়ের শ্লীলতাহানি করবার চেষ্টা করেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কোন স্টাফ। নাম উল্লেখ নেই—না অভিযোগকারীর না আসামীর। গোপনীয় ছাপ মার্কা সেটা এসেছে আমার কাছে অনুসন্ধান এবং রিপোর্ট করার নির্দেশ দিয়ে। এ ভালো কাজ হ'য়েছে আমার!

সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ভালো লাগে না। পায়ে পায়ে চললাম এল/২৯ ব্যারাকের উদ্দেশ্যে। আজও দেখলাম বৃদ্ধ বসে বিড়ি পাকাচ্ছেন—পাগলটা কয়েকটা কাককে খাওয়াচ্ছে উচ্ছিষ্ট ভাত। সামনের মাঠে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে, আর উড়ে উড়ে কাকগুলো খাচ্ছে তাই। মাঝে মাঝে উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠছে পাগলা। বড়খোকা নেই, কমলার মাকেও দেখলাম না। পার্টিশনটা গাঁথা শেষ হ'য়েছে দেখছি। কমলা একটা ছেঁড়া শাড়ির প্রান্ত সেলাই করছিল। আমাকে যে দেখেছে তার প্রমাণ পেলাম আমার দিকে ভুলেও একবার তাকালো না দেখে। অনুসন্ধানটা কি করে করা যায়?

কমলার মা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বসলাম গিয়ে বৃদ্ধের কাছে।

"আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।"

চশমাটা কপালের উপর তুলে, আমাকে দেখে বৃদ্ধ হকচকিয়ে গেলেন—"আউহাইন, আউহাইন, বউহাইন,—আর বইখানই বা কই?" উঠে দাঁড়ালেন তিনি শশব্যস্তে।

কাঠের একটা ছোট বাক্স টেনে ততক্ষণে আমি বসে পড়েছি। আলাপ হল বৃদ্ধের সঙ্গে। আদি বাড়ি মৈমনসিং জিলা, থানা বাজিতপুর, গ্রাম মামুদপুর। বিড়ির বাণ্ডিল আর কুলো ভর্তি তামাকপাতা সরিয়ে রেখে বৃদ্ধ ভালো হ'য়ে বসেন গল্প করতে। বৃদ্ধের নাম রামনিধি চৌধুরী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আসল উপাধি লাহিড়ী। তাঁর পৈত্রিক ব্যবসা পৌরহিত্য করা। ঘরে সাতপুরুষের ৺নারায়ণ ছিলেন। তাঁরই সেবা করতেন। বিশ-পঁচিশ ঘর বর্ধিষ্ণু যজমান ছিল। পাঁচ ঘর থেকে যা পেতেন তার উপর ছিল রানীপুরের জমিদারের মাসোহারা। গল্প বলতে বলতে মেতে উঠলেন বৃদ্ধ। যেন ফিরে গেছেন তিনি জন্মভূমিতে। প্রকাণ্ড চক্‌মেলান রানীপুরের জমিদারবাড়ি। সামনে বা'র মহল, এপাশে কাছারি—তারপর একটা বিরাট অঙ্গন পার হ'য়ে অন্দর মহলে আসতে হয়। বা'র বাড়ি আর অন্দর বাড়ির মাঝের অংশটায় গোল-পোস্ট পুঁতলে অনায়াসে ফুটবল খেলা চলে। অন্দর মহলেও বিরাট ব্যবস্থা। বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু আর ছোটবাবুর তরফ। প্রত্যেক তরফে কাজ করবার জন্যে আলাদা চাকর, আলাদা ঝি। এপাশে সমস্ত পশ্চিম দিকটা জুড়ে রান্নাঘর। পশ্চিম দিকের দীঘির পাড়ে রানীপুরের বর্তমান জমিদারের প্রপিতামহ বরেন্দ্রকিশোর লাহিড়ী চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত "ধর্মরাজ" শিবলিঙ্গ। প্রচলিত নাম "বুড়ো রাজা"। বরেন্দ্রকিশোর এ পরিবারে দত্তক এসেছিলেন বর্ধমান থেকে। শিবের নামকরণ থেকেই সেটা অনুমান করা যায়। সরোবরের ভিতর একটা নকল দ্বীপ তার মাঝখানে শ্বেত পাথরের একটা বাঁধানো চত্বর। কাঠের সেতু বেয়ে দ্বীপে যাওয়া যায়।

মেজবাবুর ছিল বাগানের শখ—তাঁর লাগানো পদ্মফুলে লাল হ'য়ে থাকতো দীঘিটা।

বাধা দিয়ে বলি, "জমিদারের কথা থাক, আপনার কথা বলুন।"

হাসেন সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ, "আমার কথা আর কি কইতাম বাবা? আছ্‌লাম জমিদারের পুষ্য, অহন হৈছি সরকারের পুষ্য।"

যেন একটা চরম রসিকতা হ'ল। প্রাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি হা হা ক'রে। হাসির ধমকে কমলা একবার মুখ তুলে চাইল শুধু। আবার শুরু করেন তাঁর গল্প। দেশের কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

বর্ষায় ভেসে যায় দেশ। যে মাঠে কপাটি খেলত ছেলেরা ফাগুন-চৈত্র মাসে, সেখানে পাঁচ সাত হাত ঘোলা জলের ঘূর্নিপাক ভেসে চলে। এপাড়া ওপাড়া যাতায়াত করতে হয় ডিঙি নৌকায়। তর্‌ তর্‌ করে বাড়ে জল। সন্ধ্যায় দেখা দৃশ্য বদলে যায় সকালে। জলের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ধানের চারা। সেই ধান যখন পাকে, নৌকা ক'রে কাটতে যেতে হয়। তলাকার খড়গুলো অবশ্য পায় না চাষীরা। পচে যায় জলে। তা যাক, ধানই মা লক্ষ্মী—সেখানে মায়ের অকৃপণ দান।

সেই জল একদিন সরে। তরতরিয়ে সরে যায় গৈরিক বসনা চঞ্চলা মেয়েটি। পলিমাটির চাদর মুড়ি দিয়ে তলা থেকে দেখা দেয় তলাকার মাটি। আর সেই সঙ্গে আকাশে এসে জোট পাকায় পুঞ্জ পুঞ্জ তুলোপেঁজা মেঘ। নৌকা ছেড়ে পথে পা দেয় মানুষ। এই মহালয়েই হয় মায়ের বোধন। সে ৺মহাপূজার আনন্দ কোথায় পাবেন?

গলা ভারি হ'য়ে আসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের। উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকান তিনি। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠেছে মায়ের মূর্তি,—'মা যা ছিলেন।'

আমার দেরি হ'য়ে যায়। বাধ্য হ'য়ে বৃদ্ধকেই জিজ্ঞাসা করি তাঁদের ব্যারাকে আমার কোনও কর্মচারী কখনও কোন দুর্ব্যবহার করেছে কিনা। বৃদ্ধ বিস্মিত হন, বলেন, "কই না।"

কমলার মা তখনও ফেরেন নি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আমি উঠি। বৃদ্ধ উঠে হাত দুটি জোড় করেন। আমি কমলার দিকে এগিয়ে আসি। সেও উঠে দাঁড়ায়।

"তোমার মাকে ব'লত সময়মত আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে।"

"মার যাওয়া সম্ভবপর হবে না।"

নত নয়নেই বলল কথা ক'টা। মনে পড়লো তার মা'র সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিন ক'টা কড়া কথা বলেছিলাম। ও। তাই উনি যেতে পারবেন না। বললাম, "খুব পারবেন। এই ত আমি এসেছি তাঁর কাছেই। তিনি নেই তাই ফিরে যাচ্ছি। তুমি তাঁকে বল কাল একবার আমার ওখানে যেতে।"

"তাঁর যাওয়া সম্ভব নয়—তাঁর শরীর খারাপ।"

স্পষ্টই বোঝা যায় মিথ্যা কথা বলছে কমলা—নাহ'লে তার মা বাইরে বেড়াত না এই সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাগ হ'য়ে গেল। বললাম, "ভালো কথা। তবে কর্তব্যটা এখানেই সেরে যাই। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। আমার কোন কর্মচারী তোমার, মানে, তোমাদের উপর কোনও দুর্ব্যবহার করেছে কি?"

"দুর্ব্যবহার?"

"হ্যাঁ, মানে কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আছে তোমার?"

"কেন বলুন তো?" চোখে চোখে চাইল কমলা স্পষ্ট ক'রে।

"তাহ'লে আমি তার প্রতিবিধান করতাম।"

একমিনিট চুপ ক'রে রইল কমলা। একটু ইতস্তত করে বললে, "ক্যাম্পে এতলোক থাকতে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে এ সন্দেহ হ'ল কেন আপনার?"

"কারণটা তো বোঝই; এবং সে সম্বন্ধে তোমাকে তো বেশ সচেতনই মনে হয়।"

কমলার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠল ক্ষণিকের জন্যে—কিন্তু আঘাতটা সে ফিরিয়ে দিলে দৃঢ়স্বরে, "সে সম্বন্ধে সচেতন না হ'য়ে উপায় কি ? আপনারা পাঁচজনেই তো আরও সচেতন ক'রে তুলছেন আমায় !"

আশ্চর্য ! নতমুখী মেয়েটাকে যতটা লাজুক, যতটা সাধারণ মনে হয়েছিল সে তো তা নয় ! ভেবেছিলাম আমাকে অগ্রসর হ'য়ে কথা বলতে দেখেই বুঝি জড়পুঁটুলির মত শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ করবে। তা তো নয়ই, বরং কাটা কাটা কথায় আঘাত করতেও ছাড়ে না। বললাম, "আমরা পাঁচজন ? অর্থাৎ আমিও ! তোমার বড় বড় চোখ দুটোয় তো অনেক কিছুই ধরা পড়ে।" বলেই দংশন করলাম জিহ্বা ! এ কথাটা কেন বললাম ! ছি ছি ! মেয়েটা কি ভাবল ?

কি যে ভাবল তা বোঝা গেল পরক্ষণেই। দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটি, "নিশ্চয়ই ! কেন নয় ? ক্যাম্পের আর কোনও ঘরে তো পার্টিশন হ'তে দেখলাম না ?…যাই হোক, আপনি অনেক উঁচুতে ; আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার শোভা পায় না। আপনার প্রশ্ন ছিল কনস্ট্রাকসন ডিপার্টমেন্টের কেউ আমার প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করেছে কিনা। আমার জবাবটাও শুনে যান। হ্যাঁ করেছে। তবে সে অভিযোগ আমি এমন কোনও অফিসারের কাছে করতে চাই যিনি অপরিচিতা যুবতীর চোখ বড় বড় কিনা তা লক্ষ্য করেন না।"

কানে কে যেন সিসা ঢেলে দিল। ক্যাম্পে এসে ঝগড়া করেছি অনেকের সঙ্গেই। মাথা উঁচু ক'রে প্রত্যাঘাত করেছি সকলকেই। অথচ এই এক ফোঁটা মেয়েটার কাছে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। কোনরকমে বললাম, "তুমি আমায় ক্ষমা ক'র। আমি সেভাবে কথাটা বলিনি। হয়তো অন্যায়ই হ'য়েছে আমার ও কথা বলা। তবু বিশ্বাস কর তোমাকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না আমার।"

মাথা নীচু করে ফিরে এলাম। বৃদ্ধ রামনিধি তখনও বসে আপন মনে

বিড়ি পাকাচ্ছেন। পাগলটা বসে আছে বাইরে।

ঘরে ফিরে এলাম যখন, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। ক্যাম্পের এখানে ওখানে শাঁখ বাজছে—কোথায় যেন কাঁসর-ঘন্টাও বাজছে। যেন ক্যাম্প নয়, এটা গ্রাম! দেখি ঘরের সামনে একটি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর শুয়ে আছে তারাপদ। আমার প্রত্যাবর্তনের জন্যেই ওরা অপেক্ষা করছিল বোধ করি। আমি আসতেই কুসুম বেরিয়ে এসে আমাকে ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম করল। তারপর গরুর গাড়িতে তারাপদর মাথার কাছে গিয়ে বসল। মালপত্র যে ক'টি ছিল আগেই তোলা হ'য়েছে গাড়িতে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

বুঝলাম রতনকে দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়েছে কুসুম। ডেকে ধমক দিলাম রতনকে, সে কেন জানায়নি আমাকে পূর্বাহ্নে। রতন চুপ করে গাল শুনল। বোধহয় হতভাগার ধারণায় কুসুমের চলে যাওয়াটাই তার মনিবের পক্ষে মঙ্গলকর মনে হ'য়েছে। এবং এও সে মনে করেছিল আগে জানলে আমি বাধা দিতে পারি।

রাত্রে আহারাদির পর রতন একটি বন্ধ খাম এনে দিল আমাকে। কুসুম এটা নাকি আমাকে দিতে বলে গেছে। খুলে দেখি তার মধ্যে রয়েছে একখানি চিঠি আর একটি ফটো। ফটোখানা ডায়েরিতে ধরে রাখা যাবে না তাই চিঠিখানাই শুধু তুলে দিলাম।

চিঠিখানা সত্যিই আমাকে বিহ্বল করেছে। এই তাহলে কুসুমের ইতিহাস? আমার ক্যাম্প-জীবনে কুসুমের নাটক এখানেই শেষ। তাই ভাবছি নাটকটা বিয়োগান্তক, না মিলনান্তক? মেলোড্রামা নয় তো?

'শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার দয়া ও দাক্ষিণ্য জীবনে ভুলিব না। আমার জীবনের অনেক

কথাই রতনদা আপনাকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছে জানি,—নিজের কানেও কিছু শুনিয়াছি। কিন্তু একটা কথা রতনকে আমি বলি নাই, কাহাকেও বলি নাই। বলিবার উপায় ছিল না। আপনাকে আজ তাহা না বলিয়া যাইতে পারিতেছি না। কারণ সত্যটা আপনার নিকট গোপন করিয়া গেলে আপনার নিকট একজন অযথা মিথ্যাবাদী থাকিয়া যাইবেন। আমি ঘৃণ্য জীব—আমার কথা ভাবি না—কিন্তু উনি আপনাকে মিথ্যা বলেন নাই। আমার সহিত তাঁহার কোনও অবৈধ সম্পর্ক নাই।

আমি জানি আমার একথা বিশ্বাস করা আজ কঠিন। তাই প্রমাণ-স্বরূপ এই ফটোখানি রাখিয়া গেলাম। এটি আমার বিবাহের পরদিন আমার দাদা তারাপদ উঠাইয়াছিলেন। আমার এপাশে মা, পিছনে হরিহর গাঙ্গুলী মহাশয়। দাদা ফটো তুলিয়াছিলেন—চিত্রে তিনি নাই।

ফটো দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যাঁহাকে আপনি তারাপদ নামে চিনেন তিনিই আমার স্বামী। তাঁহার আসল নাম বিশ্বনাথ। আমার দাদা পথেই মারা যান। পথে শুনিয়াছিলাম আমার স্বামী মারা গিয়াছেন। অনাথা বিধবা বলিয়া পি. এল. কার্ড পাই এবং ক্যাম্পে আশ্রয় পাই। আমার স্বামী গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘদিন পরে খুঁজিতে খুঁজিতে আমার সাক্ষাৎ পান এই ক্যাম্পে। তখন তাঁহার যক্ষা হইয়াছে। ফেরারী আসামী বলিয়া এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য রোজগারের কোনও ব্যবস্থাই তিনি করিতে পারেন নাই। তাই আমার বৈধব্য-বেশ ঘুচাইতে পারি নাই। আশা ছিল শীঘ্রই স্বামীপুত্র লইয়া আবার সংসার পাতিতে পারিব ; কিন্তু আজ যে অবস্থায় ওনাকে লইয়া যাইতেছি—ভয় হয় এ বেশ পরিবর্তনের সুযোগ আর ইহজীবনে আসিবে না।

এ জীবনে এ কলঙ্কিনীর মুখ আর কখনও দেখিবেন না। বিচারে যাঁহারা আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু বলিতে পারেন কোন্ পাপে আজ আমরা এই অপরাধে অপরাধী ?

আপনার সৌজন্য ও মহানুভবতার কথা জীবনে ভুলিব না।

—ইতি প্রণতা হতভাগিনী কুসুম।

পুঃ—ফটোখানি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন।”

কুসুমের শেষ অনুরোধ রাখেনি ঋতব্রত। তার কাছে সেই ফটোখানা দেখেছিলাম। বরবধূ বেশে কুসুম ও বিশ্বনাথ। ঋতব্রত বলেছিল গালের ঐ আঁচিলটা আর মুখের আদলটা না থাকলে বিশ্বনাথকে চেনাই যায় না ফটো দেখে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবাপুরুষের ফটো। বরকণের ছবি।

ক্যাম্পের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। মেমপাড়ার ঘরগুলো সবই সারানো হ'য়ে গেছে। বকুলতলার সমস্ত ঘরই মেরামত শেষ হয়েছে। কাজ জোর চলেছে এখন গলাদ' অঞ্চলে। স্টেশন রোড থেকে গোলবাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলটায় এখন কাজের চাপ বেশি। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখে ঋতব্রত। একঘেয়ে কাজে বিরক্তি আসে তার। বর্ষা ভালো ভাবেই নেমে গেছে। দফাদারের ঘরটা এখনও ছাওয়া হয়নি। তিনি দেননি। বৃষ্টির মধ্যেই মালপত্র টানাটানি করেন। হাসপাতালটা সারানো হয়েছে। লেডিজ ওয়েটিং রুমটা তৈরি হয়েছে ; ডাক্তারের জন্যে একটি বাড়তি চাকরের ঘরও তোলা হয়েছে। বিশেষ আদেশ আনিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। বেশ ঘটা করে নতুন ঘরটির উদ্বোধন করলেন ডাক্তার সাধুচরণ। এক সন্ধ্যায় নৈশ ভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন কয়েকজন বন্ধুকে। দফাদার অবশ্য সেদিন কলকাতা গিয়েছিলেন। ডাক্তারের তাতে খুব অসুবিধা হয়নি অবশ্য। রামশরণ তার ইয়ারবন্ধু নিয়ে এসেছিল। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি-সুপার ভৈরবচন্দ্র। অনেক রাত পর্যন্ত পানাহার চলেছিল। গুজব, নিমন্ত্রণকর্তা ডাক্তারবাবু হলেও সমস্ত খরচ রামশরণের।

ক্যাম্পের একটানা জীবনে বৈচিত্র্য নেই। ভীড় হয় ডোল অফিসের

কাউন্টারে। কার্ডে দাগ দিয়ে হিসাব করে টাকা দেন ললিতবাবু—ডোল ক্লার্ক। মাথাপিছু চার টাকা নয় আনা করে পায় প্রাপ্তবয়স্করা একপক্ষকালের জন্যে। ছোটরা পায় তিন টাকা দুই পয়সা। প্রাপ্তবয়স্কের সংজ্ঞাটা এখানে বিচিত্র। আট বছর বয়স হলেই এরা সাবালক পি. এল.। এই আট বছর বয়স হয়েছে কি না এ নিয়ে কি বাক্-বিতণ্ডা হয় এক একদিন।

ক্যাস ডোলের অফিসের উল্টোদিকে রেশনের গুদাম। থলি ভরে রেশনও নিয়ে যায় কার্ডে লিখিয়ে। দু' সের চাল, দু' সের আটা আর চৌদ্দ ছটাক ডাল। পনের দিনের রসদ। আট বছরের কম বয়স হলে অর্ধেক রেশন। রেশনের গুদামে ইঁদুরের গর্তটা আর কিছুতেই বন্ধ করতে পারলে না ঋতব্রত। সমস্ত মেজেটা খুঁড়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চার ইঞ্চি সিমেন্ট কংক্রিট করে দিল চার : দুই : এক মশলা দিয়ে। অথচ দুর্দমনীয় ইঁদুরের দল এই কুলিশকঠোর কংক্রিট ভেদ করে উঠে আসে। এ নিয়ে বহুবার বকাবকি শুনতে হয়েছে তাকে। কিন্তু ইঁদুরগুলোও নাছোড়বান্দা। ছেনি নয়, হাতুড়ি নয়, শুধু নোখ আর দাঁত দিয়েই ওরা অসম্ভবকে সম্ভব করে চলেছে। এখনও প্রতি মাসে ইঁদুরের খাতে একটা বিরাট অঙ্ক খরচ লেখা হয়। বড় বড় চিঠি আসছে কৈফিয়ৎ তলব করে—নিশ্চয়ই ঠিকমত মশলা দেওয়া হয়নি, না হলে কি করে গর্ত হয়?

মন্থরগতিতে চলে ক্যাম্পের জীবন। দিন আনে, দিন খরচ করে ওরা। কোনও ভাবনা নেই, কোনও চিন্তা নেই। অসুখ হলে ভগবানকে ডাকে, ডাক্তার ডাকে না। সন্তান হলে প্রথম কর্তব্য হল কার্ডে লিখিয়ে নেওয়া—মরে গেলেও হাঙ্গামা নেই—খবর দিয়ে আসে ক্যাম্প-অফিসে। ওদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চাল-চুলো-ঘর-বাড়ি কিছুরই বালাই নেই। একেবারে কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। কিন্তু ঋতব্রতের মনে হয় সবচেয়ে বড় 'নেই'টা হচ্ছে এদের ভবিষ্যতের চিন্তা। ওদের জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা যেন পড়ে গেছে ক্যাম্পে ঢোকার পরেই। আর কারও কিছু করণীয় নেই—

অভ্যাসমত দিনে কয়েকবার হাহুতাশ করা ছাড়া। মীরাবাঈ যেমন তনুমন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন কৃষ্ণে—এরা তেমনি সমস্ত সমর্পণ করেছে সরকারকে। দায় ঝক্কি নেই কোন।

দীনতম দিনমজুর, দরিদ্রতম কৃষক, কলকাতার ফুটপাতে শায়িত ভিক্ষুককেও দেখেছে সে। তাদেরও থাকে আয়ের চিন্তা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এদের তাও নেই। এদের তুলনায় কয়েদীদের জীবনও ভাল, বরণীয় কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পের জীবন। প্রথম জন স্বপ্ন দেখে মুক্তির দিনের, দ্বিতীয় জন প্রত্যাশা করে যুদ্ধাবসানের। ফাঁসীর আসামীরও থাকে একটা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিণতি।

হঠাৎ নিজের উপরই বিরক্ত হয় ঋতব্রত। সে কি অন্যায় করছে না এদের প্রতি? ঐ তো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামনিধি চৌধুরী বিড়ি বানাচ্ছেন—ঐ তো পীচের রাস্তার উপর বিছিয়ে দিয়ে ধান শুকোচ্ছে ওরা। গৃহসংলগ্ন একমুঠো জমিতে লাউ-কুমড়ো-ঢ্যাড়সের গাছ লাগিয়েছে সবাই। বাঁচবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা কি ওদের কম? এই পরিবেশেও তো পঁচিশে বৈশাখে স্মরণ করেছে কবিকে—যখন তার মনেও ছিল না সেকথা।

এদের জন্যে মাসে মাসে বছরে বছরে অপর্যাপ্ত হস্তে সরকার খরচ করে চলেছে। এদের প্রয়োজনের তুলনায় হয়তো পর্যাপ্ত নয়, তবে সরকারের তহবিলের পক্ষে তা ক্ষমতার অতিরিক্ত। তাই তো এরা আজও প্রাণে বেঁচে আছে। কিন্তু এ বাঁচার শেষ কোথায়?

আট-দশ বছরের যে নাবালক ছেলেটি মায়ের হাত ধরে একদিন ঢুকেছিল ক্যাম্পে আজ সে হয়তো পনের-ষোল বছরের প্রাণচঞ্চল কিশোর। তবু আজও সে ডোলভুক্ পি. এল.। চল্লিশ বছরের পঙ্গু স্বামীটি যখন স্ত্রীর হাত ধরে ক্যাম্পের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন তখনও তিনি ছিলেন পি. এল.—আজও তাই। কিন্তু এই ছ' সাত বছরে তিনি যে তিনটি রুগ্ন শিশুকে পৃথিবীর আলোকে নিয়ে এলেন, তারাও পি. এল.। এই অনন্তপথযাত্রীদের শেষ তীর্থ কোথায়?

"স্যার।" রতন এসে দাঁড়িয়েছে।

"কিরে?"

"কমলা এসেছে স্যার। আপনার সঙ্গে দেখা করবে।"

"কমলা? এখানে? না তার মা?"

"না স্যার, কমলা নিজেই এসেছে।"

"ও আচ্ছা, ডেকে দে।"

কমলা এসে প্রবেশ করে। মলিন শাড়ি একখানি সাধারণ করে পরা। গায়ে একটি ব্লাউজ। মাথার চুলগুলি রুক্ষ। বোধহয় কয়েকদিন তেল মাখে না, অথবা সাবান দিয়ে মাথা ঘষেছে। রতন ওকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছিল—ঋতব্রত ডেকে বললে ওর বিছানাটা পেতে দিতে। রতন বিছানা পাততে থাকে। নির্জন ঘরে কমলার সঙ্গে কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল বোধহয়।

"বস।" বললে ঋতব্রত।

কমলা বসল না। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আঁচলটা পাকাতে লাগল শুধু।

"বল, কি বলবে?"

একটু ইতস্তত করে কমলা। আশে পাশে তাকায়। তারপর বলে, "আই ওয়াণ্ট টু স্পিক ইউ এলোন।"

ইংরাজী শুদ্ধ নয়, উচ্চারণও তথৈবচ। তবু ওর এ কথায় অবাক হল ঋতব্রত। এতটা সপ্রতিভ ভাব যেন আশা করেনি। সময় নেবার জন্যে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এনে ধরালো একটা। রতন বিছানা পেতে বেরিয়ে যায়।

"এবার বলো। তোমার মাকে নিয়ে এলে না কেন সঙ্গে করে? একা তোমার আসাটা ঠিক হয়নি। জানোই তো ক্যাম্পের ব্যাপার।"

"মা আসতে পারতেন না। তিনি আজ আঠারো দিন হাঁসপাতালে।"

"হাঁসপাতালে? কেন, কি হয়েছে তাঁর?"

"তা জানি না। তবে তিনি আর বোধহয় বাঁচবেন না।"

"কেন, এমন কি হয়েছে তাঁর? রোগটা কি?"

"দারিদ্র্য এবং দুর্ভাবনা বোধহয়। আরও উপসর্গ আছে।"

দু'জনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঋতব্রতই বললে, "কই, তুমি তো সেদিনও বলনি কিছু?"

"আপনি তো জানতে চাননি।"

তা বটে! মা যে অসুস্থ এবং হাঁসপাতালে পড়ে এ খবর সম্পূর্ণ অপরিচিত তাকে জানাবার কি প্রয়োজন? বললে, "যাক্, আমাকে কি বলবে?"

ইতস্তত করে কমলা।

"তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো। কোন সঙ্কোচ করার প্রয়োজন নেই। সেদিন তুমি আমার উপর রাগ করেছিলে। হঠাৎ আমিও বোধহয় বেফাঁস কিছুই বলে ফেলেছিলাম—কিন্তু আমি সে জাতীয় লোক নই।"

"না না, সেজন্যে আমি কিছু মনে করিনি সেদিন।"

"করেছিলে। না হলে কে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল আমাকে জানালে না কেন?"

বড় বড় চোখ দুটি তুললে কমলা। চোখাচোখি হল ঋতব্রতের সঙ্গে। সত্যিই কমলা সুন্দরী। কিন্তু না। ঋতব্রত ওকথা ভাববে না আর!

"আপনার কর্মচারীরা কেউই আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেনি।"

"এ তুমি মিথ্যা কথা বলছ।"

"মিথ্যা কথা আমি বলি না।"

"বলো। সেদিন বললে কেউ তোমাকে অপমান করেছে;—আজ বলছ কেউই করেনি। একটা তো মিথ্যা নিশ্চয়ই।"

আবার চোখাচোখি হল দু'জনের। হেসে ফেললে কমলা, "একটাও মিথ্যা কথা নয়। সেদিন রাগ করে বলেছিলাম। আপনাকেই 'মীন্'

করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, আপনি যা কিছু করেছেন আমার ভালোর জন্যেই করেছেন।"

"বেশ, এবার তা হলে বলো তোমার বক্তব্য। না না, কোনও সঙ্কোচ করার দরকার নেই। তোমার বড় ভাই থাকলে যে ভাবে বলতে সেইভাবেই খোলাখুলি বল তোমার বক্তব্য—"

"আপনি···আপনি···আমাকে অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ? অন্য কোনও ব্যারাকে—"

"অন্য কোনও ব্যারাকে ? কেন বল তো ?"

"কারণ তো আপনি জানেনই। যে কারণে নিজের পয়সায় পার্টিশন করিয়ে দিলেন। মা আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হাঁসপাতালে। ওখানে থাকা আমার পক্ষে আর এক রাত্রিও সম্ভব নয়। প্রথম দিকে লতিকাদি—সেই যে স্বামী-স্ত্রী পরিবার—তিনি এসে আমার দিকে শুতেন। আজ চার পাঁচদিন সুবলবাবু, মানে লতিকাদির স্বামীর, বুকের বেদনাটা বেড়েছে—জ্বরও হয়। তাই উনি আর শুতে আসছেন না। এ ক'রাত একেবারে···মানে··· আপনি একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না আমার অন্য কোনও ব্যারাকে যাওয়ার, যেখানে···মানে···মেয়েছেলেই বেশি ?"

"তা আমি কি করব ? এসব ব্যাপারে দফাদার সাহেবের কাছে যেতে হবে।"

"দফাদার সাহেব ছুটিতে আছেন। এখন ডেপুটি-সুপার ভৈরববাবু অফিসিয়েট করছেন। দফাদার সাহেব থাকলে কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ভৈরবচন্দ্র···মানে···তিনি নিজেই একটু···ইয়ে প্রকৃতির।"

খেঁকিয়ে উঠল ঋতব্রত, "হোন ইয়ে প্রকৃতির। তোমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তো এমন কিছু নয় ;—এটুকুও কি তিনি করবেন না মনে কর তুমি অনুরোধ করলে ?"

কমলা প্রথমে ওর গলার আওয়াজে চমকে উঠেছিল। পরক্ষণেই বুঝলে ধমকটা তাকে নয়—ভৈরবচন্দ্রের উদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য। তাই হেসে বল্লে,

"অনুরোধ করবারও দরকার হবে না। আমি না বলতেই তিনি অন্য ভালো ঘরে আমাকে সরাবার ব্যবস্থা করতে উন্মুখ।"

"তবে তো মিটেই গেল। সেখানে গেলেই পারো—"

"সেখানে যেতে পারলে আর আপনার কাছে আসব কেন? এক গা গহনা আর আজীবনের ভরণপোষণ ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে আপনার কাছে এ অনুরোধ নিয়ে আসার কারণ আছে কিছু নিশ্চয়ই!"

"ও! ওটা আমি বুঝতে পারিনি!"

খানিকটা পরে বল্লে, "আচ্ছা আমি ভেবে দেখছি কি করতে পারি। তোমাকে একটা দরখাস্ত করতে হ'বে। আমি লিখে দেব তুমি সই করবে খালি। এক জাতীয় রিলিফ ক্যাম্প আছে, যেখানে শুধু মেয়েরাই থাকে—সেই রকম ক্যাম্পে চলে যাবার দরখাস্ত দিতে হ'বে একটা।" কমলা তবুও চলে গেল না।

"আরও কিছু বলবে আমাকে?"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা বলছিলাম। ইয়ে…"

"বলো।"

"যতদিন না কিছু ব্যবস্থা হয় ততদিন রতনদা আমার ওখানে রাত্রে গিয়ে শুলে আপনার অসুবিধা হবে কি?"

"রতন? আমার পিয়ন? ওকে তুমি কতটুকু চেন?"

"যা চিনি তাই যথেষ্ট। রতনদা আমার সব কথাই জানে।"

"তবে তার সামনে বলছিলেনা কেন?"

"রতনদা শুধু বড়খোকার কথাই জানে। বড়খোকা যে আসলে আরও বড় একদল লোকের আড়কাঠি তা সে জানে না।"

এটা ঋতব্রতরও জানা ছিল না। বড়খোকা লোকটি যে এতদূর ক্ষমতাশালী, তা তারও ছিল অজানা। তাই কি সেদিন দফাদার সাহেব তাকে ঘাঁটাতে সাহস করেন নি?

"রতনদা ওখানে শুলে অসুবিধা হ'বে কি আপনার ?"

"বিন্দুমাত্র না। তবে অনুরোধটা তুমিই তাকে ক'র। তার আপত্তি না থাকলেই হ'ল।"

ঋতব্রত ভাবছিল ক্রমশঃ তার জ্ঞানোদয় হচ্ছে বুঝিবা। ক্যাম্পের অনেকের স্বরূপই সে বুঝতে পেরেছে। বুঝেছে এখানে কিভাবে সাবধানে চলতে হয়। তাই নিজের ঘরে কমলার সঙ্গে কথা বলার সময় রতনকেও আটকে রাখতে চেয়েছিল। অভিজ্ঞতা বাড়ে মানুষের ক্রমশই।

সে ভুল তার ভাঙল পরদিনই। এল/২৯ ব্যারাকে কাল রাত্রে চুরি হ'য়ে গেছে। চুরি গেছে বড়খোকার বাক্স থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট। কোনও রকমে মাথাটা বাঁচিয়ে রতন পালিয়ে এসে খবর দিল ঋতব্রতকে। খবর পেয়ে ঋতব্রতও গিয়েছিল ঐ ব্যারাকে। সেখানে বড়খোকা সদলবলে উপস্থিত। শুনিয়ে দিল ওকে সবাই পাঁচকথা। যেমন মনিব তেমনি চাকর হ'বে তো ?…সাহেব যদি বাড়িতে বিধবা মেয়েমানুষ রেখে ফুর্তি করতে পারে, তবে তার পিয়নই বা কেন একরাত ব্যারাকে ফুর্তি করে যাবে না। ‥তা, বেটা বিনি পয়সায় মজা লুটছিস লোট…টাকা চুরি করিস কেন ?

সেখান থেকে ঋতব্রত গেল ক্যাম্প অফিসে। অফিসের ইনচার্জ এখন দফাদার নন। ভৈরবচন্দ্র। সাধুচরণের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন তিনি। ঘাঘী ও ঘুঘু! ভৈরবচন্দ্র উল্টে অভিযোগ করলেন, "তা আপনার পিয়ন ক্যাম্পে রাত কাটায় কেন ? চুরি করা না করা পরের কথা!"

"পিয়ন আমাকে জানিয়ে গিয়েছিল। আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি ? আশা করি পুলিস এন্‌কোয়ারিতেও আপনি একথা বলবেন ?"

"পুলিশ এন্‌কোয়ারী ? সেটা কেন ?"

"আমরা থানায় খবর দিয়েছি। আচ্ছা, কাল রাত্রে কি কমলা বলে মেয়েটি আপনার ঘরে এসেছিল ?"

ঋতব্রত বুঝলে ব্যাপারটা গড়াবে অনেকদূর। না ভেবে চিন্তে কিছু করা উচিত নয়। এরা রতনকে গাঁথতে চায় না, তাকেই জড়াতে চায়! না হ'লে প্রকাশ্য দিবালোককে 'রাত' বলে উল্লেখ করবে কেন?

কোনও জবাব না দিয়ে ঋতব্রত ফিরে এল ঘরে। একটু পরেই হয়তো দারোগা আসবে। হয়তো চালান দেবে রতনকে। তাকে অবশ্য বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাবে না। গেজেটেড্ অফিসার সে। তবে পাঁচজনের সামনে দুটো বাঁকা ইঙ্গিত করলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? সাধুচরণ এবং ভৈরবচন্দ্র যখন এ জাতীয় কারবার চালাচ্ছেন ক্যাম্পের বুকে বসে, তখন থানার দারোগার সঙ্গে নিশ্চয়ই সদ্ভাব আছে এঁদের। প্রতি মুহূর্তেই দারোগার আবির্ভাব আশঙ্কা করছিল। যথাসময়ে থানার ভারপ্রাপ্ত ও. সি. এলেন এবং এসে সোজা উঠলেন ওর ঘরেই। খবর পাঠালেন ভৈরবচন্দ্রকে। ভৈরবচন্দ্র একটু বিচলিত হ'লেন। এটা নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রথমত দারোগা সাহেব ভৈরবচন্দ্রের অফিসে উঠে আসামীকে তলব করে পাঠাবেন এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। তাহলেও সপার্ষদ তিনি এলেন ঋতব্রতের ব্যারাকে। সাধুচরণও সঙ্গদান করলেন—মজা দেখতে আপত্তি কি?

এসেই ওঁদের নজরে পড়ল ঋতব্রতের ঘরের সামনে একটা ল্যাণ্ড-রোভার দাঁড়িয়ে—তার পিছনে একখানা সাইকেল বাঁধা। বারান্দায় খান তিনেক চেয়ার পাতা। ঋতব্রত, ও. সি. এবং একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সেগুলি দখল করেছেন। ভৈরবচন্দ্র জানতেন এখন দীর্ঘক্ষণ ধরে জবানবন্দী, প্রশ্ন-উত্তর চলবে—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। অথচ বসবার চেয়ার আর নেই। বেঞ্চি একখানা পাতা আছে বটে, তবে তাতে বসলে অফিসিয়েটিং ক্যাম্প-সুপারের মর্যাদায় লাগে!

ভৈরবচন্দ্রের সমস্যার সমাধান হ'ল কিন্তু অচিরেই। ও. সি. ওঁকে আসতে দেখে নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বল্লেন "এইসব পেটি ব্যাপারের ফয়শালা মশাই নিজেরাই করতে পারেন না? পাঁচটাকার একখানা নোট

হারিয়েছে—তাই এফ. আই. আর. দিতে থানায় লোক ছুটেছে? যতসব… ।"

একটা ঢোঁক গিলে ভৈরবচন্দ্র বলেন, "তাছাড়াও একটা কেস আছে স্যার,—ঐ অনধিকার প্রবেশ করে রাত কাটানো—"

হা হা করে হেসে ওঠেন দারোগা সাহেব, "কোথা থেকে এইসব খবর পান মশাই? তিলকে তাল করছে এরা, বুঝছেন না? আমি মিস্টার বোসের পিয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। ব্যাপারটা কিছুই নয়।"

"কিন্তু এটাতো ভালো কথা নয়—"

"না, তা তো নয়ই! রতন, তুমি বাবা বোসসাহেবের ঘরেই রত্নদীপ হ'য়ে থেকো, অন্য কারও ঘরে সাঁজের দীপ জ্বালাতে যেওনা আর।" বলেই হা হা করে হাসেন তিনি। ভৈরবচন্দ্র হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে দারোগা সাহেবই বল্লেন, "বাই দি ওয়ে…চামেলীর কেসটার কি হ'ল? আপনারা নিজে যদি কিছু করতে না পারেন তবে আমাকে সেটা জানান—আমিই ইনভেস্টিগেট ক'রি।"

সাবধান হ'য়ে গেলেন ভৈরবচন্দ্র। চামেলীর কেস? সেটার বাবদ তো পাওনা গণ্ডা সব চুকিয়েই দেওয়া হয়েছে! আবার সেই পুরোনো কাসুন্দির কথা উঠছে কেন? বুঝলেন, ও. সি. ঋতব্রতের কাছ থেকে মোটা রকম দাঁও মেরেছে। এ যাত্রা আর কিছু হ'বেনা। ছেলেটাতো কম ধড়িবাজ নয়! আগে থেকে দারোগাকে হাত করল কি করে? ভৈরবচন্দ্র চেপে গেলেন একেবারে।

"আসুন মিস্টার চৌধুরী এবার যাওয়া যাক।" উঠলেন দারোগা সাহেব। তৃতীয় ভদ্রলোকটি এতক্ষণ চোখ বুজে সিগার টানছিলেন শুধু। বল্লেন, "উঁ ?" একটা আড়ামোড়া ভেঙে বল্লেন, "আমার যাবার দেরি আছে। আর আমি তো কলকাতা যাবো। আপনি যাবেন উল্টোমুখো থানায়। আপনাকে ছেড়ে রেখে এসে আমাকে নিয়ে যাবে।"

সেইমত নির্দেশ দিলেন তিনি ড্রাইভার হরদয়াল সিংকে। বিশালবপু হরদয়াল গাড়ি ব্যাক করিয়ে নিল। দারোগা সাহেব রওনা হ'লেন। আসর ভেঙে গেল। সসাধুচরণ ভৈরবচন্দ্রও বিদায় হ'লেন।

"আপনি দারোগাকে চিনলেন কি ক'রে—" ঋতব্রতর প্রশ্ন।

"আই জাস্ট হ্যাপন্ টু নো। রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে আসছি দেখি পাংচার হ'য়ে যাওয়া সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে ও। গাড়ি থামালাম। বল্লে, 'ক্যাম্পে যাবো।' আমি বল্লাম, 'চল, পৌঁছে দিই ; ওখানে আমারও একজন পরিচিত লোক আছে, এঞ্জিনিয়ার বোস। দেখা করে যাওয়া যাবে।' বেটা বল্লে, 'এঞ্জিনিয়ার বোস আপনার পরিচিত ? তারই ব্যাপারে এন্‌কোয়ারিতে যাচ্ছি।' তখন সব শুনলাম ; বল্লাম, 'পাগল! ঋতব্রত আমার ছেলের ক্লাস ফ্রেণ্ড। ওর পিয়নকেও চিনি আমি।' তা লোকটি আমার কথা মেনে নিয়েছে দেখছি।"

ঋতব্রত অবাক। বলে, "শুধুমাত্র আপনার কথাতেই এতটা ?"

"হ'বেনা ? ওর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ জানো ? ডি. আই. জি. রায়চৌধুরীকে নেমন্তন্ন করেছিলাম আমার ওয়ার্ক-সাইটের ওপাশে বড় বিলটায় গেম বার্ডস্ শিকার করতে। রায়চৌধুরী আমার এককেলাসের বন্ধু। আনঅফিসিয়াল ভিজিট হ'লেও কোথা থেকে খবর পেয়ে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল এই দারোগাটি আমার ক্যাম্প সাইটে। নিজ চোখেই তো দেখে গেছে রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা।"

খুব খুশি হয়ে উঠল ঋতব্রত সঞ্জীব চৌধুরীকে পেয়ে। তার মনে যেন বল ফিরে এল। বল্লে, "কি খাবেন বলুন। কি ভাবে আপনাকে এণ্টারটেইন করতে পারি ?"

"য়ু নো বেটার। অফার মি কফি, সিগারস্, ড্রিংস এনিথিং য়ু প্লীজ!"

"ওর তো একটাও পারব না। তবে চা খাওয়াতে পারি। বিস্কুটও বোধহয় আছে।...আর হ্যাঁ...বৌদির দেওয়া আমসত্ব আছে। খাবেন ?"

"দি আইডিয়া। চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমসত্বই খাবো আজ। নিয়ে এসোতো হে—কি নাম যেন তোমার।"

"আজ্ঞে আমার নাম রতন।" বলে সে চা বানাতে যায়।

"তারপর হোয়ার ইজ্ য়োর দ্রৌপদী?"

"দ্রৌপদী?"

"সেই যে—কি নাম যেন, ভালো রান্না করতো?"

"কে কুসুম? সে চলে গেছে।"

"চলে গেছে? তাহলে তোমার রান্না করছে কে?"

"কেউই না। নিজেই রতনকে দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছি।"

"সে কি? আর কাউকে পেলে না? স্যাল আই সেণ্ড্ য়ু এ কুক?"

"সে তো ভালোই হয়। কিন্তু ও কথা যাক। আপনাকে আসল কথাটাই বলি। একটা পরামর্শ দিন।"

"দাঁড়াও। য়ু কান্ট হিয়ার ব্রতকথা উইদাউট তুলসীপত্র ইন য়োর হ্যাণ্ডস্।"

একটা চুরুট বার করলেন চৌধুরীসাহেব। সেটাকে ধরিয়ে জমিয়ে বসলেন। ঋতব্রত তাঁকে বলে গেল কমলার বৃত্তান্ত। মন দিয়ে শুনলেন চৌধুরীসাহেব। দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে ঋতব্রত বল্লে, "এখন বলুন কি করি?"

"উড্ য়ু হিয়ার মাই এ্যাডভাইস্?"

"বলুন।"

"বলুন ফলুন নয়। আমার উপদেশের একটা মর্যাদা আছে। গতবারের উপদেশটাতে তো তুমি কর্ণপাতও করনি। ফলং স্বপাক রন্ধনম্! ভুগছো তুমিই।"

"না এবার শুনব ঠিক। বলুন আপনি।"

"কিল বোথ্ বার্ডস ইন ওয়ান ফায়ার!"

"মানে?"

"ঐ মেয়েটি, সরলা না কি যেন নাম? ওকে নিয়ে এসে তোল তোমার এখানে। তুমি আর রতন এ ঘরে থাকছো—ও ওঘরে শোবে। মা ভালো

হ'য়ে গেলে চ'লে যাবে। বাঙালীর বেটি রাঁধতে জানেই। তুমিও দুটি খেয়ে বাঁচো—সেও বাঁচুক ঘুমিয়ে। অফার হার স্লীপ এ্যাণ্ড য়ু উড গেট গুড ফুড,—এ্যাণ্ড পারহ্যাপস্ সাম হ্যাপি ড্রীমস্ ইন্ টু দি বারগেন।"

"বলেন কি! আপনি ঠাট্টা করছেন।"

"নো! আই এ্যাম নট।"

টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মারেন একটা চৌধুরীসাহেব। "আই এ্যাম সিরিয়াস টু দি টিপ অফ মাই হেয়ার। তুমি যদি ওকে এখানে এনে রাখতে না পার তবে আমিই ওকে নিয়ে যাবো। অবশ্য ওর মা এখানে অসুস্থ; ও হয়তো যেতে চাইবে না। আর তাছাড়া আড়ালে নিয়ে গেলে তো ঠিক জমবে না। ওদের নাকের ওপর এখানে এনেই রাখতে হবে তাকে। ভয় কি?"

"না ভয় আর কি···মানে···"

"মানে, দেয়ার আর এনাফ এ্যাণ্ড টু স্পেয়ার!" ও মানে খুঁজতে গেলে চলবে না। তোমাকে পারতেই হবে এটা।"

উৎসাহের আতিশয্যে কাঁধের উপর চাপড় মারলেন ঋতব্রতের।

ঋতব্রত মিন মিন করে তবুও, "না তা নয়।···আচ্ছা তাই হবে। আমি ওকে বলে দেখি—যদি রাজী হয়···আপনি কিন্তু মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেবেন। মানে, একটা ভীষণ গণ্ডগোল হবে আশঙ্কা করছি।"

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সঞ্জীব চৌধুরী। এ কথায় বসে পড়লেন।

"নাঃ! তুমি পারবে না। ও তোমার কর্ম নয়!"

"কেন? কি হল আবার?"

"তুমি শুধু আমার ভরসায় এগুচ্ছ—নিজের জোরে নয়। এ কাজ তার পক্ষেই সম্ভব যে নিজের জোরে চলতে পারে।"

"আচ্ছা হল বাপু হল! আপনি ভুলেও আমার খোঁজ নেবেন না। এবার হল ত? এখন উঠুন, আপনার গাড়ি অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে।"

ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না চৌধুরীসাহেবের, বললেন, "তুমি তো বেশ লোক হে ছোকরা! হোয়াট এ্যাবাউট আমসত্ব ডিপ্‌ড্ ইন্ এ হোলি কপঅফ টি?"

"ও হ্যাঁ।" লজ্জিত ঋতব্রত তাড়াতাড়ি সুটকেস খুলে আমসত্ব বের করে আনে। চায়ের কাপ হাতে রতনও প্রবেশ করে।

চা পর্বের পরে আমসত্ব চুষতে গিয়ে চৌধুরীসাহেব আবার খুশি হয়ে ওঠেন। গ্র্যাণ্ড আমসত্ব। গাড়ি থেকে হরদয়ালকে দিয়ে বোতল গ্লাস আনালেন। ড্রিংক করতে করতে গল্প চলল আরও খানিকটা। শেষে উঠে ঋতব্রতকে বললেন, "গেট আপ!"

"আমি কোথায় যাবো?" ঋতব্রত অবাক।

"কাজটা এখনই সেরে রাখা ভালো। বেটারা জেনে রাখুক সঞ্জীব চৌধুরীও আছে এর ভেতরে।"

ঋতব্রতের কিন্তু এটা ইচ্ছা নয়। এই আধপাগলা ভদ্রলোককে নিয়ে কমলার কাছে যেতে তার মন সরে না। ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে হ'বে কমলাকে—এ ভদ্রলোক কি করতে কী করে বসবেন হয়তো। মুখে কিন্তু বল্লে সে অন্য কথা, "আপনি যে এর মধ্যে আছেন সেটাই হ'চ্ছে আমাদের ট্রাম্প কার্ড! আগে ভাগে সেটা দেখাবো কেন?"

চোখ দুটি কুঞ্চিত ক'রে চৌধুরী বল্লেন, "হাতের তাস লুকিয়ে রাখতে হয় বলেই তাস আমি জীবনে খেলতে শিখিনি। ইনডোর গেমসের মধ্যে আমি খেলি দাবা। ষোল দুগুনে বত্রিশটা ঘুঁটি চোখের উপর থাকবে, তার মধ্যেই মাৎ করতে ভালোবাসি আমি। রাখা ঢাকা আমার পোষায় না। নাও ওঠ!"

যেটুকু চিনেছে ভদ্রলোককে তাতেই এরপর আর প্রতিবাদ করতে সাহস হ'ল না ঋতব্রতের। গিয়ে বসল রোভারে। গাড়ি এসে থামল এল/২৯ ব্যারাকের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে চৌধুরীসাহেব গট্‌মট্ ক'রে ঘরে

ঢুকে গেলেন—পিছন পিছন ঋতব্রতও এল। হরদয়াল স্টিয়ারিঙে বিশালবপু এলিয়ে দিয়ে বসে রইল গাড়িতেই। ঋতব্রতের ইঙ্গিতে চৌধুরীসাহেব এগিয়ে গেলেন কমলার দিকে। এ পাশে বৃদ্ধ খেতে বসেছেন। পাগলটা ছেলে কোলে ঘুরে বেড়চ্ছে। ওপাশের দম্পতি বিশ্রম্ভালাপরত। সুবলবাবুর বোধহয় জ্বর ছেড়েছে। উঠে বসে আছেন তিনি। বড়খোকা একটা নীল লুঙ্গি পরে উবু হ'য়ে বসে আম খাচ্ছিল। কমলা মাদুর পেতে শুয়েছিল নিজের এলাকায়। ওদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

"তোমার নামই সরলা ?"

"না, আমার নাম কমলা—সরলা আমার দিদির নাম।"

"দেন য়ু আর নট্‌ দি গার্ল আই এ্যাম্‌ আফটার। সরলা কই ?"

ঋতব্রত পাশ থেকে বল্লে, "না, এর কথাই হ'য়েছে আপনার সঙ্গে।"

"আই সী! তুমিই সরলা তাহলে। আচ্ছা শোন। তোমার তো বাপু এখানে থাকা চলবে না।"

কমলা এজাতীয় আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সকাল থেকে যে ঝড় বয়ে গেছে তাতেই সে ক্লান্ত। কদর্য ইঙ্গিতে, অশ্লীল ভঙ্গিতে সারা সকাল গালাগালি করেছে বড়খোকা। বন্ধুদের শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, "আচ্ছা তোরাই বল্‌, ঐ শালা রতনার চেয়েও কি আমি কালো কুচ্ছিৎ ? আমিও তো শালা বিনি কড়িতে তেল মাখছিনা। তোরাই বল্‌।" নিজের ভাষায়, বিকৃত মুখভঙ্গি ক'রে এ জাতীয় বক্র ইঙ্গিতে বড়খোকা জিনিসটাকে ন্যক্কারজনক করেই রেখেছিল। মুখ বুজে সহ্য ক'রে গেছে কমলা। সারা সকালটাই সে আশঙ্কা করেছে থানার দারোগা কখন আসে। চৌধুরীসাহেবকে সে ভেবেছিল কোনও বিশিষ্ট অফিসার। বল্লে, "আপনি কে ?"

"হু ? মি ? আই এ্যাম্‌ দি ফাদার অফ্‌ হিজ্‌ ফ্রেণ্ড। হৃদয়ব্রতের পিতৃবন্ধু।"

চৌধুরীসাহেবের বিচিত্র বাংলা শুনে হেসে ফেলেছে শ্বতব্রত।

কমলা বল্লে, "আমাকে কি বলছিলেন ?"

"বলছিলাম তোমার তো এখানে থাকা চলবে না।"

"তবে কোথায় থাকব আমি ?"

"এ্যাট হিজ্ প্লেস। ওর রান্না করার লোক নেই—তোমারও থাকবার যায়গা নেই। সো অফার মিউচুয়াল হেল্প। আই মীন—"

"আই ফলো", জবাব দিলে কমলা। অন্য কেউ নজর না করলেও কমলা লক্ষ্য করেছিল আধ-খাওয়া আম হাতে বড়খোকা উঠে এসেছে। তাই তর্জমাটা বাংলায় করতে দিল না ওঁকে।

"আমি একটা কথা কইয়াম।"

আম চাটতে চাটতে উঠে এল বড়খোকা। সে কথাবার্তা দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিল না।

"কও।" জবাব দিলেন চৌধুরী।

"আমরার ঘর দিয়া বিষ্টি হইলে জল পড়ে।"

"ওয়াণ্ডারফুল ডিস্কভারি। বৃষ্টি হ'লে ছাদ দিয়ে জল পড়বে না তো কি হোয়াইট হর্স হুইস্কি পড়বে ?"

"আইগ্যা জলই যদি পরে তে কি রহম্ সারাইলান আপনারা? সরকারের অর্থ গুলাইন্ ব্যেবাক্ নষ্ট করলাইন কেরে ?"

চৌধুরী ঘুরে শ্বতব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ্যাম আই হ্যাভিং দি প্লেজার অফ্ টকিং উইথ্ দি ফিনানসিয়াল এ্যাডভাইসর টু দি গভার্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ?"

শ্বতব্রত হাসলে। বল্লে, "না। ও ক্যাম্পের একজন পি. এল.— বড়খোকা।"

"আই সী। খোকা, তুমি বাইরে যেতে পারো—"

"ক্যান্? এ ঘরে আমি বসৎ করি। আমি ঘর ছাড়তাম কেরে ?"

"হরদয়াল!" হাঁক্ দিলেন চৌধুরী। ছ ফুট দীর্ঘ পাঞ্জাবী সিংজী এসে সেলাম করল। হাতের ইঙ্গিত করলেন শুধু চৌধুরী। মুখে কিছু বল্লেন না। হরদয়ালও রাইট টার্ন ক'রে মুখোমুখি দাঁড়াল বড়খোকার। ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিলে শুধু দ্বারের দিকে। মুখে কিছু বল্লে না। তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল বড়খোকা। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল ঘরের সকলেই। উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল সব। এগিয়ে এলনা আর কেউ। হরদয়াল স্থান ত্যাগ করল।

"আমি তোমার বাপের বয়সী। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। আজ বিকেলেই তুমি ঋতব্রতের ওখানে গিয়ে উঠবে। রাঁধবে, বাড়বে, খাবে, খাওয়াবে। ছেলেটার খাওয়ার বড় কষ্ট। তুমি একটু দেখ। আর যদি কখনও প্রয়োজন হয়, আমায় খবর দিও। কিপ ইট।"

একটা কার্ড বার করে দিলেন কমলাকে। নামটা পড়ল সে।

"কি? ইজ্ ইট ফাইনালি সেট্‌ল্‌ড্?" প্রশ্ন করেন তিনি।

কমলা তাকায় ঋতব্রতের দিকে।

"বিকেলে রতনকে পাঠিয়ে দেব?" শুধায় ঋতব্রত।

ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় কমলা।

"দ্যাটস্ সেট্‌ল্‌ড্। কম অন্। আচ্ছা চলি, বাই বাই।"

ঋতব্রত এবং চৌধুরীসাহেব এসে গাড়িতে ওঠেন।

ঘটনাটায় সারা ক্যাম্পে একটা বিরাট আলোড়ন দেখা দেবে, সর্বত্র এটাই হ'বে আলোচনার বিষয়—এই রকমই আশঙ্কা ঋতব্রত করেছিল। সেটা করাই স্বাভাবিক। কুসুমের ব্যাপারটা তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই চুকে গেছে। চামেলীর আলোচনায় নতুনত্বের আস্বাদ নেই। ক্যাম্পের আড্ডাগুলিতে অনেক দিন ধরে মুখরোচক বিষয়-বস্তুর অভাব ছিল—এমন সময় যদি প্রচারিত হয় এল/২৯ ব্যারাকের কমলা প্রকাশ্য দিবালোকে এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসায়

গিয়ে উঠেছে—এবং সেখানেই বাস করছে—তাহ'লে সেটায় 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'র' আড্ডার আগুনে আহুতি দেবে না কি ?

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক তা ঘটল না। কারণ নতুন একটা ব্যাপারে সবাই জড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাম্প অফিস থেকে প্রচার করা হয়েছিল—কয়েকটি পরিবারকে পুনর্বাসনে পাঠান হ'বে শীঘ্রই। পরিবারগুলি এতে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু এদের প্রতিবাদের জোর কি ? হয়তো অনায়াসেই পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পন্ন হ'ত, কিন্তু এই সুযোগে কয়েকজন ছোকরা কলকাতা থেকে এসে জোট পাকালো। নিখিল বঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের শুভাশুভ নির্ধারণ করবার একটা সংস্থা নাকি আছে কলকাতায়। এর নাম জানা যায়নি এতদিন। সেখান থেকেই দুটি ভদ্রলোক এসে ক্যাম্পবাসীর একটা অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি দাখিল করলেন ভৈরবচন্দ্রকে। প্রথমটায় আমলই দিলেন না ভৈরবচন্দ্র। ফলে যা হয়। স্ট্রীট-কর্নার মিটিং হল, প্রশেসন বার হ'ল, এবং ক্রমশঃ ব্যাপক মিটিংও দু একটা হয়ে গেল। এসব ঝামেলায় খবর ঋতব্রত রাখে না—কিন্তু জিনিসটা ব্যাপক আকার ধারণ করায় শুনল সবই। কয়েকজন নাকি অনশন করবার হুমকিও দেখিয়েছে। অটল বটব্যাল নামে একজন অক্লান্ত কর্মী ক্যাম্পের প্রতিরোধ-সংগঠনে কাজ করতে এসেছে শুনল। দু একদিন গরম গরম বক্তৃতাও দিতে শুনল তাকে।

ভৈরবচন্দ্র এই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু অখণ্ড অবকাশ ছিল ডাক্তার সাধুচরণের। কিন্তু একক তিনিই বা কি করবেন ? তাছাড়া তিনিও যেন এতটা দুঃসাহস আশা করেননি ঋতব্রতের কাছ থেকে। একফোঁটা একটা ছেলে যে এমন ঢাক পিটিয়ে একটা মেয়েছেলেকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে নিজের বাড়িতে এটা যেন কল্পনাতীত। আজকালকার ছেলেগুলোর হ'ল কি ? এসব কারবার তো অনেকেই ক'রে, ভাবেন সাধুচরণ ; তিনিও করেছেন অনেক কিছুই। কিন্তু এমন বেপরোয়া প্রকাশ্যভাবে ? এতটা সাহস হয় কি করে মানুষের ? কিসের জোর আছে ছোঁড়াটার ? ব্যাপারটা আলোচনা

করতে গেলেন ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে—কিন্তু তিনি নিজের ব্যাপার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।

রামশরণ কিন্তু উল্লসিত হ'য়ে উঠল এ সংবাদে। একটা সুযোগই খুঁজছিল সে। বেশ বড় রকমের একটা স্ক্যাণ্ডাল পাকাতে পারলেই বাছাধন বদলি হ'য়ে যাবেন। চতুর রামশরণ বুঝে নিয়েছে যে ঋতব্রতকে নোয়ানো যাবেনা। পোষ মানবেনা যে পাখী তাকে খাঁচায় ভরে রেখে লাভ কি? ভরসার মধ্যে ছোকরা বাগ না মানলেও কাজ বোঝেনা কিছুই। সূঁচ অবশ্য গলতে দিচ্ছে না সে কাজের কোনও ছিদ্র দিয়ে—সেদিকে প্রখর দৃষ্টি এস. ডি. ও-র। তাতে ক্ষেদ নেই রামশরণের। আপন মনেই হাসে অভিজ্ঞ ঠিকাদার, "সূঁই যানে না দিবে তো কি হইল? হাঁথি হামি জরুর চালিয়ে দিবে।"

এত কম রেটে, এত কড়া সুপারভিসনে কি ক'রে যে কাজ ক'রে যাচ্ছে ঠিকাদার—সে এক বিস্ময় ঋতব্রতের কাছে। বোধহয় জেদের বশেই হাজার কয়েক টাকা লোকসান দিয়ে যাবে বেটা—ভাবে ঋতব্রত। করোগেটের টিনের ছাদে সীট্ বল্টুর সংখ্যা কম আছে এবং বিটুমিনাস ওয়াসার কয়েকটি লিম্পেট ওয়াসারের সঙ্গে দেখা যায়নি বলে টিনের মাপ দেয়নি সে এই বিলে। শুধু এই একটা আইটেমেই হাজার ছয়েক টাকা আটকে গেল ঠিকাদারের। ঐ সামান্য অজুহাতে গোটা আইটেমটায় এক পয়সা পেমেন্ট হ'ল না এ বিলে। না পার্ট-রেটও দেবেনা সে। সুরেশ সেনগুপ্ত খবর পাঠাল রামশরণকে। বস্তুত কণ্ট্রাক্টরকে কথাটা বলতেই সঙ্কোচ হচ্ছিল সুরেন সেনগুপ্তের। কিন্তু ঠিকাদার হাসি মুখেই বল্লে, "ও তো ঠিক হ্যয়। হাম সীট বল্টু ঔর বিটুমিন ওয়াসার লাগায়ে দিব। পিছারি বিলমে নাপি উঠাইয়ে।" প্রত্যেকখানি টিন পরীক্ষা করে চলল টিন মিস্ত্রি।

"আজকে কি কি রান্না হবে?" কমলা এসে শুধায়।

"উঁ?" ডায়েরি লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই সাড়া দেয় ঋতব্রত।

"বলছি আজকে কি রান্না হ'বে?"

"তার আমি কি জানি?"

"আঃ, খাবেন তো আপনি। কি খাবেন বলুন।"

"আমি তো একা খাবোনা, সবাই খাবে। যা হয় খাওয়াও।"

"আচ্ছা বেশ, এখন উঠুন দেখি।"

"হুঁ।" আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে কলম চালায় ঋতব্রত।

"কী আশ্চর্য! উঠুন!"

এবার ঋতব্রত বিরক্ত হ'য়। "আঃ, কী হ'য়েছে কি? একটু লিখছি শুয়ে শুয়ে—সকাল বেলাই সবাই বিরক্ত করতে শুরু করেছ।"

"হয়েছে আর কি? সকাল থেকে বিছানা কামড়ে পড়ে আছেন, ওগুলো ঝাড়তে হ'বেনা?"

বাধ্য হ'য়েই উঠতে হয় ঋতব্রতকে। কমলা বিছানা ঝেড়ে, মশারিটা তুলে একটা নীল বেড-কভার পেতে দিল। চার দিক ভাঁজ করে, হাত দিয়ে টেনে টেনে সমান ক'রে দিয়ে বল্লে, "নিন শুন এবার! কী এমন মহাভারত রচনা হ'চ্ছে শুনি?"

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে ঋতব্রত বল্লে, "এ বেড-কভারটা কার?"

"আপনার। রতনকে দিয়ে আনিয়েছি স্টেশন বাজার থেকে। আপনি দৈনিক বাজার খরচের যে টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে একুশ টাকা তের আনার বাজার করিয়েছি। টাকাটা আমাকে মিটিয়ে দেবেন।"

"একুশ টাকার বাজার একদিনে? বলকি? আমাদের তো রোজ পাঁচসিকে দেড়টাকার মধ্যেই হ'য়ে যেত।"

"সে তো দৈনিক বাজার। এটা স্টেশনারি। এই বেড-কভার আনিয়েছি, একটা পাপোষ, চায়ের কাপ দুটো, ফুলদানি একটা আড়াই টাকায় আপনার তো দেখছি কিছুই ছিল না। সরষের তেলই নাকি

মাথায় মাখতেন শুনলাম—কিন্তু কাপড়কাচা সাবানটা গায়ে মাখতেন কি করে ?"

"সানলাইট তো গায়ে মাখা যায়।"

"ভাগ্যি জানলাম আপনার কাছে।"

তারপর হেসে বল্লে, "আচ্ছা, এতটাকা জমিয়ে কি করবেন আপনি বলুন তো ?"

"আমার অনেক ধার দেনা আছে বাজারে।"

দুজনেই চুপ করে যায়। কমলার কথাতে ঋতব্রত যেন নতুন দৃষ্টি পেল। সত্যিই, ঘরের শ্রীই যেন পালটে গেছে। ছ'টাকার মশারিটা টান টান করে টাঙানো হ'য়েছে। ফুলদানিতে রক্ষিত হ'য়েছে রজনীগন্ধার একটি ডাঁটি। টেবিলের জিনিসপত্র আগে যা ছিল তাই আছে, কিন্তু বই ও ফাইল-পত্র সারিবদ্ধ হ'য়ে যায়গা খালি করে দিয়েছে অনেকটা। স্লাইডরুলের খাপটা হারিয়ে গিয়েছিল বহুদিন—কোথা থেকে সেটাকে উদ্ধার করে এনে কোসবদ্ধ যন্ত্রটিকে রাখা হ'য়েছে টেবিলের প্রান্তে।

কমলাও হয়তো ভাবছিল এই অদ্ভুত চরিত্রের লোকটির কথাই। নিজের সুখ-সুবিধা আরামের দিকে কোনও নজর নেই। এত পরিশ্রম করে যে ঘরটা কেউ সাজালো, একটা প্রশংসাবাণীও শোনা গেল না গৃহস্বামীর কাছ থেকে। হয়তো তার নজরেই পড়ে না। আজ প্রায় মাসাধিক কাল কমলা এসেছে এ বাড়িতে। প্রথম প্রথম যে সংকোচের ভাবটা ছিল ক্রমেই সেটা সরে গেছে। ধীরে ধীরে এই ছোট সংসারের যাবতীয় ঝামেলা ঝেড়ে ফেলেছে ঋতব্রত কমলার স্কন্ধে। ধোপাবাড়ির হিসাব রাখে কমলা,—কোন্‌টা কাচতে যাবে, কোন্‌টা যাবে না ঠিক করে সেই। ছাড়া জামার পকেট থেকে উদ্ধার করে কখনও রেলওয়ে মানি-রিসিট ভাউচার, কখনও অসমাপ্ত কবিতা, কখনও বা দশটাকার নোট। যাবতীয় খরচের হিসাব তুলে রাখে খাতায়। গোয়ালাকে হিসাব বুঝিয়ে টাকা মেটায়। বেশ লাগছে কমলার—এই নতুন সংসারে

এসে। সকালে বিকালে হাঁসপাতালে যায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মায়ের অবস্থার কোনও উন্নতি হচ্ছে না কিন্তু।

ঋতব্রত হঠাৎ বলে, "একটা কথা রোজই বলব বলব ভাবি, বলা হয় না।"

"বলে ফেল্লেই হয় সেটা।"

"মানে ইয়ে,—তোমার টাকাটা দেওয়া হয়নি।"

"আমার টাকা?" অবাক হয় কমলা।

"কুসুমকে আমি মাসে দশটাকা করে দিতাম।"

ম্লান হ'য়ে যায় কমলা। হঠাৎ মনে পড়ে য'য় ঋতব্রতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রভূ-ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সে রান্না করছে, ঘর পরিষ্কার রাখছে, ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে ফুল, বোতাম আঁটছে ধোপাবাড়ি থেকে ফেরত আসা প্যান্টের গায়ে—কিন্তু সে তো অন্য কোনও কারণে নয়—সে যে পরিচারিকা! দয়া করে তাকে দেওয়া হয়েছে এই কাজ—সে নেহাৎ অনাথা বলে। ম্লান কণ্ঠে কমলা বল্লে, "কুসুমের ছিল অভাবের সংসার, সে অর্থের বিনিময়ে কাজ করতে এসেছিল। আমাকে আপনি খেতে দিচ্ছেন, থাকতে দিচ্ছেন—এর বিনিময়েই আমি আপনার সেবা করি স্যার। টাকার কথা তো ছিল না আপনার সঙ্গে।"

একটু কুণ্ঠিত হয় ঋতব্রত, "তুমি আমাকে স্যার বল কেন?"

"কি বলব তবে?"

"ঋতুদা বল্লেই পারো।"

"আপনার অফিসের সব কর্মচারীই তো আপনাকে স্যার বলে।"

"তুমি কি আমার অফিসের কর্মচারী?"

"না তা অবশ্য নই। আমি আপনার পার্সোনাল মেড সার্ভেন্ট।"

"কমলা! ছিঃ! কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই তো বলেছি! 'ঝি' কথাটা বলতে আজও জিবে আটকায়,

তাই ইংরাজি করে বল্লাম। তা না হ'লে টাকা দেওয়ার কথা বলে আপনি আমাকে অপমান করতেন না।"

জল ভরে আসে হঠাৎ কমলার দু'চোখে। স্তম্ভিত ঋতব্রতকে কোনও জবাব দেওয়ার অবকাশ না দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় কমলা।

কমলার স্থান পরিবর্তনে ক্যাম্প মহলে যে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল সেটা গুঞ্জন আকারেই রয়ে গেল কিন্তু। তেমন কোন ব্যাপার, তেমন কোনও কথা গোচরে এল না ঋতব্রতের। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ায় বড়খোকা বীভৎস রকম কিছু একটা করত হয়তো—কিন্তু উদ্বাস্তুদের ধর্মঘটের ব্যাপারেও সে পাণ্ডা-জাতীয় একটা কিছু হ'য়ে উঠেছিল। ভৈরবচন্দ্র আর সাধুচরণ হয়তো হকচকিয়ে গেছেন সঞ্জীব চৌধুরীর আকস্মিক আবির্ভাবে। লোকটা কে? অথবা দারোগা সাহেবের স্বরূপ পরিবর্তনে হয়তো বিচলিত হয়েছেন ও'রা। কিংবা ধর্মঘটের ব্যাপারেই সবাই ব্যস্ত। কারণ যাই হোক, ফল হল এই যে নিরুপদ্রব মেলামেশার অবকাশে ওরা দুজন এল পরস্পরের কাছাকাছি। ঋতব্রত যে দীর্ঘ সময়টা নিয়োজিত করত চিঠি লেখা বাবদ, আজকাল সেটা ব্যয়িত হয় কমলার সঙ্গে গল্প করায়। মাঝে মাঝে রতনও এসে যোগ দেয়। ঋতব্রত বলে তার হোস্টেল জীবনের বিচিত্র গল্প। নিদ্রিত সহপাঠির মশারির চালে ভিজা গামছা রেখে কেমন মজা দেখতো তারা,—পরস্পরের কার্টুন ছবি এঁকে টাঙিয়ে রাখতো ডাইনিং হলের নোটিস বোর্ডে। হৃষিা নামে যে লোকটি পান দিয়ে যেত খাবার পরে, তার সঙ্গে ওরা মজা মারত। একবার একজন অধ্যাপকের মুর্গী চুরি করে খেয়েছিল—রাত তিনটেয় স্লেটার হাউসের দ্বিতলে ইলেকট্রিক স্টোভে রান্না হয়েছিল মাংস—এমনি হাজারো গল্পের ভাণ্ডার তার। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে কমলা।

আবার কোনও কোনও দিন কমলা বলতে শুরু করে তার গল্প। হোস্টেল জীবনের হাস্যজনক গল্পের খোরাক না থাকলেও তার সতেরো বছরের জীবনেও

ঘটেছে নানান ঘটনা। ছোট ছোট হাসির কথা দিয়েই স্থচনা হ'ত বটে—তবে পরিশিষ্টটা করুণ পরিচ্ছেদে এসেই সমাপ্ত হ'ত। উপায় নেই। ওর সতেরো বছরের উজ্জ্বল যৌবন ঢাকা পড়ে গেছে বিষাদের এক অমোঘ কৃষ্ণ যবনিকায়। কমলার বাপ ছিলেন পোস্টমাস্টার। এক পোস্টঅফিস থেকে আর এক ডাকঘরে বদলি হয়েছেন কেবল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে পরিবার। কমলার ছোট ভাই ছিল একটি। শৈশবেই মারা যায়। দেশদেশান্তর অনবরত ঘুরে বেড়াতে হ'ত বলে মেয়েদের স্কুলে পড়ানো হয়ে ওঠেনি। তবু পড়াশোনা ভালবাসতেন তিনি। রোজ সন্ধ্যাবেলায় মেয়ে দুটিকে কোলের কাছে নিয়ে মাদুর পেতে তিনি পড়াতে বসতেন। ইংরাজি, বাংলা, গল্প। দেশবিদেশের ইতিহাস। কখনও বা গান গাইতে বলতেন মেয়েদের। অধিকাংশই গীতাঞ্জলি অথবা নৈবেদ্যর রবীন্দ্রসঙ্গীত। নিজেও মেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতেন কখনও বা। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রং ছিল তাঁর প্রিয় সঙ্গীত—আর শিবাষ্টকম্!

তারপর হঠাৎ একদিন আবার যেন বদলির অর্ডার পেলেন তিনি। রেজি-স্ট্রেসন লেজার, সেভিংস একাউন্টের মোটা মোটা ফোলিও, মনিঅর্ডারের অসমাপ্ত হিসাবের মতই বিধবা স্ত্রী এবং দুটি মেয়েকে রেখে গরঠিকানার ডাকঘরের ডাকে সাড়া দিলেন একদিন। চোখ বুজলেন পোস্টমাস্টার মশাই!

প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা আর ইনসিওরেন্সের টাকাটা এক করে বিধবা রাখলেন ব্যাঙ্কে। আয়ের পথ বন্ধ। ঐ পুঁজি ভেঙেই চলে দিন। মুখ শুকিয়ে যায় বিধবার। বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও শেষ হয় একদিন। তাই ছাঁটা কাপড়ের কাজ শুরু করলেন তিনি। বড়ি, কাঁথা, আচার,—মেলায় বেচবার ব্যবস্থা করেছিলেন। হয়তো সামলেও উঠতেন ঠিক,—এমন সময় এল র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ! নাবালক মেয়েদুটির হাত ধরে রওনা হলেন তিনি কলকাতামুখো। গিয়ে কোথায় উঠবেন স্থিরতা নেই। ভার লাঘব হ'ল পথেই। এক রাত্রে অব্যাহতি দিল সরলা! ঘরবাড়ি ছাড়তে যত বড়

আঘাত পেয়েছিলেন তার চেয়ে কঠিন আঘাত পেলেন তিনি সরলাকে ছাড়তে হ'ল বলে, কিন্তু তার চেয়েও বড় আঘাত পেলেন তিনি—যেদিন শুনলেন তাঁর সমস্ত গচ্ছিত ধন সমেত ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেছে। ভদ্রঘরের বধূ হয়ে থাকবার আর উপায় রইল না তাঁর। তিনি একেবারে অনাথা। কমলার হাত ধরে এসে পৌঁছলেন আশ্রয়শিবিরে। ঘুরতে ঘুরতে এসে আজ আশ্রয় পেয়েছেন বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পে। গল্প সারা হয়। চুপ করে বসে থাকে কথক আর শ্রোতা। হোস্টেলের হাসির গল্পগুলো মনে হয় চরম মিথ্যা।

হঠাৎ উঠে পড়ে কমলা। বলে, "আগুন দিতে বলি রতনকে। এবেলা কি হবে ভাত না রুটি?"

"খিচুড়ি। দেখছ না কি রকম জল আসছে!"

"রোজ রোজ কী খিচুড়ি খান আপনি! না, আজ রুটি হবে।"

উঠে যায় কমলা। ডাল বের করে ভিজতে দেয়। বড়া করবে। খিচুড়ির সঙ্গে ডালের বড়া ঋতব্রত খুব ভালোবাসে। খিচুড়িই করবে সে আজ।

সঞ্জীব চৌধুরী অনেকদিন আসেন না। দত্তসাহেবের ইনস্পেক্সনও হয়নি বহুদিন। বস্তুত কাজে কোনও খুঁত পান না তিনি পরিদর্শনে এসে। প্রতিটি মালমশলা উৎকৃষ্ট। ওয়ার্কম্যানসীপ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত মাপ নেওয়া হয় না। তিনি আপত্তি করবেন কিসে? দিন চলে যায় একই ভাবে। মেজদার চিঠি আসে মাঝে মাঝে। কয়েকটা পর পর চিঠি লিখেও রেখা মিত্তিরের কাছ থেকে জবাব না পাওয়ায় চিঠি লেখা বন্ধ করেছে ঋতব্রতও। মেজবৌদি লিখেছেন বিয়ের সম্বন্ধ আসছে নানা যায়গা থেকে। মেজদা ব্যস্ত হয়েছেন। কয়েক যায়গায় কথাবার্তাও চলছে। মেজবৌদি পূর্বেই সচেতন করেছেন তাই ওকে। বলেছেন, তার কোনও বক্তব্য থাকলে যেন সে অবিলম্বে জানায়। রেখা মিত্তিরের ব্যাপারটা মেজবৌদিরও মোটামুটি জানা ছিল। এ চিঠির জবাব দেয়নি সে। তার অল্প কয়েকদিন পরে এল মেজদার চিঠি।

লীলার বিয়ে দিয়ে এবার তাঁর ইচ্ছা ভাইয়ের বিয়েটাও সেরে ফেলেন। পিতৃদেবের অসমাপ্ত কাজ নাকি ওটা। এ বিষয়ে ছোট ভাইয়ের মতামত জানতে চেয়েছেন।

ঋতব্রত আবার চিঠি লিখতে বসল রেখাকে। খোলাখুলি জানতে চেয়ে পত্রাঘাত করল। রেখা কি তার কাছ থেকে মুক্তি চায়? জবাব না দিলে তো সেটা স্পষ্ট হবে না। খোলাখুলি জানিয়ে দিলে দুপক্ষই নিশ্চিন্ত হতে পারে। বিজনেস্ লেটারের মত চিঠিখানা খসড়া করে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাল সেখানা।

কেন এমন হয়? ভাবে ঋতব্রত। দুদিন আগেও রেখা মিত্তিরের হাবে ভাবে মনে হত ঋতব্রত বোস ছাড়া যেন তার জীবনই বৃথা। বন্ধুমহলে এ নিয়ে কত হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি! আজ ক'মাস সে চলে এসেছে দৃষ্টির আড়ালে—অমনি সেই সুযোগে তার শূন্য সিংহাসন দখল করে বসেছে আর একজন। ঋতব্রত বোস আজ রেখা মিত্তিরের জীবনে একটা বাহুল্য—বিস্ময় স্মৃতিমাত্র! যেন একটা কাটা দাগ—ব্যথা চলে গেছে কিন্তু দাগটা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই!

"ইয়াসিন এসেছে স্যার—দেখা করতে চায়।" রতন খবর দেয়।

"ডেকে দে।"

ইয়াসিন এসে দাঁড়ায়। রামশরণের ড্রাইভার। লম্বা সেলাম করে। রতন চলে যায় নিজের কাজে।

"কি খবর ইয়াসিন?"

"আপনাকে এর বিচার করতে হবে স্যার!"

"বিচার? কিসের বিচার?"

"আজ সতেরো মাস আমায় মাইনে দেয়নি স্যার। যখনই হাত পাতি দু দশটাকা দিয়ে বলে পরে হিসাব মেটাবো। কতটাকা পাবো তাই বলে না। কাল স্যার টাকা চাইতে গেছি—আমাকে যা নয় তাই বলে গাল দিল। হারামির

বাচ্ছা বলেছে আমাকে। কেন? আমি আমার হক্কের টাকা চাইলেই হারামি? আর তুই শালা চুরি জুচ্চুরি করে—"

"কী আবোল তাবোল বকছ?" ধমক দেয় ঋতব্রত।

"না স্যার, তাই বলছি।"

"কিন্তু আমার কাছে বলে কী লাভ? আমি তো তোমার টাকা আদায় করে দিতে পারব না। আর ঠিকাদারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো জানই। তাকে অনুরোধও আমি করতে পারব না।"

"তাহলে আমি স্যার আমার হক্কের টাকা পাব না?"

"তুমি নিজে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারো। আমি কিছু বলব না।"

রতন এসে আবার জানায়—কালিবাবু এসেছে। চোরের মত সরে পড়ে ইয়াসিন। কালিবাবু, রামশরণের এজেন্ট এসে ঢোকে। সঙ্গে একজন লোক। তার হাতে দুটো রেডি-মিক্‌শড রঙের ড্রাম। কালিবাবু ড্রাম দুটো টেবিলে তুলে দেখাল।

"না না—এসব রং চলবে না। আমি যা লিখে দিয়েছিলাম তাই আনলেন না কেন?"

"এই তো স্যার জনসনের রঙ—এই দেখুন ৮/৩ ফিল্ড গ্রীন।"

"আপনি কি নিজেই কিছু বোঝেন না—অথবা আমাকেই বোকা বোঝাতে চান?"

"স্যার?"

"জনসন হচ্ছে কোম্পানির নাম—৮/৩ শেডের নাম। ও কোম্পানির নানান দামের রঙ পাওয়া যায়। আমি বলেছি 'উডকোট' আনতে। সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা করে যার ইম্পিরিয়াল গ্যালনের দাম। বুঝলেন? এ চলবে না, নিয়ে যান।"

"সাড়ে সাঁইত্রিশ?"

"সস্তায় আনতে পারলে আমার আপত্তি নেই। সীল করা টিন দেখিয়ে গেলেই হল।"

"না, আমি বলছিলাম কি লোকাল উড কাঠে অত দামী রঙ...মানে..."

"মানে টানে নেই। আইটেমে লেখা আছে 'এ্যাপ্রুভড্ কোয়ালিটি।' উডকোট অথবা ঝিলমিল ছাড়া আমি আর কিছু অনুমোদন করব না।"

"কিন্তু আমাদের রেটে পোষায় কিনা তাতো দেখবেন স্যার?"

"নিশ্চয়ই নয়। রেট দেবার সময় আমার পরামর্শ নিয়েছিলেন? কে বলেছিল অত 'লো-রেটে' কাজ নিতে? আমি? যান এখন।"

ম্লানমুখে টিন দুটো সমেত ফিরে গেলেন কালিবাবু। অস্ফুটে কি বার হল তার মুখ দিয়ে। ঋতব্রত ভাবে ভাগ্যে এ সব কথাগুলো শোনা যায় না। পিতৃকুল-মাতৃকুল—কোন কুল উদ্ধার করে গেলেন কালিবাবু কে জানে!

দুপুরবেলা খেতে বসে ক্ষেপে গেল ঋতব্রত। ক'দিন ধরেই রাগটা নেপথ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল। বিস্ফোরণ হল হঠাৎই। সেদিন রবিবার। রবিবারে সাধারণত মাংস হয়। দু-একটা ভালমন্দ পদ রান্না করার একটা অলিখিত আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। আজ আলু সেদ্ধ ভাত দেখে চটে উঠেছিল সে।

"শুধু আলু সেদ্ধ দিয়ে ডাল-ভাত রোজ রোজ খাওয়া যায়? কমলা কই?"

"দিদিমণি হাঁসপাতালে।" কুণ্ঠিত রতনের কৈফিয়ৎ।

"তবে আর কি? উদ্ধার করেছেন।"

ডালটা হরিদ্বারের গঙ্গার সঙ্গে তুলনীয়। স্ফটিকস্বচ্ছ ধারার তলায় নুড়িগুলি দৃশ্যমান—উপরে ভাসছে তর্পণের ফুল বেলপাতার মত দু-চারটি ফোড়ন! আঙুল দিয়ে এই ত্রিতল-ডালকে ক্লাসলেস সোসাইটি করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে ঋতব্রত ঢেলে দিল সেটা ভাতের ক্রেটারে। প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই টান মেরে ফেলে দিল সব। হরিদ্বারের গঙ্গাজলের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গাজলের তফাৎ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটা মনে হল না ঋতব্রতের।

শশব্যস্তে ছুটে আসে রতন রান্নাঘর থেকে। সে আম কাটছিল।

"কি রান্না হয় আজকাল? কাল রাত্রেও রুটিগুলো পুড়ে গিয়েছিল। আজ ডালে নুন নেই!"

অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল রতন। যেন অপরাধটা তারই।

আসলে অপরাধটা কিন্তু রতনেরই। কমলা আজ ক'দিন রান্না করছে না। ঋতব্রত হাত ধুয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। রতন কয়েকটা আম কেটে নিয়ে গিয়ে অনেক সাধাসাধি করল। একটাও মুখে দিল না ঋতব্রত। রাগের চেয়েও অভিমান হয়েছিল তার বেশি। কেন আজকাল তার খাওয়ার কাছে কমলা এসে বসে না? কমলা আজ ক'দিন ধরেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন ঋতব্রত ওকে ডাকল সন্ধ্যাবেলায় গল্প করতে—মাথা ধরেছে বলে পাশ কাটাল কমলা। খাবে না। কখনও সে খাবে না। আজ আসুক কমলা হাঁসপাতাল থেকে। সে নিজে খাবে না। ফলে ওরাও কেউ খেতে পারবে না। দেখি কি করে কমলা।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ঋতব্রত। স্বপ্ন দেখছিল কমলা এসে ওকে সাধাসাধি করছে,—"ওঠো খাবে চল, আচ্ছা, আর কোনও দিন অবাধ্য হব না কথার।"

"তবে আজ সন্ধ্যাবেলায় একটা গান শোনাবে বল?"

"গান? গান শোনাব কি করে? গান তো আমি জানি না।"

"মিছে কথা! সেদিন না তুমি বললে সন্ধ্যাবেলা বাবাকে গান শোনাতে?"

"আচ্ছা বেশ বাপু, বেশ। শোনাব আজ। এবার খেতে চল।"

ঋতব্রত হাতখানা বাড়িয়ে দেয়, "উঠতে পারছি না আমি;—তুমি একটু টেনে নাও!"

"স্যার! স্যার!"

"কে?" ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ঋতব্রত, ঘুম ছুটে যায় মুহূর্তে। কি ব্যাপার?

"হাঁসপাতাল থেকে লোক এসেছে স্যার আপনাকে ডাকতে।"

"হাঁসপাতাল থেকে? কমলা ফেরেনি? খায়নি?"

"দিদিমণি তো আজ ক'দিনই খাচ্ছেন না। আমিই রান্নাবান্না করি।"

"কেন? সে খায় কোথায়?"

"তাঁর আবার খাওয়া! আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। দিদিমণির মার অবস্থা ভাল নয়।"

চমকে ওঠে ঋতব্রত। তাড়াতাড়ি প্যান্টের মধ্যে পা দুটো গলিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে রওনা হয়। যে কম্পাউণ্ডারটি ডাকতে এসেছিল সে আগে আগে চলে।

"ওদিকে কেন? হাঁসপাতালতো এদিকে?"

"ওঁকে আইসোলেসন ওয়ার্ডে রাখা হ'য়েছে।"

"আইসোলেসন ওয়ার্ড? কেন ওঁর কি কোনও ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে?"

"না। শেষ অবস্থায় আমরা রোগীকে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে সম্ভব হ'লে সরিয়ে আনি। ওতে অন্যান্য পেসেণ্টদের মনে শক লাগে।"

"ও!"

ঋতব্রত যখন গিয়ে পৌঁছল বৃদ্ধার তখন শেষ অবস্থা। দীর্ঘ দিনের রোগভোগে চক্ষু কোটরাগত। চৈতন্য কিন্তু পুরোমাত্রাতেই আছে। মাথার পাশে বসে আছে কমলা পাষাণ প্রতিমার মতই। দেখলে বোঝা যায় ক'দিন তার স্নানাহারও হয়নি। অনাহার-অত্যাচারে তাকেও মৃত্যুপথযাত্রীর মতই দেখাচ্ছে। বাইরের বারান্দায় দুটো টুল পেতে ডাক্তার সাধুচরণ গল্প করছিলেন ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে। একটা ইনজেকসন সিরিঞ্জ ধুয়ে তুলছিল নার্স। ঋতব্রত সোজা গিয়ে দাঁড়াল রোগিনীর শিয়রে। তার হাতখানা গিয়ে মিশল মৃত্যুপথযাত্রিনীর রোগপাণ্ডুর হাতে। কোটরাগত চক্ষুর কোল বেয়ে ঝরে পড়ল অশ্রুর ধারা। কমলা আঁচলে চোখে মুছল।

"কমলা রইল—" ধীরে ধীরে বল্লেন মৃত্যুপথযাত্রিনী।

কি জবাব দেবে ঋতব্রত ভেবে পেলনা।

ডাক্তারবাবু সিরিঞ্জটা নিয়ে এসে বল্লেন, "দেখি হাতখানা।'

"আর থাক না ডাক্তারবাবু। ফোঁড়াফুঁড়ি তো অনেকই করলেন। এবার আমাকে শান্তিতে যেতে দিন। ক'টা কথা বলার আছে, বলে নিই।"

ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে বলেন তিনি। ডাক্তারবাবু বিরত হলেন। তিনিও বুঝেছিলেন আর খোঁচাখুঁচি বৃথাই। তবে এতটা গ্লুকোস নষ্ট হবে ভেবে গা কচ্‌কচ্‌ করতে লাগল তাঁর।

"কই, কমলি কই রে?"

"এই যে মা।" ঝুঁকে পড়ে কমলা।

চোখ বুজলেন রোগিনী। বলেন, "আমি সব শুনেছি বাবা। তোমাকে যে কি বলে আশীর্বাদ করব—। ওর মত মেয়ে হয় না। নিজের মেয়ে বলেই বলছি না। তুমি…তুমি…" দম বন্ধ হ'য়ে আসছে তাঁর।

"কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার। এখন থাকনা। পরে বলবেন।"

"না। কষ্ট আর কি? আর পরে?" ম্লান হাসলেন বিধবা।

"ওকে দেখো। তোমাকে আর কি বলব বাবা। আমরা অনাথা। দেখো যেন দু মুঠো খেতে পায়…ভদ্রভাবে জীবনটা যেন কাটাতে পারে। ওর বাবার বড় আদরের মেয়ে ও। উঃ মাগো!"

"আপনি কিছু ভাববেন না মাসীমা। ওর ব্যবস্থা করে দেবো। আপনার মেয়ের মত মেয়ের বিয়ে হ'বেনা? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তুমি ওর দায়িত্ব নিচ্ছ তো? আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারি?"

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলা।

"হ্যাঁ মাসীমা। ওর সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।"

"আঃ! মাগো! কইরে কমলি মা, কোথায় গেলি?"

উদ্গত অশ্রু দমন করে আঁচল থেকে কমলা সাড়া দেয় "এই যে মা

আমি।' সে সাড়া আর তাঁর কানে পৌঁছয় না। তাঁর বুকের উপর উবুড় হয়ে পড়ে কমলা।

ওকে এখন কাঁদতে দিতে হ'বে কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঋতব্রত। ডাক্তার এবং ভৈরবচন্দ্র তখনও আলোচনা করছেন। ক্যাম্পে ও'রা একটা প্লে করবেন সব স্টাফ মিলে। সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল বোধহয়। হঠাৎ সাধুচরণ বল্লেন,

"অরক্ষণীয়ার ড্রামাটাইজ্‌ড্‌ ভার্সান আছে নাকি মশাই?"

"কেন বলুন তো?" প্রতিপ্রশ্ন করেন ভৈরবচন্দ্র।

"জ্ঞানদা আর অতুলের পার্ট নেবার মত দুটো লোকের সন্ধান পেয়েছিলাম।"

"তাই নাকি?"

পাশ দিয়ে ঋতব্রত অন্যমনস্কের মত চলে যায়—একটা কথাও তার কানে যায়নি। সে চলেছিল আপন খেয়ালে।

দুনিয়া কারও জন্যে বসে থাকেনা। মাতৃবিয়োগের শোকও ভুলতে হ'ল একদিন কমলাকে। তার চারিদিকে বিপদের বহুমুখী উদ্যতফনা নাগিনী। চোখের জল মুছে ফেলতে হ'ল তাকে। অনাথার আবার শোক কিসের? যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যায়। সব কাজের হারানো খেই একে একে তুলে নেয় হাতে। দৈনন্দিন কার্য-তালিকা আবার তার পূর্ববৎ হ'ল। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম সকাল সন্ধ্যায় হাঁসপাতাল যাওয়াটা রইল বন্ধ। মাঝে মাঝে উদাস হ'য়ে বসে থাকে। ভাবে তার অতীত জীবনের কথা—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। তার ছেলেবেলাকার সাথীদের মনে পড়ে। বন্ধু তার ছড়ানো আছে সারা বাংলায়। যেখানে যেখানে তার বাবা বদলি হ'য়েছেন সেখানেই তার আলাপ হ'য়েছে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে।

রতন বাজার নিয়ে আসে। সাজিয়ে সাজিয়ে তুলে রাখে ডালায়।

হঠাৎ কখন ঋতব্রত এসে বলে একখানা রুমাল লাগবে। ট্রাঙ্ক খুলে রুমাল বার করে দেয় কমলা। আজকাল ট্রাঙ্কের চাবি কমলার কাছেই থাকে। জামাকাপড়, টাকা পয়সা সবই থাকে কমলার হেপাজতে। শুধু স্যুটকেসের চাবিটা থাকে ঋতব্রতের কাছে। ওর মধ্যে আছে ওর ডায়েরি, কবিতার খাতা, চিঠির বাণ্ডিল।

একদিন রাতে আবার হঠাৎ এল ইয়াসিন। চোখ দুটো লাল। গায়ে মদের গন্ধ। ঋতব্রতের ইচ্ছা করেনা ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু আলাপ শুরু করেই বুঝতে পারলে কী মর্মান্তিক দুঃখে আজ মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেছে ইয়াসিন।

ইয়াসিন তার মাহিনার প্রাপ্য টাকা নিতে গিয়েছিল রামশরণের কাছে। বাকবিতণ্ডাও হয়েছে কিছু। কালিবাবু রাগের মাথায় বলে দিয়েছে ইয়াসিন নাকি নালিশ করতে এসেছিল সাহেবের কাছে। শুনে হঠাৎ ক্ষেপে গেল রামশরণ। ঋতব্রত তার নাগালের বাইরে কিন্তু ইয়াসিন তো ছিল হাতের কাছেই। পা থেকে জুতো খুলে বসিয়ে দিলে ইয়াসিনের মুখে। রুখে উঠেছিল ইয়াসিন। তখন রামশরণের আদেশে তার ভৃত্যবর্গ নির্মম প্রহার করেছে ইয়াসিনকে। ইয়াসিন পরদিন থানায় গিয়েছিল নালিশ করতে। সেখানে দারোগা তাকেই লক্-আপে রেখে দেয় সারা দিনরাত। মোটার পার্টস্ চুরির অভিযোগ ছিল পূর্বাহ্নেই রামশরণের। ইয়াসিনের সহকারী ক্লীনার মতিয়া নাকি মোক্তারবাবুকে খবর দিয়ে জামিনে খালাস করে এনেছে ওকে। শুনে একেবারে ক্ষেপে গেল ঋতব্রত। এরা কি? গরীব বলে কি মানুষ বলেই গণ্য করা হবে না ইয়াসিনকে? জিজ্ঞাসা করলে, "এখন কি করবে?"

"জেল হ'লে জেলে যাবো। খালাস পেলে বাড়ি চলে যাবো।"

"বাড়ি কোথায়?"

"আজ্ঞে, ছিলাম তো বরাবর শ্রীরামপুরে। পার্টিশনের পর পরিবার পাঠিয়ে দিয়েছি কুষ্টিয়ায়। সেখানেই চলে যাবো।"

"টাকা আদায়ের কি হবে?"

"টাকা আর দেবে না হারামির বাচ্চা! আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল আমার। শালা লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে আটকে রেখেছিল এতদিন।"

চুপ করে রইল ঋতব্রত।

"তবে আমিও এর শোধ নেব। আমিও একবার দেখে নেব শালাকে। জেলে যেতে ইয়াসিন মিঞার ভয় নেই। জেলের বাইরেও লপ্‌সির চেয়ে কীই বা ভালো খাইয়ে রেখেছিল? তবে ও শালাকেও যদি না জেলের ভাত খাওয়াতে পারি—"

অতি দুঃখেও হাসি আসে ঋতব্রতর, "তুমি কি করতে পারো ওর বিরুদ্ধে? টাকা দিয়ে সব ঢেকে দেবে সে। ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজাতে পারবে তুমি?"

"মিথ্যা কেন স্যার? সত্যি কথাই বলব আমি। তাই তো এসেছি।"

ঋতব্রত কৌতূহলী হয়। কি বলতে চায় ইয়াসিন?

নিম্নকণ্ঠে ইয়াসিন নিবেদন করে তার অভিযোগ। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যায় না। একথা কি সত্যি? কিন্তু টিন তো সত্যিই কিছু খারাপ আসছে না! বল্লে, "সত্যি জানো তুমি?"

"হ্যাঁ স্যার! আমি জানব না? প্রতিবার তো আমিই গাড়ি চালিয়ে আনি। স্টোর থেকে সরকারী টিন ওঠে কলকাতায়। তারপর আমরা যাই লিলুয়ায়। সেখানে আপনাদের সরকারী সব ভালো টিন নেমে যায়। গাড়িতে লাদ করা হয় খারাপ টিন। কালিবাবু আমাকে বুঝিয়েছে লিলুয়া থেকেও সরকারী টিনই ওঠে। ও ভাবে আমরা জানিনা কিছু। আমি শালা যে জেনে শুনে চুপ মেরে আছি এটা বিশ্বাসই করেনি ওরা। ভেবেছে জানলে নিশ্চয়ই ভাগ চাইতাম কোনও দিন না কোনও দিন।"

ঋতব্রত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। কথাটা কেমন করে বিশ্বাসযোগ্য? যে করোগেটেড টিন সাইটে এসে পৌঁছয় তাও তো বাণ্ডিল বাঁধা ঝকঝকে নতুন

টিনই। কলকাতার স্টোর থেকে লিস্ট আর রোড পার্মিট সমেত লরি ছাড়ে—এখানে ওর ওয়ার্ক-সরকার লিস্ট মিলিয়ে মাল খালাস করে। এত বাণ্ডিল, এত ফুট। কোনও দিন তো গণ্ডগোল হয়েছে হিসাবের এরকম রিপোর্ট পায় নি কিছু। নতুন মাল, একই বাণ্ডিল বাঁধা ভালো মাল—একই দৈর্ঘ্যের একই মাপের টিন যদি আসে তবে বদল করার মানেটা কি?

"আপনি বিশ্বাস করছেন না স্যার?"

অন্যমনস্কের মত ঋতব্রত শুধু বল্লে, "হুঁ!"

ইয়াসিন বুঝতে পারে টিন বদলানোর ব্যাপারে বিশেষ কিছু হবে না। মুখে যতই বড়াই করুক, ভালো টিন আর খারাপ টিন শব্দ দুটি তার রচনাই। বস্তুত ব্যাপারটায় একটা গোপন করার প্রয়াস দেখেই কিছু একটা সন্দেহ করেছিল সে—আসলে রহস্যটা কিছুই বোধগম্য হয়নি তারও। তাই এবার সে অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, "আর তাছাড়া আপনি শেঠজীর হাতে যে দু'খানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়—সে দুটো সে খুলে পড়েছিল স্যার!"

"তুমি সত্যি কথা বলছ?"

"হ্যাঁ স্যার, মিথ্যা বলে আমার লাভ?"

"লাভ আছে বই কি। রামশরণ তোমাকে অপমান করে, জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বলছ—রামশরণের নামে দুটো মিথ্যা বল্লে আমি যদি তার উপর বেশী রেগে যাই তাহলেই তোমার লাভ।"

তখন কসম খেয়ে ইয়াসিন বল্লে সে সত্যি কথাই বলছে। কেমন করে খাম খুলে চিঠিগুলো পড়েছিল শেঠজী, সে কথাও বল্লে সবিস্তারে।

"আচ্ছা তুমি যেতে পারো।"

সেলাম করে চলে গেল ইয়াসিন।

আর কোনও দিন টাকার কথা বলেনি ঋতব্রত কমলাকে। কমলা এতে খুশিই হয়েছিল। আবার সে গৃহকর্মে ডুবে গিয়েছিল একথা

আগেই বলেছি। ওদের সম্পর্কটা যে প্রভু-ভৃত্যের—এ কথাটা ভুলে থাকতে চায় কমলা। সে যেন ঋতব্রতের কোনও আত্মীয়া। মামাতো কি পিসতুত বোন এসেছে ক'দিন ওর সংসারটা চালিয়ে দিতে। সম্পর্কটা এতদূর সহজ হ'য়ে উঠেছে যে, কমলা একদিন এসে ঋতব্রতকে অম্লান বদনে বল্লে,

"আচ্ছা, আপনার বাড়িতে একটি মেয়ে থাকে জানেন ?"

কবিতার খাতাখানা বন্ধ করে উঠে বসে ঋতব্রত, "কেন বলতো ?"

"সে শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া পরে তা জানেন ?"

"আন্দাজ করছি—যেহেতু সে ভদ্রসমাজে মুখ দেখায়—কিন্তু কেন বলতো।"

"এখনও কেন ? সেগুলো ব্যবহার করলে ছিঁড়ে যায় তা জানেন ?"

এ কথার পরেও অন্যমনস্ক কবি প্রকৃতির লোকটির নজর পড়বে না এতটা স্থূল নয় সে। ছি ছি—এটা তার আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। শাড়িটার বিভিন্ন জায়গায় তালি দেওয়া আর সেলাই করা। ব্লাউজটাও তথৈবচ। হাতার কাছে অনেকটা অনাবৃত। ছেঁড়াটার পাশ দিয়ে লম্বা সেলাই চিহ্ন। অর্থাৎ ব্লাউজের কাপড়টা পচে ফেঁসে গেছে—সেলাইয়ে আর বাগ মানানো যাচ্ছে না তাকে।

"এর জন্যে তুমিই দায়ী। টাকা পয়সা তোমার কাছেই থাকে। প্যান্ট নেই বলে রতনকে দিয়ে ন'গজ খাঁকি কাপড় আনালে। দর্জি ডাকিয়ে মাপ নেওয়ালে। অথচ শাড়ি-ব্লাউজ কিনলে না কেন ?"

"বা রে! আপনার টাকা না বলে নিজের জন্যে খরচ করি কি করে ?"

"আমার টাকা তোমার টাকা খুব জ্ঞান হয়েছে দেখছি যে!"

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে কমলা।

"বেশ ব্যবস্থা আমিই করছি। কত ইঞ্চি শাড়ি পর তুমি ?"

আবার হেসে লুটিয়ে পড়ে কমলা।

"শাড়ির মাপ ইঞ্চি মেপে হয় না ধুতির মত। হাত মেপে হয়। দশ হাতী।"

"তা অত হাসির কি আছে? কিনিনি তো কখনও, তাই জানি না।" আর ব্লাউজ? সেটা তো হাত মেপে নয়—সেটা কত ইঞ্চি?"

"তা আমিও জানিনা। কিনিনি তো কখনও তাই জানিনা।"

"তবে নমুনা দাও একটা।"

"নমুনা কোথায় পাবো? একটাই আছে—সেটা গায়ে। সেটা খুলে দিতে পারি—কিন্তু কথা দিন যতদিন না নতুন ব্লাউজ হয়—বাড়ি ঢুকতে পাবেন না আপনি।"

কান দুটো লাল হ'য়ে ওঠে ঋতব্রতের। এতদূর শোচনীয় অবস্থা হ'য়েছে কমলার? অথচ ঘুণাক্ষরেও কোনও দিন জানায় নি কিছু। অত্যন্ত রূঢ় কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে, "ফাজলামি রাখো। মাপটা দিও আমায়। সব সময় ফাজলামি ভাল লাগে না।"

নিজের রূঢ় স্বরে নিজেই চমকে ওঠে সে। এতটা কঠিন স্বরে ধমক দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজন ছিল। ধমকটা সে দিয়েছে নিজেকেই। নিজের অন্যমনস্কতাকে, নিজের অক্ষমতাকেই। কেন সে এতটা লক্ষ্য করেনি এতদিন। তাছাড়া হঠাৎ এই মুহূর্তেই তার শিক্ষিত ভদ্র মনের অন্তরালবাসী পশুটা একটা ভুলে যাওয়া ছবির উপর থেকে পর্দা তুলে ধরবার উপক্রম করেছিল বোধহয়। ধমকটা সে নিজেকেই দিয়েছে রূঢ়স্বরে।

কমলা কিন্তু বিন্দুমাত্রও রাগ করেনা। হেসে বলে, "আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না মশাই। আমার শাড়ি-ব্লাউজ বাবদ কিছু টাকা স্যাংসন করুন। আমি নিজেই ব্যবস্থা করে নেব।"

ঋতব্রত তৎক্ষণাৎ খান কয়েক দশটাকার নোট এগিয়ে দিল কমলার দিকে। বিনাবাক্যব্যয়ে কমলা গ্রহণ করল তা হাত পেতে। বল্লে,

"আপনি তো কই বল্লেন না, শুধু খাওয়া শোওয়ার কথাই ছিল আমার। পরতে দেওয়ার কথা তো হয়নি।"

"আঃ! আবার ঐ কথা! তুমি ভারি ইয়ে—"

"কিয়ে?" হেসে ওঠে কমলা।

"আপনাকে একটা কথা বলব?" জিজ্ঞাসা করে ফের।

"বল।"

"আপনি একটা বিয়ে করুন। এ ভূতের বেগার আর কতদিন খাটব আমি? একা একা থাকতে হয় আমাকেও সারাদিন। একটা লোক হ'লে কথা বলে বাঁচি।"

ঋতব্রত উঠে বসে। ক'দিন ধরেই ভাবছে কমলার সঙ্গে কথাটা আলোচনা করবে কিনা। মেজদা আর বৌদি আবার তাগাদা দিয়েছেন, অথচ জবাব আসেনি রেখা মিত্তিরকে লেখা রেজিস্ট্রি চিঠির। একটা পরামর্শের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল ঋতব্রতের। শুধু নিজে থেকে প্রসঙ্গটা তুলতে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল তার।

বালিসটা জুত করে টেনে নিল বুকের তলায়। বাইরে অন্ধকার হ'য়ে আসছে। কমলা দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। ঋতব্রত বল্লে সব কথা খুলে। মেজদা পীড়াপীড়ি করছেন। বৌদিও। কথার তোড়ে রেখা মিত্তিরের সঙ্গে পূর্বরাগের কথাও বলল অকপটে। অনেক দিনের নিরুদ্ধ-বাণী উজাড় করে দিল নীরব শ্রোতাটির সামনে। চুপ করে শুনল বসে কমলা। দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে ঋতব্রত বল্লে, "এখন বল, কী করা যায়।"

"দাঁড়ান, একটা আলো জেলে আনি।"

উঠে যায় কমলা। অপেক্ষা করে ঋতব্রত। খানিক পরে আলো রেখে যায় রতন। রান্নাঘর থেকে ওঠে ঠুনঠান আওয়াজ। কমলা বোধ-হয় রান্না শুরু করে দিয়েছে। একটু অপেক্ষা করে আবার লিখতে শুরু করে ঋতব্রত।

কবিতাটা লিখছিল সে কমলাকে উদ্দেশ করেই।

পরদিন কমলার সঙ্গে দেখা হ'তেই ঋতব্রত ভাবছিল অসমাপ্ত প্রসঙ্গটার সমাপ্তি করা দরকার। ডাকতে গেল তাকে। দরকার হ'লনা। কমলা নিজেই এল ঘরে। ছুঁড়ে দিলে একটা সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা।

"এটা কি হ'চ্ছে?"

"কোন্‌টা? ও। তুমি দেখে ফেলেছ দেখছি।" হাসে ঋতব্রত। তুলে নেয় খাতাখানা। কমলা টাকা নিতে অস্বীকার করায় পরদিন ওর নামে পোস্টাপিসে একখানা মাইনর খাতা খোলে। তিন মাসে ত্রিশটাকা জমা পড়েছিল সেটাতে।

"আপনি কেন আমাকে না জানিয়ে খাতা খুললেন?"

"অন্যায় করেছি?"

"নিশ্চয়ই। এভাবে অপমান করার কি অধিকার আছে আপনার?"

"মান অপমানের বোধটা খুব তীক্ষ্ণ হ'য়েছে দেখছি।" হেসেই বল্লে কথাটা।

হঠাৎ চটে উঠল কমলা, বল্লে, "আমি গরীব হ'তে পারি, কিন্তু তাই বলে মান অপমান বোধ থাকবেনা এটাই বা আপনি আশা করেন কি করে স্যার?"

'স্যার' কথাটায় এবং কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় কমলা ভীষণ চটেছে। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায় ঋতব্রত ভেবে পায় না। বলে, "কি পাগলামি করছ? মান অপমানের কথা উঠছে কোথায়?"

"উঠছে। আপনাকে তো আমি বলেছি টাকা আমি নেব না। তা সত্ত্বেও···।"

"এ টাকা তো তোমাকে এখনও দিইনি আমি, অত চটছো কেন?" তারপর রসিকতা করে জিনিসটা সরল করবার উদ্দেশ্যে বল্লে, "তোমার বিয়ের সময় তো একটা যৌতুক দিতে হ'বে, তাই জমাচ্ছি টাকাটা। ক্রমে ক্রমে না জমালে আমিই বা পারব কি ক'রে?"

হাত বাড়িয়ে খাতাখানা টেনে নেয় কমলা। তারপর হঠাৎ টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে সেখানা। ঋতব্রত তাড়াতাড়ি এসে চেপে ধরলে ওর হাত। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল কমলা। ফিরে এল একটু পরেই।

"আমার মত রিফ্যুজি মেয়েদের যে বিয়ে হয় না, একথা আপনিও জানেন আমিও জানি। এ নিয়ে রসিকতা করার কোন দরকার নেই।"

স্তম্ভিত হয়ে গেল ঋতব্রত! এ কি থেকে কি হ'ল?

আঁচলের খুঁট খুলে ক'খানা দশটাকার নোট রেখে দিলে কমলা টেবিলে। চাপা দিলে একটা পেপার-ওয়েটে। বল্লে, "এটা তুলে রাখবেন।"

"মানে? ও টাকাটাও নেবেনা তুমি?"

"বিয়ের সময় রেখা মিত্তিরকেও তো শাড়ি কিনে দিতে হ'বে—ক্রমে ক্রমে না জমালে পারবেন কেন আপনি?"

"কমলা, লক্ষ্মীটি!" উঠে আসে ঋতব্রত।

"না না—ও আমি কিছুতেই নেবনা!—কিছুতেই না।"

দু চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় কমলা।

ঋতব্রতের কাছে সমস্ত আচরণটাই রহস্যময়।

দিন কেটে যায়। কমলা যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে চলে। কাজ করে রতন; কাজ করে ঋতব্রত। ওর সামনেই আসে না কমলা। আসার উপায়ও নেই হয়তো—ভাবে ঋতব্রত। ব্লাউজটা আরও ছিঁড়ে গেছে। অস্বোয়াস্তিতে ছটফট্ করে ঋতব্রত। এ তো ভারী বিপদে পড়া গেল। কখনও যদি বা কমলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—তার মুখখানা কালবৈশাখীর আকাশের মত। কথাবার্তা প্রায় বন্ধই। সন্ধির কোনও সূত্রও খুঁজে পেলনা বেচারী। হতাশ হ'য়ে পড়ে ঋতব্রত। সমস্তা সমস্তাই র'য়ে গেল।

সমাধান যে আসন্ন তা বোঝা যায়নি। অভাবিত ভাবে মূর্তিমান

সমাধান এসে হাজির হ'লেন একদিন সকালে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়ে। এসেই হৈচৈ শুরু করে দিলেন। সেটা ছিল রবিবার। কাজ ছিল না ঋতব্রতের। সঞ্জীব চৌধুরী মস্ত একটা রুইমাছ নিয়ে এসেছেন। ডাক পড়ল কমল র।

"মাথাটা দিয়ে মুড়িঘণ্ট হ'বে। পেটি দিয়ে কালিয়া, গাদা ভাজা। বানাও দেখি জুত ক'রে। পেয়ে গেলাম একটা হাটে। শোন সরলা, বেশ বড় জামবাটিতে ক'রে দেবে আমাকে। চুজ্ ফর মি এ ম্যাগনাম সাইজ জামবাটি। কব্জিভর ডুবিয়ে খেতে পারি যেন।" হেসে ফেলে কমলা। দীর্ঘদিন পরে হাসি দেখা গেল ওর মুখে।

"বড় বড় নৈনিতাল আলু লাগবে। আছে ঘরে? না থাকে তো ওই রসিক না কি যেন আছে পিয়নটা—ওকে বাজারে পাঠাও। ও ঠিক পারবে।"

"আজ্ঞে আমার নাম রতন।" এগিয়ে আসে রতন।

"ঠিকই চিনেছি! রতনে রতন চেনে! মাছটা কেটে ফেলতো বাবা।" রতনকে নিয়ে কমলা চলে যায় রান্নাঘরে।

"চলুন আপনার গাড়ি ক'রে আমরা ঘুরে আসি একটু।"

"রাইটও। চল। হরদয়াল!"

"হরদয়াল এখানে থাক। আপনাকে কয়েকটা কথা বলব গাড়িতে।"

"ইজ ইট?"

দুজনে গাড়ি নিয়ে রওনা হ'য়ে পড়ে স্টেশনমুখো।

গাড়িতে সমস্ত কথা ঋতব্রত খুলে বল্ল চৌধুরীসাহেবকে। চৌধুরী ধৈর্য ধরে শুনলেন সব।

"ও কেন ক্ষেপে গেল বুঝলাম না।"

"বুঝলে না? তা বুঝবে কি ক'রে? ওর নাম সরলা বটে—কিন্তু—নামটা তোমার হওয়া উচিত ছিল।"

"ওর নাম সরলা নয় কমলা—ভুল করছেন আপনি।"

"মোটেই ভুল করিনি। তাই তো বলছি আমি—ওর নাম সরলা

হওয়া মোটেই উচিত নয়—তুমিই সরল। সিম্পল এ্যাজ্ এ সিম্পলটন।"

"আপনি বুঝতে পেরেছেন কিছু ?"

"সিওর !"

"কি বলুন তো।"

"এখন নয় পরে বলব।"

"তবে ফেরা যাক।"

"নো। আমাকে একবার স্টেশনবাজার ঘুরে যেতে হ'বে।"

"কি, নৈনিতাল আলু তো ?"

"ইয়েস ! বেটে তোমার ব্রহ্মতালুতে লেপে দিতে হ'বে।"

ঋতব্রত চুপ করে যায়। বোঝে চৌধুরী মর্মান্তিক চটেছেন !

গাড়ি স্টেশনবাজারে দাঁড়ায়। বাজার ঘুরে ঘুরে গোটা তিনেক শাড়ি কিনলেন চৌধুরী। দু'খানা তাঁতের—একটা সিল্কের। সায়া। ছিটের কাপড়। একটা মাথার তেল। বড় চিরুনি একখানা। ট্যালকম পাউডার এক কৌটো। মাথার কাঁটা, ফিতে, সেন্ট এক শিশি, চটি একজোড়া, ব্লাউজ।

ঋতব্রত একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ। এবার ভয়ে ভয়ে বল্লে, "মাপ না জেনে ব্লাউজ কেনা যাবে ?"

অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শুধু চৌধুরী, কিছু বল্লেন না। বেছে বেছে খান চার পাঁচ ব্লাউজ কিনলেন তিনি। ঋতব্রত আবার বল্লে "ইয়ে, বলছিলাম কি, মাপটা না জেনে—"

"আমি যদি য়ুনিভার্সিটির ইনচার্জ হতাম তা হ'লে তোমার ডিগ্রি কেড়ে নিতাম।"

"কেন ?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে ঋতব্রত, "আমার ডিগ্রির কি অপরাধ হ'ল ?"

"একটা মেয়ের সঙ্গে তিন মাস বাস করেও যে তার গায়ের মাপ এস্টিমেট করতে পারেনা—সে এঞ্জিনিয়ার ?"

আবার চুপ করে যায় ঋতব্রত।

এক কাঁড়ি বাজার ক'রে ফিরলেন চৌধুরী। কমলাকে ডেকে বল্লেন, "এ চশমখোরটা তো তোমাকে পাগলি সাজিয়ে রেখেছে। তা ওর সংসারে তুমি যা ক'র আমি দেখতে আসিনা। কিন্তু ছেঁড়া কাপড় পরে ভাত বেড়ে দিলে আমি কিন্তু তোমার হাতে খাবই না। এরজন্তে এক পয়সাও খরচ হয়নি এই কিপটেটার। অল কামস্ ফ্রম য়োর সান্স্ পকেট।"

কমলা হাসিমুখেই সব উপহার গ্রহণ করল।

"না, শুধু হাত বাড়িয়ে নিলেই চলবে না। ওগুলো আমার সামনে পরে আসতে হ'বে। আই লাইক টু সি হাউ দীজ্ স্যুটস্ য়ু। আবার কবে আসি না আসি।"

"তবে তো কিছুতেই পরব না আজ। এটুকু দেখবার জন্তেই আপনাকে আর একদিন আসতে হ'বে ফের। মায়ের খোঁজই তো নেননা একেবারে।"

"না সে হ'বে না। তুমি স্নান সেরে আমার দেওয়া কাপড় জামা পরে না এলে তোমার হাতে খাবই না আমি।"

"তাহ'লে কথা দিন আসছে রবিবারে আবার আসছেন।"

"নেক্সড্ সানডে? ইম্পসিব্ল্! আসছে রবিবারে আমি থাকব পাটনায়। তার পরের বুধবারে আসব।"

"আচ্ছা তা হ'লেই চলবে।" খুশি হ'য়ে কমলা রান্নাঘরে ফিরে যায়।

দুপুরে টেবিলের উপর খবরের কাগজ পেতে খেতে দেওয়া হ'ল ওদের দুজনকে। দুজনে টেবিলে গিয়ে বসলেন। দু'হাতে দু'খানি থালা নিয়ে এল কমলা। ঋতব্রত মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। সবুজ রঙের ডুরে শাড়িটা জড়িয়ে উঠেছে কমলার তনুদেহ। সদ্য স্নান ক'রে ভিজে চুল খুলে দিয়েছে পিঠের উপর। পাউডারের প্রলেপ লেগে রয়েছে রজনীগন্ধার ডাঁটার মত গ্রীবার পার্শ্বে। কপালের মাঝখানে একটি বড় সিঁদুরের টিপ্। প্রসাধনের একটা স্নিগ্ধ মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। ওদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে চোখ

নীচু করল কমলা। মুখে ফুটে উঠল অনভ্যস্ত সজ্জার সলজ্জ হাসি। টোল পড়ল গালে।

ঋতব্রতের কবি মন বললে, "গালের ঐ টোলটিই হ'ল ষোলো কলার ষোড়শ কলা!"

"এই না হ'লে আমার মা! ভাখ, ভাখ, হতভাগা! এই মাকে আমার কী করে রেখেছিলি তুই!"

দ্রুতপায়ে কমলা চলে যায় ঘর ছেড়ে। প্রায় ছুটেই। ঋতব্রত খেতে খেতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। মনে পড়ে তার কবিতা অসমাপ্ত পড়ে আছে। আজ রাত্রেই শেষ করতে হ'বে সেটা।

আহারান্তে ঋতব্রতের খাটে চিৎ হ'য়ে পড়লেন চৌধুরীসাহেব। ডেকে পাঠালেন কমলাকে। কমলা এসে বসল। চৌধুরী গল্প শুরু করলেন। তাঁর ছেলেবেলার গল্প। প্রথম বিলেতযাত্রার কাহিনী। গল্প-গুজবে বিকেল গড়িয়ে আসে। বিকেলে চৌধুরী ঝোঁক ধরলেন বেড়াতে যেতে হ'বে। ভাদ্রমাস হ'লেও আকাশটা পরিষ্কার ছিল। গাড়িতে স্টোভ তোলা হ'ল। চায়ের সরঞ্জাম। পাকা রাস্তা ধরে অনেক দূর গিয়ে থামলেন তিনি। একটা বড 'রেনটি' গাছের তলায় স্টোভ জ্বেলে চা খাওয়া হ'ল। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলেন সবাই।

এবার বিদায় চাইলেন চৌধুরী। কমলা বল্লে, "এই বুধবারের পরের বুধবার আসছেন তো?"

"সিওর! এখানকার কাজ আমার শেষ হ'য়ে এল। এবার পাটনায় যেতে হ'বে আমাকে। তোমার রান্না খেয়ে এত লোভ হ'য়েছে যে ভাবছি তোমাকে পাটনায় নিয়ে গেলে কেমন হয়?"

"আর এখানে?" প্রশ্ন ক'রে কমলা।

"এখানে কি ব্যবস্থা হ'বে তাতে আমাদের কি দরকার। রসিকের রান্না পছন্দ না হ'লে একটা বিয়ে করলেই পারে ও। বউ যখন ইচ্ছা যোগাড় হ'বে

এঞ্জিনিয়ার সাহেবের—কিন্তু মা তো আমি পথে ঘাটে পাব না ?"

ঋতব্রত "—বা রে, সে হবে না" জাতীয় কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কমলা বল্লে, "সত্যি আমাকে নিয়ে যাবেন ? পাটনা আমি যাইনি কখনও। ভারি ইচ্ছে ক'রে দেখতে। ক্যাম্পে আর ভালো লাগেনা"। ঋতব্রত সামলে নিলে নিজেকে।

"সত্যিই নিয়ে যেতাম—তুমি রাজী থাকলে।"

"আমি রাজী।"

"বেশ, তবে বুধবারে তৈরি থেকো।"

গতবারের মত 'দ্যাটস্ সেট্‌লড। বাই বাই।' বল্লেননা তিনি এবার। চিরউৎসাহী চৌধুরীসাহেবও যেন ঠিক উল্লসিত হ'তে পারলেন না ব্যবস্থায়।

চৌধুরীসাহেবকে এগিয়ে দিতে এল ঋতব্রত। বাড়ি থেকে বার হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি সত্যিই কমলাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে ?"

"ইয়েস্।"

এমন গম্ভীরভাবে কথাটা বললেন তিনি—যেন প্রিভি কাউন্সিলের রায়। এরপর আর কোনও কথা ঋতব্রত খুঁজে পেল না। চৌধুরী গিয়ে বসলেন ল্যাণ্ড-রোভারে। হঠাৎ ঋতব্রত প্রশ্ন করলে, "কেন ও আমার উপর রাগ করে আছে, বললেন না তো ?"

"য়ু নিড্‌ন্ট্ নো। আমি তো নিয়েই যাচ্ছি ওকে।"

ঋতব্রতের কেমন যেন খটকা লাগে। হরদয়াল এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়েছে তখন।

"কি ব্যাপার বলুন তো ?" শুধালো সে।

"ডোণ্ট য়ু ফলো স্টিল ?"

অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে ঋতব্রত। কি একটা গোপন রহস্যের উপর থেকে যবনিকা যেন সরে আসতে থাকে—মনে পড়ে অনেক দিনের অনেক সামান্যতম ঘটনা—অতি তুচ্ছ—অথচ অতি অমূল্য।

ফার্স্ট গিয়ার টেনেছে হরদয়াল। ঘড়ঘড়ে আওয়াজে এঞ্জিনটা কি বলতে চায়—অথচ বলতে পারে না। হঠাৎ মুখটা বাড়িয়ে চৌধুরীসাহেব বলেন, "য়ু আর এ রিয়েল সিম্পলটন। এ ফুল।"

ঋতব্রতের মাথাটা টেনে এনে কানে কানে বলেন, "ওর মনে আবার নতুন ক'রে আঘাত দিও না। সাবধানে কাটিয়ে দিও ক'টা দিন।" অবাক বিস্ময়ে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকায় ঋতব্রত। এ কথার মানে কী?

"শি লাভস্ য়ু—ঈডিয়ট।"

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে রওনা হ'য়ে গেল ল্যাণ্ড-রোভার। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ঋতব্রতের।

সতর্ক হ'য়ে গেছে ঋতব্রত। কমলা তাকে ভালবাসে। আশ্রয় দেবার অছিলায় নিয়ে এসে সে তার সর্বনাশই করেছে শুধু। তাই চৌধুরীসাহেব ওকে নিয়ে যেতে চান দূরে—ঋতব্রতের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে। সেখানে গিয়ে কমলা ভুলতে চেষ্টা করবে ওকে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এঞ্জিনিয়ারের বধূ হবার স্বপ্ন তার মত মেয়ের পক্ষে অন্যায়। পাপ। সে উচ্চাশা কেন সে করে? জেনে শুনেও যদি তুমি আগুনে হাত দাও তবে আগুন তোমাকে ক্ষমা করবেনা। অথচ এই কমলার উপর কবিতা লিখেছে সে। ছিঃ। যাকে বিয়ে ক'রে বধূ হবার যোগ্যতা দিতে পারে না, তাকে নিয়ে কাব্য করার শখ কেন? নিজের উপরেই রাগ ধরে তার, কিন্তু তারই বা দোষ কোথায়? সে তো ইচ্ছে করে কমলার সর্বনাশ করেনি? সে তো জ্ঞাতসারে কোন প্রশ্রয়ও দেয়নি কমলাকে। কমলার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া যে একান্ত অসম্ভব এ কথা তারা দুজনেই জানে। তবে কেন এমন হয়? মনে পড়ে কমলার মাকে কথা দিয়েছিল ভার নেবে। ভার তো সে এখনও নিতে রাজী। দায়িত্ব নেওয়া মানে তো নিজে বিয়ে করা নয়। সে অর্থে প্রতিশ্রুতি দেয়নি ঋতব্রত। না, কখনই না। মৃত্যুপথযাত্রীনী তো নিশ্চয় সে

কল্পনা পোষণ করেন নি অন্তরের নিভৃততম কোণেও। আচ্ছা, কমলার বিয়ের খরচ বাবদ যদি কিছু দেয় সে চৌধুরীসাহেবকে। আবার হাসি আসে মনে মনে। টাকা দেবে চৌধুরীসাহেবকে? ওঁর আউট-স্টেশন এ্যালাউন্সটাই হয়তো ঋতব্রতের মাহিনার চেয়ে বেশি। যাক, কমলাতো জলে পড়ছে না। যাক সে চলে।

আবার তখনই খচখচ ক'রে মনের মধ্যে। কমলাবিহীন ক্যাম্পের জীবন-টার কথা ভাবাই যায় না আজ। মনে মনে ভাবল—ধরা যাক কমলা চলে গেছে। সে নেই। ও আছে একা এই বাড়িটায় রতনকে নিয়ে। যেমন ছিল এতদিন। আজ যেন তা ভাবাই যায় না। কেন যায় না?

স্যুটকেসের তলা থেকে কমলার উপর লেখা অসমাপ্ত কবিতাটা বার করে আবার পড়ে একবার। এ কি লিখেছে সে? এ কবিতা তো শুধুমাত্র সৌন্দর্যের উপাসনা নয়। এর প্রতি ছত্রে ছত্রে যে সে ধরা পড়ে গেছে। কবিতাটা তারস্বরে বলছে, 'তুমিও ওকে ভালবেসে ফেলেছ ঋতব্রত। তুমিও ওকে ভুলতে পারবে না।'

ছিঃ! এসব কি ভাবছে সে? কমলা কে? একটা সাধারণ রিফ্যুজি মেয়ে। সাতঘাটের জল খেয়ে এসে ঠেকেছে ক্যাম্পে। সে নিজে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। ক্যাম্প থেকে একটা উদ্বাস্তু ঘরের মেয়ে নিয়ে সে কোন লজ্জায় গিয়ে দাঁড়াবে বাড়িতে—বোসবাড়ির ছোটবউ এনেছি বলে? কি আশ্চর্য? বিয়ে করার কথা উঠছে কোথায়? মানে মানে এই ক'টা দিন কাটিয়ে দিলেই হ'ল।

এড়িয়ে চলতে লাগল সে কমলাকে। কমলাও এড়িয়ে চলে ওকে। দুজনের কেউই ধরা দিল না অপরের কাছে—অথচ দুজনেই বুঝলে ধরা তারা পড়ে গেছে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ঋতব্রত এই সব কথাই। দশ দিনের মেয়াদ ওদের। একে একে দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। প্রতিদিনই এগিয়ে নিয়ে

আসছে বিচ্ছেদের মুহূর্তটিকে। ঋতব্রত ভাবছে তার ক্যাম্প-জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই। মনে পড়ল তার প্রথম আসার দিনটার কথা। ইয়াসিন তাকে নিয়ে এল জীপে করে। ইয়াসিন। লোকটার শেষ পর্যন্ত কি হল কে জানে? ও বেচারীও উদ্বাস্তু—ও পড়ে আছে এপারে, পরিবার আছে ওপারে। ইয়াসিনের কথায় একটা সম্ভাবনার কথা হঠাৎ মনে পড়ল তার। বিদ্যুৎপৃষ্টের মত উঠে বসল ঋতব্রত। উঃ! কী বোকা সে! এই সোজা কথাটা বুঝতে পারেনি এতদিন। তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে ডরম্যান লণ্ডের মোটা বইখানা নিয়ে কি দেখল। স্লাইডরুলটা টেনে নিয়ে বার কয়েক এপাশ ওপাশ টানাটানি করে কি হিসাব করল যেন। উঃ! একটা আইটেমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা লাভ করবে রামশরণ! উত্তেজনায় পায়চারি করতে শুরু করল সে। এক বাণ্ডিল টিন ওজন করলে হয়। কিন্তু তা হ'লেই ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যাবে। নাঃ। সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে একটা কন্‌ফিডেন্সিয়াল চিঠি দিক দত্তসাহেবকে। কপি দেওয়া যাক চীফকে। কিন্তু ব্যাপারটা নিজে না দেখেই লেখাটা উচিত হ'বে কি? মুখে বলাই ভালো প্রথমে।

উঠে তাড়াতাড়ি সুটকেসটা গুছাতে বসল। রতন এসে জিজ্ঞাসা করে কোথাও যাবে কি না। বল্লে, "কলকাতা যাবো।" কমলা এসে দাঁড়ায়। এগিয়ে দেয়—তোয়ালে, টুথব্রাস, পেস্ট, শেভিং-সেট, জামা-কাপড়। একবারও জিজ্ঞাসা করলে না কেন যাচ্ছে—কবে ফিরবে।

রওনা হ'য়ে পড়ল ঋতব্রত।

ও বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই এক ভদ্রলোক এসে খোঁজ করলেন ঋতব্রত বসুর। রতন তাঁকে বল্লে, "সাহেব তো কলকাতা গেছেন আজ।"

"ও কলকাতা গেছে—আচ্ছা ঠিক আছে।"

ভদ্রলোক ফিরে যাবার জন্যে ঘুরলেন।

ঘরের ভিতর থেকে দেখতে পেয়েছিল কমলা। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে

আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে ঋতব্রতর। তার সন্দেহ হ'ল। রতনকে দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করালো।

"কে আমি? আমি ঋতব্রতের মেজদা। কলকাতা থেকে আসছি।" ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কমলা। পায়ে হাত দিতে প্রণাম করলে। মেজদার ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল। বল্লেন, "আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।"

"আমি আপনার ভাইয়ের বাড়িতে রান্নার কাজ করি। আমার নাম কমলা। আমাকে তুমিই বলবেন।"

"ও আচ্ছা। ঋতু কি আজই কলকাতা গেছে?"

"হ্যাঁ, ঘন্টা দুয়েক হ'ল।"

"কবে ফিরবে?"

"তা তো বলে যাননি।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।" মেজদা উঠে পড়েন।

"সেকি? আপনি বসুন। এখন তো ট্রেন নেই। দুপুরে ট্রেন—একেবারে খেয়ে দেয়ে যাবেন।"

"না, আমাকে এখুনি যেতে হবে। আমি আগে যাবো।" কমলাকে আর কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই সুটকেসটা হাতে নিয়ে রওনা হলেন তিনি। রতন সুটকেসটা নিতে যাচ্ছিল। বিরক্তভাবে বাধা দিলেন ভদ্রলোক।

মনটা খারাপ হয়ে গেল কমলার। হয়তো ভদ্রলোকের সত্যিই তাড়া ছিল। তাছাড়া ঋতব্রত নেই—সুতরাং এখানে থাকার কোন মানে হয়তো খুঁজে পাননি তিনি।

আশ্চর্য! এই দিনই দুপুরের ডাকে এল ঋতব্রতের নামে একটা ভারী প্যাকেট রেজিস্ট্রি ডাকে। চিঠিখানা কোথা থেকে আসছে বুঝতে একবিন্দু দেরি হল না কমলার। মুক্তোর মত গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ঋতব্রতের নাম। খামের পেছনে প্রেরকের নাম-ঠিকানাও রয়েছে। সই করে খামখানা নেওয়ার পর থেকে সারাদিনই নাড়াচাড়া করেছে সেখানা। মুখটা আঠা দিয়ে

আঁটা, সীল করা নয়। খুলে পড়া যায় অবশ্য চেষ্টা করলে। বুঝতেও পারবে না ঋতব্রত। কিন্তু ছি:! পরের চিঠি। আবার ভাবলে চলেই তো যাচ্ছে সে ঋতব্রতকে ছেড়ে আজীবনের মত। জেনে গেলে ক্ষতি কি তার প্রিয়তম মানুষটির ভাগ্যে কি হল শেষ পর্যন্ত। খামখেয়ালী, আপনভোলা এই মানুষটিকে সে হয়তো জীবনে ভুলতে পারবে না—কিন্তু ও লোকটার জীবনে তো সে কিছু নয়। এই তো তার প্রিয়জনের ডাক এসেছে। দুর্নিবার কৌতূহলের বেগ দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল কমলার। তাছাড়া চিঠি এত ভারী প্যাকেটে আসবে কেন? কি আছে এর ভিতরে? কত পাতা লিখেছে রেখা মিত্তির? না, প্রেমপত্র লুকিয়ে পড়ায় পাপ নেই—মনকে সে বোঝাল। এটা শুধুই কৌতুক, নিছক কৌতূহল।

সাবধানে খামটা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একগাদা পুরানো চিঠি। সব ঋতব্রতের লেখা। ওর মাঝে একখানি ছোট চিঠি রয়েছে মুক্তোর মত ঝকঝকে হস্তাক্ষরে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল কমলা।

কয়েক লাইন পড়তেই কমলার 'নঃশ্বাস ঘনঘন পড়তে লাগল। থরথর করে কাঁপতে লাগল হাতখানা। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। মুক্তোর মত অক্ষরগুলো ইতস্তত নড়ে বেড়াতে লাগল। চিঠিখানা বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইল সে। রতনের পদশব্দে চৈতন্য ফিরে এল তার। বাজারের পয়সা নিতে এসেছে সে। আঁচল খুলে পয়সা দিল কমলা।

রতন জিজ্ঞাসা করে, "কি কি আনব?"

"যা হয়।"

রতনও হয়তো আন্দাজ করেছে কিছু। হঠাৎ সাহেব চলে গেলেন কলকাতায়। দিদিমণি বসে আছেন মাথায় হাত দিয়ে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

আস্তে আস্তে ওঠে কমলা। আঠার শিশিটা নিয়ে বন্ধ করলে ফের খামখানা। রেখে দিল ঋতব্রতের ডাকের অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে টেবিলে।

ঋতব্রত ফিরে এল। রতন তাকে জানাল ডাকে চিঠি এসেছে, বললে মেজদা এসে ফিরে গেছেন। সে সব কথা খেয়ালই হলনা ঋতব্রতের। সে তখন অন্য নেশায় মেতে আছে। একটা 'গেজ-টেস্টার' নিয়ে এসেছে সে কলকাতা থেকে। তখনই সে বেরিয়ে পড়ল আবার। রামশরণ নেই। তার কর্মচারীকে বলে গুদামটা খোলালে। মেপে মেপে দেখল অনেকগুলো টিন। সমস্ত ছাব্বিশ গেজের। তার আশঙ্কা অমূলক নয়! ঠিকই ধরেছে সে। ওখান থেকে সে নিজেই গেল পোস্টাপিসে। দুখানা টেলিগ্রাম করল। একখানা দত্তসাহেবকে, অপরখানা চীফ এঞ্জিনিয়ারকে। দুজনকেই বলে এসেছিল তার সন্দেহের কথা। ইয়াসিনের কথা। পূর্বসংকেত মত সে শুধু লিখলে টেলিগ্রাম—অনুমান সত্য—"এ্যাজাম্পসনস্ কারেক্ট।"

ব্যস্! এবার ফাঁদে পড়েছেন রামশরণ। মনে পড়ল ওয়ার্ক-সরকারকে দিয়ে রামশরণ বলে পাঠিয়েছিল, "বলবেন আপনার সাহেবকে—নাফা হামি জরুর করবে। সুঁই না চলবে তো কি হইল—হাঁথি হামি জরুর চালিয়ে লিবে।"

হাতি এবার কাদায় পড়েছেন! ইয়াসিন এ শুভ মুহূর্তে কোথায় তুমি? এসে দেখে যাও তোমার সযত্নরোপিত বিষবৃক্ষে কী ফল ধরেছে!

পরদিনই টেলিগ্রামে জবাব এল চীফ এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে।

"তোমার তার পেলাম। এক্সিকিউটিভ মফঃস্বলে। নিজেই পরিদর্শনে আসছি কাল বেলা তিনটায়।"

টেলিগ্রাম এল পরিদর্শনের দিনই সকালে। নিজে হাতে দুখানা চিঠিতে খবরটা জানিয়ে তৎক্ষণাৎ পিয়ন-বইতে লিখে রতনকে দিযে পাঠিয়ে দিল ক্যাম্প অফিস আর ঠিকাদারকে। রামশরণ কাল রাত্রে এসেছে। খবর পাওয়া গেছে।

একটু পরেই রামশরণ এল ওর অফিসে। তখনও দশটা বাজে নি। আর কেউ আসেনি অফিসে। দীর্ঘ তিন-চার মাস পরে আজ রামশরণের পদধূলি

পড়ল অফিস ঘরে। সেই অপমানিত হয়ে ফিরে যাবার পর আর আসেনি। ঋতব্রত বসতে বলল তাকে। সিংজী বিনীত নমস্কার করে আসন গ্রহণ করল।

"সি. ই. কখোন আসবেন স্যার ?"

"সে তো চিঠিতে লিখেছি। বেলা তিনটে।"

"আর কৌন আসছেন স্যার ?"

"তা জানি না। জানাননি তিনি।"

"আপনি কখোন চিঠি পাইলেন ? হামি তো কাল ভরদিন অফিসে ছিলম। কিচ্ছু শুনলম না।"

"এইমাত্র টেলিগ্রাম এসেছে।"

"ও ! তবে কি ইন্তাজাম করতে হোবে বোলেন ?"

"কিছুই না—যেমন কাজ হচ্ছে হবে।"

"না, হামি বলছিলম কি, শুধু 'টি' হোবে না, 'টি-ডিনার' দুইই হোবে। কখোন লৌটে যাবেন লিখেন নাই ?"

"না। তাছাড়া চা-খাবার খেতে তো আসছেন না। সে সব কিছু করতে হবে না আপনাকে। হয়তো উনি খাবেন না কিছু।"

"হোবে স্যার হোবে। জরুর করতে হোবে। খাবেন উনি। হামি এতো কষ্ট করে বনাবো ঔর উনি খাবেন নাই ? আপনি ভি হমার উখানে খাবেন।"

"না, মাপ করবেন। ওঁদের জন্যে কিছু করবেন কিনা তা আমি কিছু বলব না। তবে আমি ওখানে খাব না।"

"স্যার, যা হইয়ে গেল উ তো হইয়ে গেল। আপনি হমার উপর গোঁসা করেন—মারুন হমাকে দু ঘা। লেকিন বহারওয়ালা বড়াসাহেবকে পাস কেন হমরা ঘরের ঝগড়া জানাব ?"

"ঝগড়া কিসের ? আপনার সঙ্গে আমার তো কোন ঝগড়া নেই ?

আপনি আমাকে শত্রু ভাবতে পারেন—আমি আপনাকে শত্রু ভাবিনা।"

"কি বলেন আপনি। রাম রাম!"

হঠাৎ দু'প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট নিয়ে এসে রতন রেখে যায় টেবিলের উপর। ঋতব্রত কিনতে দিয়েছিল। একটা প্যাকেট খোলে ঋতব্রত। নিজে নেয় একটা, সিংজীকে অফার করে একটা। সিংজী গ্রহণ করে। ভাব জমাবার গরজ আছে তার। দুজনেই ধরালো দুটো। অপর প্যাকেটটা সিংজীর দিকে এগিয়ে দিয়ে ঋতব্রত বল্লে, "এটা আপনার, নিন ধরুন।"

"হমার? কৈসে?"

বিস্মিত সিংজীর প্রসারিত করে প্যাকেটটা দিয়ে ঋতব্রত বলে, "এর আগে আপনি শেষ যেদিন এঘরে এসেছিলেন সেদিন আপনি এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দিয়েছিলেন রতনকে। মনে আছে? রতন প্যাকেটটা যখন নিয়ে আসে তখন আপনি চলে গেছেন। সে সময় রাগের মাথায় প্যাকেটটা আমি ফেলে দিই। ওটা অন্যায় হয়েছিল আমার। পয়সা সেবার আপনিই দিয়েছিলেন। ঘৃণার আবেগে সেটা ফেলে দেওয়া উচিত হয়নি আমার। তাই আজ শোধ দিলাম। আচ্ছা, রাম রাম।" উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে সে। অর্থাৎ, ভদ্রভাষায় এখন তুমি যেতে পারো। রামশরণ ওঠে। কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। ঘরের বাইরে পা দিয়েই ফেলে দিলে ছুঁড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর জ্বলন্ত সিগারেটটা। স্পষ্টই দেখা গেল ঘর থেকে। হাসলে ঋতব্রত। আচ্ছা দেখা যাবে ও বেলা এ তেজ থাকে কোথায়!

ব্যস, এখন আর হাতে কোনও কাজ নেই। হ্যাঁ, ডাকের চিঠিগুলো দেখতে হ'বে। একি, রেখা মিত্তিরের চিঠি এসে পড়ে আছে? ক্ষিপ্র হাতে খামখানা খুলে পড়তে শুরু করে। ক্রমে তার মুখেও ফুটে উঠল কুঞ্চনরেখা, প্রথম পাঠিকার বেলায় যা হ'য়েছিল। হাতখানা তারও হয়ে উঠল কম্পমান, মুখখানি রক্তলেশশূন্য।

ঋতব্রত জানতেও পারেনা তার মুখের প্রতিটি রেখার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করছিল একজন দর্শক—আড়ালে, তার থেকে অনতিদূরেই। খামখানা বন্ধ করে সুটকেসে তুলে রাখে ;—অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করে ঘরময়। এসে বসে আবার টেবিলে। নাঃ, ও কথা আর সে ভাববে না। এবার অফিসের ডাক দেখতে হ'বে। একে একে খামগুলি খুলে যায়। কোয়ার্টার্লি ইন্‌সিওরেন্স প্রিমিয়ামের তাগাদা এসেছে। অফিসিয়াল চিঠি। মামুলী করেসপণ্ডেন্স। একখানা আবার পার্সোনাল। মেজদার হাতের লেখা বোধহয়। ঋতব্রত খাম খুলে চিঠিখানা বার করে। আধখানা পড়তে পড়তে ঋতব্রত উঠে পড়ে। এ কি? কে এই সর্বনাশ করছে তার? একই অভিযোগ আসছে দু' যায়গা থেকে! তার ক্যাম্প-জীবনের এত খুঁটিনাটি খবর কে পৌঁছে দিচ্ছে কলকাতায়? তাই সেবার মেজদা মুখভার করে রইলেন। গম্ভীর হয়ে রইলেন বৌদি। তাই কথার মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন বৌদি, "ওখানে যে মেয়েটি তোমায় রান্না ক'রে দেয় তার নাম কি?"

পদচারণা শুরু করে ঋতব্রত উত্তেজিত হ'য়ে। এই জন্যেই মেজদা হয়তো নিজে চোখে দেখতে এসেছিলেন ব্যাপারখানা। কিন্তু তিনি কি দেখে গেলেন—যার জন্যে বিশ্বাস করলেন এমন ঘৃণিত অভিযোগ। কমলা যুবতী, কমলা সুন্দরী,—মানা গেল সেকথা। কিন্তু এই কি যথেষ্ট প্রমাণ? ঋতব্রত যে কি ধাতুতে তৈরি তা অন্তত তাঁদের জানা থাকা উচিত। রাগে অভিমানে কান্না আসতে চায় ঋতব্রতর। ছি ছি—কি করে বিশ্বাস করেন একথা মেজদারা? রেখা মিত্তির বিশ্বাস করতে পারে। সেটা স্বাভাবিক। তার যথেষ্ট কারণ আছে। সে একটা ছুতোই খুঁজছিল এতদিন। কিন্তু মেজদা, মেজবৌদি? তাঁরা কেমন করে স্থিরসিদ্ধান্ত হলেন?

কিন্তু এক হিসাবে তো মিথ্যা কথা লেখেন নি তিনি "আমার ভাই যে একটি রিফিউজি ক্যাম্পের অনূঢ়া যুবতী মেয়ের জীবন লইয়া এ ভাবে ছিনিমিনি খেলিতে পারে—এ দৃশ্য চক্ষে দেখার পর—" সত্যিই কি সে ছিনিমিনি

খেলেনি কমলাকে নিয়ে? সত্যিই কি তার জীবন বিষময় করে তোলেনি? আজ যদি সেই বিষের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে আসে—

'বিষের ধোঁয়া?' শরদিন্দুবাবুর বিখ্যাত উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে ঋতব্রত আত্মপ্রসাদ লাভ করে হয়তো। বিষের ধোঁয়ার নায়কও বেপরোয়া ভাবে অস্বীকার করেছিল সমাজকে—অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যেও তারই হয়েছিল জয়! কিন্তু,—হ্যাঁ, একটা মস্ত কিন্তু আছে! বিষের ধোঁয়ায় আত্মভোলা অধ্যাপকটি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল সমাজ ব্যবস্থা বিষয়ে। সে জানতো না অবিবাহিত যুবকের পক্ষে অনাত্মীয় সুন্দরী যুবতী নারীর একত্র বসবাস সমাজ সহ্য করে না। কিন্তু ঋতব্রত তো সে কথা জানতো! সে তো শুধু বাহাদুরি দেখাতেই, সঞ্জীববাবুর উৎসাহে ভৈরবচন্দ্রের উপর টেক্কা দেবার উদ্দেশ্যেই কমলাকে এনে তুলেছিল নিজ আবাসে। তাছাড়া বিষের ধোঁয়ার নায়ক ছিল তার আদর্শে অটল—আর তার সহবাসিনী যুবতী মেয়েটির প্রতি কোনও দুর্বলতা ছিল না তার। আর ঋতব্রত? সে তো মনে মনে—, না হ'লে কবিতা লেখায় অনুপ্রেরণা সে কোথায় পায়? প্রত্যক্ষ কমলাকে কোনও প্রেমনিবেদন না করলেও কবিতার মাধ্যমে সে তো উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার হৃদয়ের দ্বার!

আঃ! আজ যদি সঞ্জীব চৌধুরী থাকতেন! উঠে পড়ে ঋতব্রত। অফিসিয়াল ডাক আর দেখা হয় না। হঠাৎ মুখোমুখি হ'য়ে যায় কমলার সঙ্গে। কমলা! কমলা কী হ'য়ে গেছে! তপশ্চারিণী অপর্ণার মতই গোপন সাধনা-রতা শীর্ণা নারীমূর্তি! বৈরাগিনী মূর্তি তার!

"কোথায় বের হচ্ছেন?"

"কে, আমি? এই একটু কাজে।"

"আপনি নিজেও কিছু খাবেন না—আমাদেরও উপোস করিয়ে রাখবেন?"

"কেন, কেন?"

"কাল রাত্রে কিছু খেলেন না। সকালে খাবার করেছি না খেয়েই বেরুচ্ছেন।"

"না না, তা কেন? নিয়ে এসো। খাবোনা কেন?"

একথালা লুচি আর তরকারি নিয়ে আসে কমলা। পাশের ঘরে গিয়ে ঋতব্রত আহারে বসে। ধীরে ধীরে সে সব কিছুই খেয়ে নেয়। ক্ষুধাও যে পেয়েছিল সেটা বোঝা গেল এতক্ষণে।

"আপনার কি হয়েছে বলুন তো?"

"আমার? কই না, কিছু হয়নি তো।"

"তবে এমন করে কলকাতায় গেলেন। এসেও স্থির হচ্ছেন না।"

"ও, সে একটা অফিসিয়াল ব্যাপার। হ্যাঁ, ভাল কথা। আজ বিকেলে সি. ই. আসছেন। তাঁকে কিছু চা খাবার খাওয়াতে চাই। কি করা যায় বলত?"

"সি. ই. মানে?"

"সি. ই. মানে চীফ এঞ্জিনিয়ার"

"ও! তা কি খাওয়াতে চান বলুন।"

"সেইটেই তো পরামর্শ চাইছি।"

ক্রমে বৈকালিক চায়ের আয়োজনে মেতে উঠে দুজন। রেখা মিত্তিরের চিঠি পড়ে লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে কমলা প্রথমে মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যেন কেমন একটা মুক্তির আস্বাদ পেল।

ফোঁড়া ফেটে গেলে যেমন আরাম লাগে—সেই রকম একটা আরাম বোধ করলে কমলা। তার বুকের ধন তাহলে এখনও কেউ কেড়ে নেয়নি। সে নিজে অবশ্য কোনও দিন গিয়ে দাঁড়াতে পারবেনা ঋতব্রতের পাশে। সেকথা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। কিন্তু তবু কেমন যেন একটা আরাম পাওয়া গেল রেখার চিঠিখানায়। তাই সে সহজ হ'তে পারল আজ বহুদিন পরে।

সহজ হওয়াটা আবার সংক্রামক। দীর্ঘদিনের পর সেই পুরানো দিনের

মত কমলা যখন একটা প্লেটে ক'রে মাংসের একটু পুর নিয়ে এসে বল্লে, "দেখুন তো চেখে চপের পুরটা ঠিক হল কিনা।" তখন ঋতব্রতও সেটা মুখে দিয়ে অনায়াসে বলতে পারে, "এ রাম! নুনে পুড়ে গেছে! দুবার নুন দিলে নাকি?"

"এ্যাঁ!" হতভম্ব হয়ে যায় কমলা।

হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে ওঠে ঋতব্রত। ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে কমলা হেসে ফেলে—"যান! ভারি ইয়ে আপনি!"

অনেকদিন পরে প্রাণখোলা সহজ হাসি হাসলো দুজনে।

সুরেন সেনগুপ্ত আর জীবেন কর আজ সারাদিন বারে বারে আসছে। এটার কি হবে—ওটার কি করা যায়। ঋতব্রত ব্যবস্থা ক'রে যায়। থান কয়েক হাতলওলা চেয়ার আনতে পারলে হত। একটা টেবিল-ক্লথও নেই—কি পেতে দেবে? কিছু ভয় নেই—বিছানার একটা ধোপদুরস্ত চাদর আছে—সেটাই দুভাঁজ ক'রে পেতে দেবে কমলা।

"আপনি বরং দেখুন ফুলের একটা তোড়া বানাতে পারেন কিনা।"

"ফুলের তোড়া কি হবে?"

"ফুলদানিতে রাখব—ঘরটা সুন্দর দেখাবে।"

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তিনটায় এসে পৌঁছল চীফ এঞ্জিনিয়ারের কালো বড় প্লিমাউথখানা। শুরু হ'ল ইনস্পেক্শন। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখলেন তিনি। কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। রামশরণও উল্লসিত হ'য়ে উঠল। ইনস্পেক্শন শেষ হ'লে রামশরণ বল্লে, "এবার স্যার এদিকে একটু আসতে হোবে মেহেরবাণী ক'রে?"

"কোন্‌দিকে?"

"একটু চায়ের ইন্তাজাম করেছিলম স্যার।"

"তাই নাকি? আচ্ছা সে তো ভালো কথাই। তবে একেবারে সব সেরে এসে বসা যাবে।"

"সব তো সারা হইয়ে গেল স্যার।"

"না, সব সারা হ'য়েছে কই? আপনার স্টোর দেখব, এস. ডি. ও-র অফিস দেখব।"

আবার ওঁরা এগিয়ে চলেন। রামশরণের ওয়ার্ক-শেডের সামনে একটা শামিয়ানা খাটানো। টেবিলে অয়েলক্লথ পেতে সাজিয়ে রেখেছে নানান ডিশ। দূর থেকে বোঝা গেল না কি রকম ব্যবস্থা করতে পেরেছে সে মাত্র একটি বেলার মধ্যে।

স্টোরে এসে পৌঁছলেন সকলে। গুদামে গাদা দেওয়া আছে অননুমোদিত মাল—শালবল্লা, মুলিবাঁশের দেওয়াল, দরমার ঝাঁপ। রামশরণ চৌবের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলে। ঋতব্রত জানালো, হ্যাঁ—প্রত্যেকটিই কোন না কোন কারণে রিজেকটেড হ'য়েছে। আণ্ডার স্পেসিফিকেসন্।

"আই সী!"—বল্লেন সি. ই.।

"পাঁচ ইঞ্চি বল্লার মধ্যে কোয়াটার ইঞ্চি ছোট হ'লে মাল রিজেক্ট হ'য়ে যাবে স্যার?"

"সিওর! পেমেন্টের সময় পাঁচ ইঞ্চি মাপের চেকে সইটার উপর কোয়ার্টার ইঞ্চি কালি লেপে দিলে নেবেন আপনি?...আচ্ছা, ওই করোগেটেড টিনগুলো কি 'গেজ'? চব্বিশ না ছাব্বিশ?"

ঋতব্রত জবাব দিল না, রামশরণও নীরব। সেনগুপ্ত বল্লে, "চব্বিশ স্যার?"

"চব্বিশ? ইম্পসিব্‌ল্! টোয়েন্টিফোর বি. ডাবলু. জি. টিন দেওয়ার কথা?" প্রশ্নটা ঋতব্রতকে। সে জানালো, "হ্যাঁ"।

"তবে ছাব্বিশ গেজি টিন স্ট্যাক্ দেওয়া আছে কেন? ওগুলোও কি তাই রিজেক্‌টেড হ'য়ে পড়ে আছে?"

"হ্যাঁ স্যার!" অকূলে কূল পায় রামশরণ।

"না স্যার। ও টিন আমাদের ডিপার্টমেণ্টাল। ওগুলো ঠিকাদার আনেনি। আমরাই দিয়েছি। ওটা রিজেক্‌টেড নয়।" বলে ঋতব্রত।

"না স্যার!" প্রতিবাদ ক'রে রামশরণ, "এগুলো হমার আছে। ইসব টিন ছাব্বিশ গেজি আছে। হমার ওয়ার্কশেড কি লিয়ে আনিয়েছি হাম্‌।"

লাল হ'য়ে উঠেছে রামশরণের মুখখানা উত্তেজনায়।

"কি বলছেন যা তা! এসব সরকারী টিন নয়? আপনার টিন এখানে আসবে কি ক'রে?"

অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা ফাঁস হ'য়ে যায়। অনর্গল মিথ্যা বলেও একটি মাত্র সত্যকে ঢেকে রাখতে পারলনা রামশরণ ঠিকাদার।

"তবে সরকারী টিন কোথায়?"

"সরকারী টিন এখন স্টোরে নেই স্যার। সব চালে লাগিয়ে দিলম।"

"চালের টিন মাপব তবে।" বেরিয়ে এলেন চীফ।

পাগড়িটা খুলে ফেল্লে রামশরণ। রুমাল দিয়ে টাকটা একবার মুছে নেয়।

"এখানে গেজ-টেস্টার আছে?" চীফ প্রশ্ন ক'রেন।

"ইখানে উ জিনিস কুথা পাবেন স্যার?"

"আমার কাছে আছে; আনিযে দিচ্ছি।" ঋতব্রত বলে।

তৎক্ষণাৎ সে সাইকেলে ক'রে লোক পাঠিয়ে দিল অফিসে। রামশরণের ইচ্ছা করছিল টেনে এক চড় মারে ঋতব্রতকে। শয়তান! কোথা থেকে আসে গেজ-টেস্টার? হতভাগা ছোঁড়া কি বোঝেনা এতে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করছিস তুই? দু দুটো বিলে পেমেণ্ট হ'য়ে গেছে। এখন যদি গলদ বের হয়, তা হলে এস. ডি. ও. ভি বাঁচবে থোড়াই।

চালে উঠে লোক টিন মাপলো। সব ছাব্বিশ গেজি। অর্থাৎ যে মাল কলকাতা স্টোর থেকে দেওয়া হ'য়েছিল তার চেয়ে পাতলা ধরনের টিন! সব

কাগজপত্র 'সীজ' করলেন সি. ই.। এম. বি., সাইট অর্ডার বুক, সাইট এ্যাকাউন্ট লেজার, অফিস কপি, হ্যাণ্ড রিসিটের বাণ্ডিল, এমন কি ওয়ার্ক-সরকারের নোট বই—যাতে লেখা আছে প্রতি ট্রিপের সময়, তারিখ, মালের বিবরণ, লরির নম্বর ও ড্রাইভারের নাম। সব নিয়ে বাণ্ডিল বাঁধল সি. ই.র অর্ডালি পিয়ন। কন্ট্রাক্টরের গুদামে পড়ল সরকারী তালা। চট দিয়ে মুড়ে তালা শীল-মোহর করা হ'ল। সব কাজ বন্ধ রাখবার আদেশ দিলেন সি. ই.। অল ওয়ার্ক সাসপেণ্ডেড আনটিল ফার্দার অর্ডার্স! শুধু অসমাপ্ত ঘরের চালগুলো মাস্টার রোল কুলি দিয়ে শেষ করে নেবে ঋতব্রত। চোখে অন্ধকার দেখে রামশরণ। তার ত্রিশবৎসরের ঠিকাদারী জীবনে এমন ঘটনা সে কখনও হ'তে দেখেনি! একবার আমতা আমতা করে বল্লে, "টিনা বদল গেল কেমন ক'রে হুজুর?"

"সাট আপ স্কাউণ্ড্রেল—চিট্!" ধমকে উঠেন সি. ই. "—সেকথা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বললেই চলবে!"

গলা কাঠ হ'য়ে যায় রামশরণের।

ওরা দল বেঁধে চলল ঋতব্রতের বাড়ির দিকে। ঋতব্রতের হাতে তখনও রয়েছে গেজ-টেস্টারটা।

"ওটা আমার হাতে দিন স্যার।" পাশ থেকে কে যেন বল্লে।

অন্যমনস্কভাবে তার হাতে যন্ত্রটা দিতে গিয়ে ঋতব্রতের নজর হ'ল লোকটা আর কেউ নয়—ইয়াসিন।

একগাল হেসে ইয়াসিন সেলাম করে এস. ডি. ও.-কে।

সি. ই. একটু এগিয়ে গেছেন তখন। ঋতব্রত ইয়াসিনের দিকে ঘুরে বল্লে, "তুইও আয়—চা খেয়ে যাবি আমার ওখানে।"

ইয়াসিন মাথা নাড়ে, "আমাকে চা খাওয়াতে হ'বে না স্যার। বরং লপ্‌সি খাওয়াবার ব্যবস্থাটা পাকা করুন ঐ হারামির। আমার কেস এখনও ঝুলছে;—এবার ম্যাজিস্টরকে বলব 'আমি কবুল যাচ্ছি স্যার—জেল দিন।

শুধু জেলারকে বলে দেবেন স্যার ঐ হারামির সঙ্গে যেন একঘানিতে জুতে দেয় আমাকে'।"

কথা ক'টা উৎসাহের আতিশয্যে জোরে জোরেই বলে ইয়াসিন। পাশে পাশেই চলেছে রামশরণ। মাথা নীচু করে চলেছে। সে বুঝেছে এতক্ষণে, ষড়যন্ত্রটা কেমন ক'রে পাকিয়েছে!

ঋতব্রত ঘুরে বল্লে, "হাঁখি কিন্তু গল্‌লনা সিংজী!"

সিংজী একবার আশে পাশে তাকালো, তারপর বল্লে, "হামি ত মরলম, লেকিন আপনি ভি বাঁচবেন থোড়াই!"

তড়িৎশিখার মত একটা চিন্তা খেলে গেল ঋতব্রতের মনে। ওর নামে কলঙ্কটা কি রামশরণই ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? একমাত্র রামশরণই চেনে মেজদার বাড়ি। ধূর্ত সন্ধানী হয়তো কোনও সূত্রে যোগাড় করেছে রেখা মিত্তিরের ঠিকানাটাও।

ঋতব্রতের ঘরের সামনে রতন টেবিল চেয়ার পেতে রেখেছে। খান তিনেক চেয়ার পাতা আছে। সি. ই. একটাতে গিয়ে বসলেন। টেবিলের মাঝখানে একটা ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। সন্ধ্যা হ'ব হ'ব। ঘরের মধ্যে মশা হ'বে ভয়ে কমলা ব্যবস্থাটা বাইরেই করেছে। মন্দ নয়। গাছতলায় ব'সে চা খাওয়ার একটা আলাদা চার্ম আছে। সি. ই.-কে খাবার টেবিলে বসতে দেখে একে একে সুরেন সেনগুপ্ত, জীবেন কর প্রভৃতি দূরে গিয়ে জটলা পাকাতে শুরু করল। রতন একটা প্লেটে খাবার আর চা নিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে আসতে গেল। গাড়ি কাঁচা রাস্তায় নামেনি কাদার মধ্যে।

সি. ই. বল্লেন, "অবশ্য তোমার বিরুদ্ধেও ডিপার্টমেণ্টাল এ্যাক্‌সন নিতে হ'বে আমাকে। তবে তোমার হয়েছিল জেনুইন মিস্টেক। অভিজ্ঞতার অভাব। তাছাড়া তুমি নিজেই পয়েণ্ট আউট করেছ ভুলটা। সুতরাং হয়তো ওয়ার্নিঙেই শেষ হ'বে তোমার পালা, কিন্তু তোমার ঠিকাদার ডুবলো অগাধ জলে।"

ঋতব্রতের হঠাৎ মনে পড়ে যে রতন খাবার নিয়ে গেছে ড্রাইভারকে দিতে। ঘরে কমলা একলা। হয়তো চা খাবার তৈরি হ'য়ে গেছে। আনবার লোক নেই বলে ঠাণ্ডা হ'চ্ছে সব। খবরটা নিতে সে ভিতরে আসে। ভিতরটা বেশ অন্ধকার। একটা কুপি জ্বলছিল রান্নাঘরে। ঋতব্রতের পদশব্দে হঠাৎ নিভে গেল সেটা। এগিয়ে এল ঋতব্রত। ডাকলে কমলার নাম ধরে। কেউ কোথাও সাড়া দিল না। ব্যাপার কি? পকেট থেকে একটা দেশলাই বার ক'রে কাঠি জ্বাললে একটা। স্বল্পালোকিত রান্নাঘরের একপ্রান্তে দেখা গেল একটা মোড়ার উপর বসে আছে কমলা—হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। ঋতব্রত যেন স্থানকালপাত্র ভুলে যায়। এগিয়ে এসে কমলার হাতখানি ধরে আকর্ষণ করে সে, "কি হয়েছে কমলা?"

কমলার কোন জবাব নেই। উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে তার শরীরটা দুলে দুলে উঠছে।

"কি হ'য়েছে ব'লো! কে তোমাকে কি বলেছে?"

জোর ক'রে ওর অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলে ধরে সে। হঠাৎ ঋতব্রতের হাতে ঠেকে একটুকরো কাগজ। কমলার মুঠায় ধরা। জোর করে কেড়ে নেবার চেষ্টা ক'রে। কমলা দেয় না। ফলে আধখানা কাগজ ছিঁড়ে আসে। আবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বালে ঋতব্রত।

কাগজখানা আর কিছুই নয়। ওর অসমাপ্ত কবিতার একটি ভগ্নাংশ। কমলাকে উদ্দেশ করে যা সে লিখেছিল।

"না না ওটা আমার! আমাকে দিয়ে দাও!'

ঝাঁপিয়ে পড়ে কমলা। অন্ধকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হয়তো পড়ে যেত সে। ঋতব্রত ধরে ফেলে। ওর বুকের উপর ভেঙে পড়ে অশ্রুবিধৌত কমলার কমল আনন।

হঠাৎ একটি তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল অন্ধকার ঘরের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হল যেন দৈববাণী: "এক্সকিউস মি মিঃ বোস। দিস্ ওয়াজ

অল্‌সো এ পার্ট অফ্‌ মাই ইনভেস্টিগেসন্‌স্‌। আই হ্যাভ ইয়োকাল গ্রীভিয়াস্‌ চার্জেস্‌ এগেনস্ট য়ু—ক্রম আদার্‌ কোয়ার্টার্স !" সি.ই.র কণ্ঠস্বর !

ঋতব্রত বুঝতে পারে তার করধৃত তনুদেহটি ছিন্নমূল তরুর মতই লুটিয়ে পড়েছে। সংজ্ঞা হারিয়েছে কমলা। ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল কমলাকে। ক্ষিপ্র হাতে কুপিটা জ্বেলে ফেলে। দেখা যায় রান্নাঘরে সাজানো আছে দু থালা খাবার ; টি-পটে লিকার ঢালা আছে। মগে করে জল নিয়ে ঝাপটা মারে বার দুই কমলার মুখে। ধীরে ধীরে উঠে বসে কমলা।

"আসছি আমি।" বলে বেরিয়ে গেল ঋতব্রত বাইরে। বাহির তখন জনশূন্য। রতন ছুটে এসে খবর দেয়, "সি. ই. চলে গেলেন স্যার !"

নিষ্প্রভাত রাত্রি নাই। সে রাত্রিও পোহালো। খবরটা জানাজানি হতে বাকি থাকবার কথা নয়। সি. ই. যে খাবার টেবিলে বসেও না খেয়ে চলে গেলেন—দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখল সবাই। জীবেন কর, সুরেন সেনগুপ্ত, ওয়ার্কি-সরকারেরা। ব্যাপারটা কি না বুঝলেও জল্পনা-কল্পনার বিরাম রইল না। কারণ তারপরই আবির্ভাব ঘটল অকুস্থলে ডাক্তার সাধুচরণের। পরীক্ষা করে ঔষধ দিয়ে গেলেন তিনি কমলাকে। নার্ভাস শক্‌ লেগেছে নাকি তার।

সারারাত বিছানায় ছটফট করেছে ঋতব্রত। এক ফোঁটা ঘুম নেই চোখে। এ কি হল ? কেন ঘটল এ দুর্ঘটনা ! অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল—সে চরিত্রহীন ! একটা বাস্তহারা অসহায় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাম চরিতার্থ করছে সে, আর বাইরে অপেক্ষা করছেন মহামান্য অতিথি ! এরপর বন্ধু মহলে সে মুখ দেখাবে কি করে ? মেজদা ! মেজ-বৌদি ! উঃ ! আর সে পারে না !

পাশের ঘরেও বিনিদ্র রজনী যাপন করছে নিশ্চয়ই আর এক হতভাগিনী। ভারি মায়া হল ঋতব্রতের ওর উপর। তার দোষ কি! অথচ কি জানি কতদূর গড়াবে ব্যাপারটা! মনে পড়ল সংজ্ঞাহীন কমলার দেহটি কেমন দুহাতে তুলে শুইয়ে দিয়েছিল সে। কি হাল্‌কা কমলা? ভারি ইচ্ছে হল পাশের ঘরে গিয়ে কমলার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়। সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েইছে।

ধীরে ধীরে পার্টিশন দরজার কাছে এগিয়ে যায়। দরজা ওপাশ থেকে বন্ধ। ঝাঁপের দরজায় কান পাতে। ওপাশ থেকে ভেসে আসছে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। তোলপাড় ক'রে ওঠে ঋতব্রতের বুকের মধ্যে! না পারবে না সে,—কমলাকে ছেড়ে যেতে পাড়বেনা সে। এতবড় গভীর ভালবাসাকে উপেক্ষা করে যাওয়া অন্যায়, পাপ! ঋতব্রত সমাজ মানে না, পারিবারিক কৌলিন্যের ঝুটো অভিশাপ সে লাগতে দেবেনা তাদের এই অপাপবিদ্ধ অম্লান ভালবাসার গায়ে। অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মত ডাকে সে,—"কমলা! কমলা।"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে ওপাশ থেকে,—"না না না, আমাকে ডেকো না।

ঋতব্রত কি বলতে যায়,—হয়তো কোনও সান্ত্বনার কথা, অথবা দ্বার খুলে দেবার অনুরোধ—কিংবা ভালবাসার কথা; কিন্তু কথাটা তার বলা হয় না। ওপাশের বারান্দা থেকে রতন উঠে আসে।

"—ডাকাছিলেন স্যার?"

একটা ঢোঁক গিলে ঋতব্রত বলে,—"হ্যাঁ, আমার দেশলাইটা জানিস?"

"—বালিশের পাশে নেই?"

"—ও, হ্যাঁ রয়েছে।"

সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। কাল সকালে যা হয় করা যাবে। কমলাকে খোলাখুলি সব কথা জানাবে সে। হ্যাঁ, কমলাকে

সে ভালবাসে। কবিতায় যে কথা বলেছে—সেটা বাগাড়ম্বর নয়—তার মনের কথাই। কমলাকে সে বিবাহ করবে। সামাজিক মর্যাদা দেবে সে এ ভালবাসায়। এ সিদ্ধান্তে এসে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় ঋতব্রত। তন্দ্রার আবেশে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই। একবার মনে হল ঘুমের মধ্যে লোমওয়ালা একটি কুকুর ওর পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। অস্বোয়াস্তিতে পাটা টেনে নেয়। তারপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙল রতনের গোলমালে। তখন পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয় তির্যকভাবে।

"স্যার!"

"কি রে?"

"দিদিমণি কোথায়?"

"সে কি?"

এঘর ওঘর কোথাও নেই। বাথরুম, ল্যাট্রিন? না কোথাও নয়। এই ভোরবেলা কোথায় গেল সে? একি, তার বালিশের পাশে ট্রাঙ্কের চাবি এল কি করে? সেটাতো থাকতো কমলার আঁচলে? চাবিটা নিতে গিয়েই বালিশটা সরে গেল। তলা থেকে বের হ'ল একখণ্ড চিঠি—

"শ্রীচরণেষু—

তোমার জীবন তো ব্যর্থ করে দিয়ে গেলাম। খেতে পরতে দেবে বলে এনেছিলে অনাথা মেয়েকে, তার দাবি দেখা দিল আকাশস্পর্শী স্পর্ধায়। তোমার আর দোষ কি? আমার জন্য তোমার নির্মল চরিত্রও আজ কলঙ্ক-লিপ্ত! ঘরে বাইরে তোমার এ লাঞ্ছনা আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। রেখা মিত্তিরের চিঠিখানা আমি পড়েছি। তাকে ব'ল, তোমার মত ছেলের ভালবাসা পাওয়ার মত পুণ্য করেনি হতভাগী কমলা। এ চিঠিখানাই তার প্রমাণ।

সেই কলঙ্কই তোমার হ'ল অথচ আমাকেও দিতে পারলে না এমন কোনও পাথেয়—যা সম্বল ক'রে কাটাতে পারতাম বাকি জীবনের ব্যর্থ দিনগুলি।

অনেক পাপ করেছি। মার্জনা চাইব না। সারাজীবনই তো পড়ে রইল তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে।

চৌধুরীসাহেবকে ব'ল তাঁর স্নেহ ভালবাসা আমি জীবনে ভুলব না। আমি হতভাগী ;—যার কাছে গিয়েছি তাকেই জ্বালিয়েছি। তাঁর সদাহাস্যময় মুখের হাসিটুকু মুছে দিতে—তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে পড়তে আর সাহস হয় না।

যাওয়ার আগে একটা প্রণাম করতে গেলাম। তাও তো নিলে না তুমি। চিরবিদায় রইল।

হতভাগিনী তোমার কমলা।

পরিশিষ্ট

বকুলতলা ক্যাম্পের কাহিনী শেষ হ'য়ে গেল। শেষ হ'ল ঋতব্রতের চাকরি-জীবনের প্রথম অধ্যায়। এই ঘটনার দিনই সে ক্যাম্প ত্যাগ করে; আর ফিরে যায়নি সে সেখানে কোনওদিন। বদলি হ'য়ে যায় অন্যত্র।

আজও অবসর সময়ে ইজিচেয়ারে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে ঋতব্রত। ভীড় করে এসে দাঁড়ায় লোকগুলি। উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রকৃত দরদী দফাদার, অসাধু সাধুচরণ ও কুচক্রী ভৈরবচন্দ্র। সুরেন সেনগুপ্ত, জীবেন কর, শিশির, সতীশ ভীড় করে এসে দাঁড়ায়। আর স্মৃতির পথে সার দিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই উদ্বাস্তুর দল। দেখতে পায় শুভ্রকেশ বৃদ্ধ কুলপুরোহিত বিড়ি পাকাতে পাকাতে গুণগুণ ক'রে পড়ছেন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ। সুবলচন্দ্রের বুকে গরম তেল মালিশ ক'রে দেন স্ত্রী লতিকা। পাগলা বসে বসে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে।

বিড়ি পাকাতে পাকাতে পাকা জ্রদুটো তুলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামনিধি চৌধুরী পাগলকে প্রশ্ন করেন, "—হেইদিন কি কইলা তুমি—ল্যাডিন কথাডার অর্থ কি ?"

পাগল মিটি মিটি হাসে। চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে খুশীতে।

বলে :—"If an angel out of heaven

Gives you something else to drink,

Thank him for his kind intentions ;

Go and pour them down the sink !"

অর্থ গ্রহণ হয় না রামনিধির, বলেন, "কি কইলা ?"

পাগল কথা বলে না। মিটি মিটি হাসতেই থাকে। রামনিধি কিন্তু এতে রাগ করেন না, বলেন, "যাই কও, বুস সাহেব লোক ভালই আছিল, তার কথাই কইৎছিলাম। শুনছি ঘুষ খাইত না। ক্যান্ যে অমন দুর্মতি হইল ছেরাডার।"

পাগলা ফিক্ ফিক্ করে হাসে। ওঁর ডালা থেকে একটা বিড়ি তুলে নিয়ে ধরায়। একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে মুখ দিয়ে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। শালের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে চোখ বুজে দার্শনিকের মত বলে—

"Beauty provoketh shieres

Sooner than gold !"

মনে পড়ে কুসুমের কথা। জোর করে তার মাথা নেড়া করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদ করেনি। একবারও বলেনি—সে সতী—সে নিরপরাধিনী। রুগ্ন পঙ্গু স্বামীর হাত ধরে নীরবে ক্যাম্প এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল কুসুম। মনে পড়ে বিশ্বনাথের কথা। না, বিশ্বনাথকে সে চেনে না। যে উদ্ধত যুবকটি বলেছিল, "সমাজের চোখে তোমার বাবার ঠাকুর বিকলাঙ্গ পতিত। সমাজের চোখে আমিও ব্রাত্য—জেলফেরত আসামী। আমিও পতিত—তুমিও আমার কলঙ্কিনী রাই।" সেই সব বৃষস্কন্ধ কপাটবক্ষ বিশ্বনাথের দলকে চেনে না ঋতব্রত। সে দেখেছে শুধু যক্ষ্মারোগাক্রান্ত পাঁজরা-সর্বস্ব তারাপদ নামধারী প্রেতাত্মাগুলিকেই !

ওই যে কমলা ;—পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি ছাড়া ওরকি অন্য কোনও সংজ্ঞা হতে পারত ক্যাম্পের ভিতর ? বড়খোকাদের কাছ থেকে শালীনতা ও সতীত্ব রক্ষা করতেই আযৌবন বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে হত ওকে ।

বড়খোকা ! কে জানে সেই বা কেন নেমে এল এত নীচে। তার গোটা ইতিহাসটা জানা হয়নি। ঋতব্রতের মনে হয়—কি জানি তারও জীবনে হয়তো আছে এমন অধ্যায় যার জন্যে তার আজকের অধঃপতনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। ঋতব্রতের সম্বন্ধেও তো সি. ই-র ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিল সন্দেহাতীতরূপে—সে নিজেও পোষণ করত ভ্রান্ত ধারণা কুসুমের প্রতি। আর তাছাড়া—ভাবে ঋতব্রত—এই যে হাজার হাজার বৃন্তচ্যুত উদ্বাস্তর দল— এরাই কি কেবল দায়ী এদের আপাত অধঃপতনের জন্যে ? এরা তো এমন ছিল না। এদের জানানো হ'য়েছে—এরা স্থায়ী পোষ্য—পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি !

প্রতাপশালী দুর্ধর্ষ জমিদার যখন বৃদ্ধ বয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন, তখন এমনি ভাবেই দিন গোনেন তিনি। এরা সবাই শেষজীবনের সম্রাট শাহজাহাঁ। ওদের আছে গৌরবময় অতীত—নিজ পরিবার-সাম্রাজ্যে ছিল তারা সার্বভৌম সম্রাট ! আজ পড়ে আছে শুধু পরমুখাপেক্ষী পক্ষাঘাতগ্রস্থ শেষের দিনগুলি। ওরা জানে ফায়ারিং স্কোয়াড়ের সামনে দাঁড় করিয়েও ওদের ভাগ্য-মিমাংসা করা চলতো—তা করা হয়নি। কিন্তু দারাশেকোর চেয়ে শাহজাহার শেষজীবনই কি সুখের ? র‍্যাডক্লিফের টানা যমুনার ওপারে সাতপুরুষের তাজমহলের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে হাজার হাজার শাহজাহা। সে তাজমহল হয়তো মাটির, হয়তো খড়ের ভাঙা চালা একখানি।

লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হ'চ্ছে এদের পিছনে সরকারী তহবিল থেকে—যতদিন না মহাকালের হস্তক্ষেপ হয়। মানবিকতার মালগুদামে ওরা আনসার্ভিসেব্‌ল্ মার্কা পেয়েছে। সার্ভে রিপোর্টেড হিউম্যানিটি ! মনুষ্যাকৃতি

জীবগুলিকে তাই স্ট্যাক দিয়ে রাখা হ'য়েছে বকুলতলা ক্যাম্পে। নিলাম নোটিস জারি ক'রে লাভ নেই—কোনও "স্ক্র্যাপভ্যালু"ই নেই এদের ! প্রতীক্ষা করা হ'চ্ছে উপর থেকে কবে আসে মহাকালের নোটিস—"রাইট অফ্ !"

লেজার থেকে নাম-খারিজের আদেশনামা !

কানে বাজে দরদী দফাদারের কণ্ঠস্বর, "দে আর এ ক্লাস অফ পার্পিচুয়াল প্রফেসনাল লিগালাইজড বেগার্স !"

আইন-সম্মত চিরস্থায়ী এক শ্রেণীর ভিক্ষুকজীব।

বকুলতলা ক্যাম্পের কাহিনী শেষ হল। ঋতব্রতের গল্প কিন্তু শেষ হয়নি এখনও—কারণ সে বকুলতলা ক্যাম্পের লোক নয়। তার গল্পের উপসংহার শুনতে গিয়েছিলাম তাই। পরিচয় হয়ে গেল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। ঋতব্রতই পরিচয় করিয়ে দিলে। অবশ্য একমাথা ব্যাকব্রাশ করা প্ল্যাটিনাম-ব্লণ্ড চুল—পাইপমুখো মানুষটির পরিচয় না দিলেও চিনতে অসুবিধা হত না। সঞ্জীব চৌধুরী। ঋতব্রত আমার নামটা জানাল তাঁকে। পরিচয় দিলে সাহিত্যিক বলে, কবি বলে।

"ও অলমাইটি, য়ু আর এ পোয়েট ? হোয়াটস্ ফানি এ্যাণ্ড হোয়াটস্ গ্রেট !"

আমি বলি, "ঋতব্রতের ক্যাম্পের গল্প শুনেছি তার মুখে। শেষ অধ্যায়টা আপনি বলুন।"

"কতদূর শুনেছেন আপনি ?"

বললাম তা।

"তারপর আর বাকি নেই কিছু। হঠাৎ পাটনায় একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। আপনার বন্ধু অবিলম্বে আমাকে দেখা করতে বলেছে কলকাতার একটা হোটেলের ঠিকানায়। এ্যাণ্ড আই হ্যাড টু ফ্লাই ব্যাক দেন এ্যাণ্ড দেয়ার। সব কথা খুলে বললে ওরা দুজন।"

"দুজন ?"

"হ্যাঁ সরলাও ছিল হোটেলে। ক্যাম্প স্টেসনে অপেক্ষমান সরলাকে

ধরে নিয়ে এসেছিল আপনার বন্ধু। আমার কাছে পরামর্শ চাইল—কি করা যায়। দুজনেই কনফেস্ করলে আমার কাছে। বুঝলাম—দুজনেই অপরাধী—শাস্তি হওয়া উচিত। বোথ্ শুড বি পানিশ্ড্। একসঙ্গে দুজনের হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে চালান দিলাম।"

"কোথায়?" প্রশ্ন করি আমি।

"যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে! আপনি কবি মানুষ—তাই কাব্য করে বলছি,—হ্যাণ্ডকাফ ওয়াজ ফুলের মালা, প্রিজন্ হাউস ওয়াজ ম্যারেড লাইফ, জেলর ওয়াজ প্রজাপতি হিমসেল্ফ—এ্যাণ্ড জাজ দিস্ পুয়ার ফেলা। রেজিস্ট্রি-ম্যারেজে সাক্ষী ছিলাম আমি। কেমন ভাল করিনি সরলা মা?"

সলজ্জ হেসে ম্যাডাম বসু বললেন, "মোটেই না। ওর তো মজাই হয়েছে; মাইনেও দেয় না আজকাল, ব্যাঙ্কে টাকাও জমা দেয় না। আমারই হয়েছে জ্বালা।"

সঞ্জীব চৌধুরী হঠাৎ ঋতব্রতকে প্রশ্ন করেন, "বাই দি ওয়ে—তোমার সে কবিতাটা শেষ হয়েছিল? আমি তো শুনিনি?"

ঋতব্রত হেসে বললে, "সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। আপনি যে কতবড় কাব্যরসিক বিবাহিত জীবনের উপর উপমা শুনেই তা বুঝেছি আমরা।"

নিরুপায়ভাবে শ্রাগ করেন চৌধুরী সাহেব। হতাশাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি তাঁর। কাব্যি করাটা মাঠে মারা যাওয়ায় নিরাশ হয়েছেন তিনি।

মনে পড়ল ঋতব্রতের বৌভাতে ওদের চীফ এঞ্জিনিয়ারকে দেখেছিলাম। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পংক্তি ভোজনেই বসেছিলেন তিনি। বৌভাতে নববধূ সকলের পাতে এক চামচ করে ভাত দেয়—এটাই প্রথা। নববধূর সামাজিক স্বীকৃতি। তিন আইনে বিয়ে হলেও এ প্রথাটা মেনেছিলেন মেজবৌদি। চীফের পাতে মিসেস বসু যখন ভাত দিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "খাবারগুলো অনেকদিনের বাসি মনে হচ্ছে।"

"সে কি, সে কি !" ছুটে আসেন বাড়ির সবাই। মেজদা খাবারের থালাটা পালটে দিতে নিজেই ছুটে আসেন। সকলেই স্তম্ভিত !

বাধা দিলেন চীফ নিজেই, বললেন, "একদিন বোস আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তাড়াতাড়ি থাকায় আমি খেয়ে আসতে পারিনি। তাই ভাবলাম সেই খাবারগুলোই বুঝি বৌমার হাতে পাঠিয়েছে আজ !"

সি. ই-র রহস্যপ্রবণতার কথা জানা ছিল সকলের। ঋতব্রতের কঞ্জুস স্বভাবের প্রতি এটি একটি বক্রোক্তি বলেই সকলে মেনে নিল। তখন বুঝিনি, আজ বুঝি, একথায় কেন লাল হয়ে উঠেছিল ঋতব্রতের মুখ। মিসেস বোসের মুখ দেখতে পাইনি—সেটা ছিল ঘোমটার আড়ালে।

ঋতব্রত চৌধুরীসাহেবকে জানায়, "চৌধুরীসাহেব ! আমার বন্ধু আমার ক্যাম্প-জীবনের কাহিনী নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখেছে।"

"কি নাম দিয়েছেন বইয়ের ?"

"ইজ্ ইট ?" উৎসাহিত হলেন সঞ্জীব চৌধুরী।

"ছিন্নমূল !"

"অফুল ! রিনেম ইট্—নাম দিন 'বৃন্তচ্যুত' !"

"ওতো একই কথা !"

"না এককথা নয় ! ছিন্নমূল মানে যে গাছের মূল ছিঁড়ে গেছে। নতুন মাটিতে পুঁতে দিলে আর সে বাঁচে না। অথচ বৃন্তচ্যুত ফুলের আরও সম্ভাবনা আছে—সে ফুলে পূজার থালা থেকে বরণের মালা সবই সাজানো যায় !"

"কিন্তু বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিলে আর কি ফুল বাঁচে ?" ঋতব্রত তখনও তর্ক ক'রে।

"য়ু আর নাইদার এ পোয়েট নর্ এ বোটানিস্ট ! তাই বোকার মত তর্ক করছ ! ফুল কি তোমার মত ফুল ? ফলের সম্ভাবনাকে পিছনে রেখেই সে বৃন্তচ্যুত হয়।"

এবারে আমি প্রশ্ন করি, "আপনি কি মনে করেন তেমনি সম্ভাবনা

আজও আছে এই সব পার্মানেণ্ট ল্যায়াবিলিটি উদ্বাস্তুর ? সুযোগ পেলে ওরা আবার সামাজিক মানুষ হ'য়ে উঠবে ?"

"দি আনসার ইজ সিম্পল !"

"উত্তরটা সরল ?"

"সরল নয় সরলা !"

আমরা চুপ করে যাই। চৌধুরীসাহেবই বলে ওঠেন "সে যাই হ'ক ক্যাম্পের কাহিনী যখন লিখেছেন তখন আমার কথাও থাকবে নিশ্চয়ই কিছু ? দেন আই মাস্ট হ্যাভ এ সাইড পার্ট এ্যাজ ওয়েল ?"

"সাইড পার্ট কোথায় ? আপনাকেই তো হিরো ক'রে এঁকেছে ও।" বল্লে ঋতব্রত।

"তাই নাকি ? কই দেখি, দেখি।"

অগত্যা পাণ্ডুলিপি থেকে খানিকটা পড়ে শোনালাম। যেখানটায় তাঁর কথাগুলি আছে বিশেষ ক'রে।

হা হা করে হাসলেন চৌধুরীসাহেব।

বল্লেন, "লোকের নাম অবশ্য মাঝে মাঝে আমার গুলিয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে সব সময় গুলোয় না। এ্যাটলিস্ট সরলা মায়ের নামটা আমার ভুল হয় না কখনও। এটা আপনি বাড়াবাড়ি করেছেন নরেন বাবু।"

হাত দিয়ে কমলাকে কোলের কাছে টেনে নেন তিনি। মিসেস বোসও তাঁর ফেনশুভ্র কেশের মাঝে আঙুল বুলাতে থাকেন।

বল্লাম, "সব সময়ই হয়—আপনি অবশ্য সব সময় টের পান না, এই যা ভরসা। প্রথমত ম্যাডামের নাম সরলা নয়, কমলা—আর দ্বিতীয়ত আমার পৈত্রিক নামটাও নরেন নয়।"

"ইজ ইট ? দি সেম ওল্ড ফানি মিস্‌টেক্ এগেন ? দেন আই এ্যাম্ রিয়ালি ভেরি সরি।"

হা হা করে হেসে ওঠেন সঞ্জীব চৌধুরী।

সমাপ্ত